ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত

ব্যাঙাচি

প্রথম সংখ্যা

মে ২০২০ | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

ভূতের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ

ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার ব্যবচ্ছেদ

মৃত্যু কি জিনিস?

জ্যোতিষশাস্ত্র বনাম জ্যোতির্বিদ্যা

টেলিপ্যাথি কি আসলেই আছে?

লেভিটেশন বাবা

ভূতের বাড়িতে অভিযান

বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল: গুজব বনাম সত্যতা

বিশেষ আর্টিকেল: করোনাভাইরাস

সম্পাদকীয়

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

মে ২০২০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০১

সম্পাদক

প্রজেশ দত্ত, মাফরুহা জামান মীম, মাহতাব মাহদী, নাসিম আহমেদ, জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ, সমুদ্র জিত সাহা, শুভ সালাউদ্দিন

সহযোগী

গোপাল কুন্ডু, আবু রায়হান, হৃদয় হক এবং অনান্য

ডিজাইন

তানভীর রানা রাব্বি

প্রচ্ছদ এঁকেছে: সুস্মিত ইসলাম, তানভীর রানা রাব্বি
('স্কুবি ডু' অবলম্বনে)

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী

তারিখ: ১৪ই মে, ২০২০

টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:
https://bit.ly/bcb_science

ইমেইল: editor@bcbiggan.com
ওয়েব: https://www.bcbiggan.com
ফেসবুক: https://www.facebook.con/bcbiggan
ইনস্টাগ্রাম: https://www.instagram.con/bcb_science
টুইটার: https://www.twitter.con/bcb_science

ভূত নিয়ে আসলে কি বলে বিজ্ঞান? এত এত ভূতের ঘটনা, তাও কেন বিজ্ঞান ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না?

তার কারন, প্রতিটা ঘটনারই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের হাতে আছে।

গভীর রাতে, অথবা কুয়াশার আড়াতে যে সাদা জিনিসটাকে তুমি উড়তে দেখেছো হতে পারে সেটা জাস্ট একটা চাদর।রাতে দরজার ঠকঠক হতে পারে বাতাসের শব্দ।পুকুরে জ্বলতে থাকা গ্যাস থেকে হয় ভূতের আলো।পরিবেশ, পরিস্থিতি, স্মৃতি বিভ্রম অনেক স্বাভাবিক ঘটনাকে বড় করে তোলে।

তার উপর অনেক ঘটনা আছে যেটা মোটেও স্বাভাবিক হয়।ধরো একটা ভূতুরে বাড়িতে গেলেই মানুষের অস্বাভাবিক অনুভূতি হয়। অনেকেই ভৌতিক জিনিস দেখে।এর ব্যাখ্যা হতে পারে ওই বাড়িতে ইনফ্রাসাউন্ডের সোর্স আছে, ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড আছে, অথবা কোন কেমিক্যাল আছে।যে খনিতে ভূতের হাতে অনেক মানুষ মারা গেছে, আর যারা বেঁচে ফিরেছে সবাই ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে- হতে পারে সেখানে আসলে ছিল ভয়ঙ্কর কার্বন মনো অক্সাইড।

সিজোফ্রেনিয়া অদ্ভুত পরিবর্তন করে মানুষের ব্রেইনে।উল্টা পাল্টা দেখে, যা কেউ দেখতে পারে না। ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজর্ডার হলে মানুষের ব্রেইনে অনেক সত্ত্বার জন্ম হয়, অন্যের গলায় কথা বলে।ভুলে যায় আগে কি করেছিল।অন্য নাম, অন্য পরিচয় ধারণ করে।সাথে তীব্র ডিপ্রেশন থাকলে হয়তো নিজেকে কাটাছেড়া করে পরে নিজেই ভুলে যায়।এক্সপ্লোডিং হেড সিন্ড্রোম হলে গভীর রাতে তীব্র শব্দে জেগে ওঠে মানুষ।অ্যাড্রেনালিন রাশের সময় শরীরে শক্তি অনেক বেড়ে যায়, কয়েকজন টেনে ধরে রাখতে পারে না। এদেশে মানসিক রোগ অনেক বেশি, কুসংকারের কারণে এখানে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখায় না কেউ, রোগ পুষে রেখে বড় করে।

তার উপর আছে ভন্ড বাবারা। হাত দেখে ভবিষ্যত বলে দেয় জ্যোতিষী, শূন্যে ভেসে থাকে লেভিটেশন বাবা।ভুয়া টেলিপ্যাথির দাবীদার নাকি মনের কথা পড়তে পারে, ই এস পি মাতা চোখ মেললে দেখতে পারে ভবিষ্যৎ!!

এইসব হাজারো কুসংস্কার ডিবাঙ্ক করে সাজানো হয়েছে ব্যাঙাচির প্রথম সংখ্যা - ভূত। সবই বিসিবির মেম্বারদের লেখা, কিন্তু সব যাঁচাই বাছাই করে নেওয়া।প্রকাশিত হচ্ছে আজ ১৪ই মে, বিসিবির জন্মদিন।আশা করি সবার ভালো লাগবে।

-নাঈম হোসেন ফারুকী
(প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান)

আজকে বিসিবির জন্মদিন। সবাই উইশ করছে, আবেগে আমার চোখে পানি আসছে।

একটা গ্রুপ দরকার ছিল যেখানে সবাই মুক্তভাবে বিজ্ঞান চর্চা করতে পারবে।বিজ্ঞান নিয়ে কথা বললে কেউ মুখ চেপে ধরবে না।
একটা গ্রুপ দরকার ছিল যেখানে ভিউ বাড়ানোর জন্য চকমকে অবৈজ্ঞানিক খবর দেওয়া হবে না।
একটা গ্রুপ দরকার ছিল যেখানে বিজ্ঞান নিয়ে যা খুশি প্রশ্ন করেও যে কেউ আশা করতে পারে, উত্তর মিলবে।ভুলভাল না, সঠিক, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উত্তর।
একটা গ্রুপ দরকার ছিল যেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে - না, বিজ্ঞান এই কথা বলে নি, এটা গুজব।
বিসিবি সেই গ্রুপটা হতে পেরেছে কিনা জানি না, কিন্তু এরকম একটা রেসে সে আরও বহু গ্রুপের চেয়ে এগিয়ে থাকবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।
এই এক বছরে ব্যাঙের ছাতার নিচে এসেছে ছাব্বিশ হাজার মানুষ।আমার সাথে পরিচয় হয়েছে অদ্ভুত সব কৌতুহলী, অতি উৎসাহী ছেলে মেয়েদের।এরা এমন অনেক কিছু জানে যা আমি জানি না।এত কিছু পারে, ওই বয়সে যা কোনদিন ভাবতেও পারি নি।তার পরও বড় ভাইয়ের মতো ভাব ধরে বসে থাকি, এগুলো সব আমিও পারি ;) আজ স্বীকার করলাম, যতটা না শেখাতে পেরেছি, তার চেয়ে বেশি শিখেছি বিসিবি থেকে!
এই ছেলে মেয়েরা বিসিবিকে আলো করে রেখেছে।প্রতিদিন আসছে শতাধিক প্রশ্ন।অভিজ্ঞদের নিয়ে খোলা হয়েছে উত্তরদাতাদের গ্রুপ।আছে বেশ কিছু মেসেঞ্জার গ্রুপ - করোনা নিয়ে, প্রোগ্রামিং নিয়ে, বিজ্ঞানের আরও নানান টপিক নিয়ে।আছে জেনারেল ডিসকাশনের গ্রুপ।আর মূল বিসিবিতো আছেই।
এক বছরে ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানে কন্টেস্ট + কুইজ হয়েছে কতোগুলো আমার নিজেরই মনে নেই।২০-৩০টা তো হবেই।এগুলোর লেখা আগে পড়তাম সব, আজকাল সময় পাই না।অথবা হিংসা লাগে পড়তে। এই বয়সের ছেলে মেয়ে এত কিছু জানে? এত ভালো লিখতে পারে? এই লেখাগুলো যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য একটা ম্যাগাজিনের দরকার ছিল।
যেখানে শুধু আমার পরিবারের অস্বাভাবিক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে মেয়েদের লেখাগুলকে ধরে রাখা হবে।

ব্যাঙাচি হচ্ছে সেরকম একটা ম্যাগাজিন। বিসিবি পরিবারের লেখা, বিসিবির লোকজনেরই সম্পাদনা করা, ব্যাঙের ছাতার ম্যাগাজিন।

শুভ জন্মদিন বিসিবি।
শুভ জন্ম ব্যাঙাচি!

-নাঈম হোসেন ফারুকী

সূচিপত্র

মতামত

১৪ই মে ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান (বিসিবি) ফেসবুক গ্রুপের প্রথম জন্মদিন।বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার এই গ্রুপ থেকে গত একবছরে কে কি পেয়েছে সেটা নিয়েই আজকের মতামত সেকশন। কতিপয় মেম্বারদের মতামত:

আমার লাইফে এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। স্যার আমার দিকে তাকাই বলেছিলেন যে, “ফেইসবুক স্ক্রল করে কখনো জ্ঞানী হয়োনা, বই পড়ে জ্ঞানী হও।“

স্যারের কথাটা আমি মেনেই চলতাম ফেইসবুক থেকে কিছু জানা সম্ভব না, এটাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু একদিন এই গ্রুপের সাথে পরিচয়, গ্রুপের কার্যকলাপ আমার সব ধারনা কে পাল্টে দেয়।অন্য গ্রুপে যেখানে তেমন রেস্পন্স পাওয়া যায় না, এই গ্রুপ ওইরকম নয়। খুব দ্রুত রেস্পন্স পাওয়া যায়, সবচেয়ে ভালো দিক হলো কেউ না কেউ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় প্রশ্ন করে খালি হাতে ফিরতে হয় না। আমার এটা নতুন আইডি, আগের আইডিতে বলতে গেলে 2- 3 K মেম্বার থেকেই এড ছিলো। বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক ধারনা বদলে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ "ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান"

-Shajratul Yeakin

একদিন পরে আমার জন্মদিন! যাই হোক এখান থেকে আমি গুজবকে না বলা শিখেছি সর্বপ্রথম! সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার চিন্তা করতে শিখছি। হিংসা করতে শিখেছি, “সবাই পারে; আমি কেন পারি নাহ!” আরো অনেক কিছু যা বলে শেষ হবে নাহ।

স্পেশালি ধন্যবাদ নাইম্বাই, রায়হান ভাই, কৌশিক ভাই!

-Hridoy Munshi

বেশি দিন হয় নি এই গ্রুপের সাথে আছি।প্রথম মনে করছি এটা ও অন্য অন্য বিজ্ঞান গ্রুপের মত কিন্তু পরে বুঝলাম না এটা অন্য রকম একটা গ্রুপ। এই গ্রুপ থেকে অনেক কিছু শিখেছি যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।আমার মাথাই নানান প্রশ্ন ঘুরতো কিছু উত্তর পেতাম, কিছুর উত্তর পেতাম না।সবাই বলতো এত গভীরে যাওয়ার কি দরকার? বই তে যা আছে তা ই পড়তে।তখন ভাবতাম মনে হয় আমি একটু বেশি ভাবি- এইসবের উত্তর হয়তো নাই।কিন্তু এই গ্রুপে আসার পর বুঝলাম আমি একা না অনেকে এ আছে আর এগুলার উত্তর ও আছে।এই গ্রুপের পিছনে যারা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ

-Tasriha Tahira

গ্রুপে এসে যা যা শিখেছিঃ

১. সবকিছু দেখলেই বিশ্বাস করা যাবে না।
২.বিশ্বাসযোগ্য উৎস ছাড়া কোনো তথ্য বিশ্বাস না করা।
৩. না জেনে না বুঝে কথা বলা যাবে না। অবশ্যই রেফারেন্স থাকতে হবে এবং তা বৈজ্ঞানিক।
৪. বিজ্ঞানও মজার জিনিস।
৫. বিসিবি থেকেই বিজ্ঞান পিরিত এবং তথ্যের ভেতরেও যে তথ্য আছে তা জানার আগ্রহ।

বিসিবি জয়েন করার জন্য ইনভাইট করেছিল আমার এক বন্ধু যার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।এক কথায় বিসিবির জন্যই বিজ্ঞান এখন এতো ভালো লাগে, জীবনের সেরা সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম সেরা।ধন্যবাদ নাঈম ভাই।

-Tanvir Galib

এর আগেও আমি অনেক গ্রুপ এ ছিলাম।তবে সেগুলো শুধু বিজ্ঞানের নামে home work solve করে। এই গ্রুপে join করার পর,বিজ্ঞানের গুরুতর বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি, যেমন- Quantum Mechanics, basic relativity, বিভিন্ন ধরনের প্রানী, উদ্ভিদ, বিশেষ ধরনের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।এছাড়া ও কিছু মজার বিজ্ঞান বিষয়ক contest,যেগুলো লেখার হাত ও জ্ঞান দুটোকেই সমৃদ্ধ করেছে। আশা করি এই ভাবেই মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রচার করবে।

-Saha Bijoy

মানুষের সবসময় নতুন কিছুতে আগ্রহ থাকে স্বাভাবিকভাবে আমারও ছিল । ফেসবুকে কি আছে সেটা দেখার প্রচন্ড কৌতুহল ছিল ।দেখলাম সবাই এখানে যে যার মতো বলছে , ছবি দিচ্ছে এই সেই বক্কর-ছক্কর যা ইচ্ছা তাই করছে । ছোটবেলা থেকে যেভাবেই হোক বাস্তবাদী হওয়াটা শিখে গেছি । তাই এসব ভাব সাব দেখে বিরক্ত ছিলাম । কারণ মূলে বুঝতে পেরেছি যে, উপরে ঠুন-ঠান ভিতরে শুন্য । তারপরেও ঘাঁটা-ঘাটি করতে থাকি কিছু পাই কিনা ! বিজ্ঞানের কিছু আছে কি না? এমনসময় সম্ভবত দেড় বছর+ সময় আগে রবিজ চোখে পড়ে । আর সেটা দেখে অনেক খুশিই ছিলাম । তবে ভালো লেখা তেমন চোখে পড়ছে না ।কিন্তু একজনকে দেখতাম সবসময় দারুন দারুন লেখা দিত ।তেমন কিছুই হয়তো বুঝতাম না কিন্তু লেখার গভীরতা অনুভব করতে পেরে মুগ্ধ হতাম ।তাই এই লেখকের আগের লেখাগুলো খুঁজে খুঁজে পড়তাম ।আবার বিভিন্ন প্রশ্ন করলেই উত্তর পেতাম ।একদিন একটা অসামাজিক প্রশ্ন করেই ফেললাম হতাশ হয়ে ! কিন্তু উত্তর পাইনি ! যাইহোক, ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালাম আর অল্প সময় পরেই একসেপ্ট করে ফেললো। অনেক খুশি ছিলাম তখন। রবিজ হ্যাক হওয়ার কয়েকদিন পর দেখি এই লেখক একদিন **ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান** নামে একটা গ্রুপ খুলে ফেলেছে ! সম্ভবত প্রথম দিনই ইনভাইট পেয়েছি কিন্তু পরদিনই যুক্ত হই। কিছুদিন এর সাথে থেকে বুঝতে পারলাম এটা বাংলা ভাষায় একমাত্র বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য ভিত্তিক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার গ্রুপ হতে চলেছে ।তখনই সম্ভবত এমন স্বপ্ন দেখেছিলাম যে , আগামী দশ বছরের ভিতরে ১ মিলিয়ন হবে ।১৪ মে গ্রুপটার একবছর পূর্ণ হবে আর এই পর্যন্ত সদস্য হয়েছে ২৫হাজার+ । পরিসংখ্যান বলছে দশ বছরে এক দেড় মিলিয়ন হওয়া অসম্ভব কিছু না। আসলে একটা গ্রুপ বড় হওয়ার পিছনে আমার খুশি হওয়ার তেমন কিছু থাকতো না যদি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেত।

যাইহোক কি কি শিখলাম এই পর্যন্ত ? এক কথায় অনেক কিছুই । বিজ্ঞানকে আষ্টে পৃষ্টে চিন্তা - চেতনায় রাখার পথটা কয়েকগুণ সহজ করে দিয়েছে এই গ্রুপটা।গুজব, কুসংস্কার, অজ্ঞতা বুঝতে পারার পথ সহজ করে দিয়েছে। সবমিলিয়ে যদি বিজ্ঞান নিয়ে জীবনে কিছু করতে পারি তাহলে এই গ্রুপের অবদান থাকবে অনস্বীকার্য । ইতোমধ্যে বাকি-জীবনটা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রুপটার অবদান এমন যে, বিনামূল্যে সোনার খনি পাওয়ার মতো ।এখানে এসে ব্যবহারিকভাবে এটাই শিখেছি যে, আমাকে ভালো কাজ করতে হবে স্বর্গে যাওয়ার জন্য না , আমাকে ভালো কাজ করতে হবে মানুষ হয়ে জন্মেছি তাই ।

অনেক শুভ কামনা রইলো ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের জন্য ।

-Mahin Uddin Shakil

গ্রুপে ঢোকে পড়ার এক নতুন মানে পেলাম।পড়া খালি পরীক্ষা পাশের জন্য না এর এক বাস্তব উদাহরণ পেলাম। বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পেল সর্বোপরি, আগে কেন গ্রুপে যুক্ত হয়নি এর অনুশোচনা হচ্ছে।

-Nayem Sahanoor

খুব ভালো লাগে এই গ্রুপটাকে।এই গ্রুপে আসার পর মনে হল বিজ্ঞান যেন চির যৌবন,, কখনো বৃদ্ধ হবে না,,কিংবা নিঃশেষ হবে না।যত জানি,তত জানার ইচ্ছা হয়।

তবে মতবিরোধের কারণে আমরা যেন আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট না করি,,সেটাই এই গ্রুপের একটা অলিখিত রীতি,,গালি গালাজ মুক্ত গ্রুপ... খুব ভালো লাগে

-Altafur Bin Azam

সাইন্সের স্টুডেন্ট বলে নিজেকে মনে হতো আমি বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানি...এখানে এসে দেখলাম বিজ্ঞানের রাজ্যে আমি কোনোদিন স্কুলে না যাওয়া নিরক্ষর এক লোক এর মতো

-Abrar Mahmud Abru

কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানগ্রুপ যে বাংলাদেশে সম্ভব, তা বুঝলাম।

-Iftekhar Ahmed

একটা পিউর প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে ॥ উত্তর না পেতে চিন্তিত নই ।

-Tanvir Ahmed

“একবাক্যে, অবাধে বিজ্ঞান এর বিচরণ”

-Aj Dev
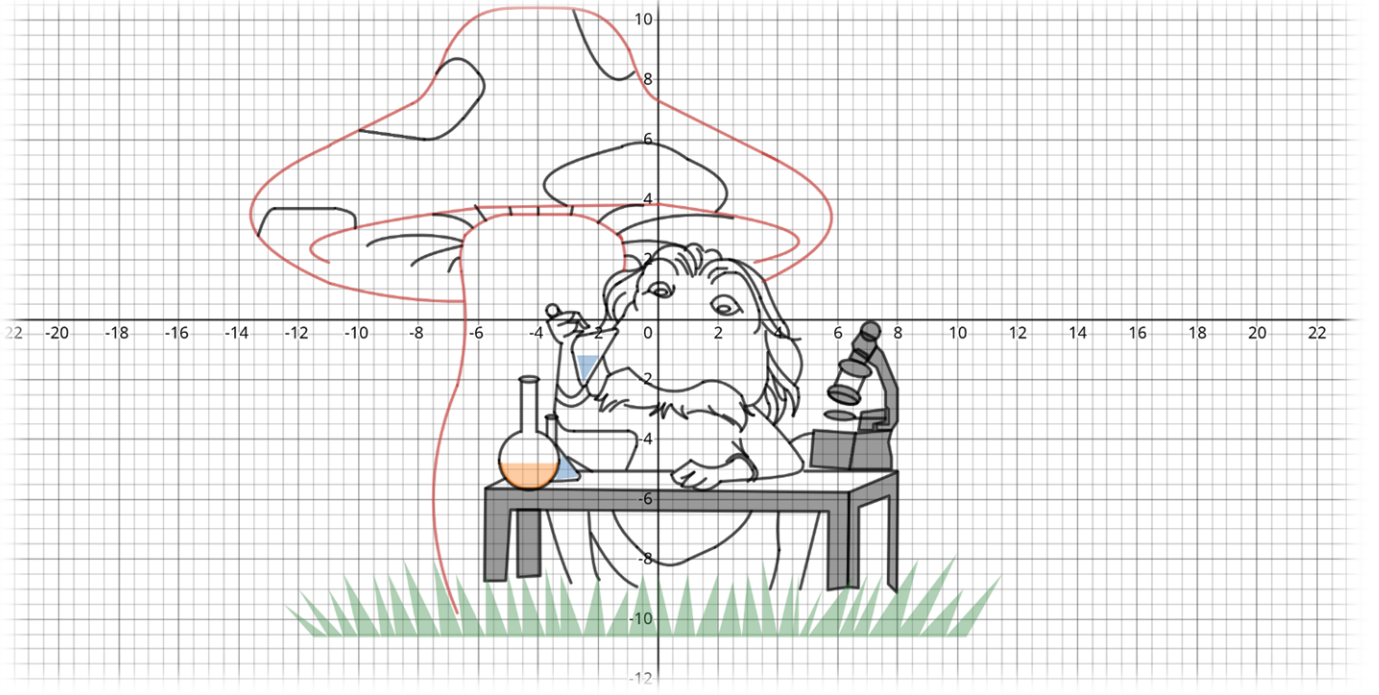
বিসিবি ডেসমস আর্ট by Atikuzzaman Asad

জাভেদ ইকবাল

যখন বাংলাদেশের প্রথম সারির পত্রিকায় খবর বের হতে দেখি, অমুক ১ লিটার পেট্রোল দিয়ে ২০০ মাইল গাড়ি চালানোর পদ্ধতি বের করে ফেলেছে অথবা ১০ টাকার বিদ্যুৎ দিয়ে ১০০টা লাইট এক বছর জ্বালানোর টেকনোলোজি এবং সেগুলি পড়ে মানুষ, এমনকি পদার্থবিদ বা ইঞ্জিনিয়াররা বাহবা দেয়, আমার মনে হয়, মরুভূমিতে পড়ে আছি, যেখানে জ্ঞানের খুব অভাব, এমনকি সাধারণ জ্ঞানেরও বিশাল অভাব।

সেই মরুভূমিতে ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান একটা মরুদ্যান।কুলকুল বয়ে যাওয়া ঠান্ডা পানির মত এখানে তথ্য বিতরণ করা হয়। এখানে কোন প্রশ্নে হাহা দেয়া নিষেধ, কারণ প্রশ্ন না করলে শিখবে কীভাবে?

এখানে শেখা হয়, শেখানো হয়, বাতাস কেন দেখা যায় না থেকে রিলেটিভিটির কঠিনতম বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

নাঈম সেনাপতি আর বিসিবির সদস্যরা সৈন্য হয়ে জ্ঞান বিতরণের, অন্ধকার দূর করার লড়াই করে যাচ্ছে,শেখাচ্ছে এবং নিজেরাও শিখছে।আমিও সেই লড়াইয়ে একজন সৈন্য হিসাবে শেখানোর এবং নিজেও শেখার চেষ্টা করছি।

বিসিবির জন্মদিন আসছে, বিসিবির বাছাই করা লেখা নিয়ে ই-ম্যাগাজিন আসছে। এটা একটা মাইলফলক, কিন্তু এটাই এই যাত্রার শেষ নয়।গন্তব্য আরো অনেক দূরে, কিন্তু বিসিবি সেখানে যাবেই।

বিসিবি-র সবার জন্য শুভকামনা। আমাদের জানার ক্ষুধা যেন কখনো মরে না যায়।

জাবের হাসান

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান, এই গ্রুপটি খোলা হয় গতবছরে মে মাসের ১৪ তারিখ। আর এর প্রতিষ্ঠাতা হলো নাঈম হোসেন ফারুকী ভাই। তো, খোলার পর আমার এক ফ্রেন্ড (Moshiur Rahman Anondo) এই গ্রুপ থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক মিম আর আর্টিকেল শেয়ার দিতো। এইগুলা দেখে আমি পরের দিনই জয়েন করি। এই মাসের ১৪ তারিখ বিসিবির জন্মদিন। আর এর জন্য আমার পক্ষ থেকে অগ্রিম শুভেচ্ছা। বিসিবিতে একবছর কাটালাম। অনেক উপকারই হলো।

১) আমি বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছি। এই ডিসঅর্ডারে যারা ভোগে তাদের আত্মবিশ্বাস থাকে না। সবসময় নিজের ক্ষতি করতে চাই। তাছাড়া আমি এডিএইচডি তেও ভুগছি। কিন্তু বিসিবিতে অনেক দিনের এই সময়ে এগুলো পুরোপুরি না গেলেও প্রায় অনেকটাই কেটে গেছে। আগে ভয় পেতাম প্রশ্ন করতে গিয়ে। সবকিছুতেই ভয় পেতাম। কিন্তু ধিরে ধিরে প্রশ্ন করতে করতে আত্মবিশ্বাসও পেয়েছি পাশাপাশি ভয়টাও কেটে গেছে।

২) আগে বড় আর্টিকেল পড়তে চাইতাম না। অনেক অলস ছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞানের এই রহস্য আর ভালোবাসার টানে এখন এগুলা কিছুই না।

৩) এই গ্রুপে প্রতি মাসে মাসে আর্টিকেল লেখার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। আর এটারও আয়োজন করে থাকে নাঈম ভাই। তো প্রথমে ভয়ে কিছু বলতামও না আর্টিকেল কন্টেস্টেও অংশগ্রহণ করতাম না। কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন জানি একটা আগ্রহ আসলো যে, আমি পারটিসিপেট করবো। তারপর থেকে আমিও করি।

বিসিবি এখন শুধু কোনো গ্রুপ না। এটা একটা পরিবার। আর এই পরিবারটা তৈরি করার জন্য নাঈম ভায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।
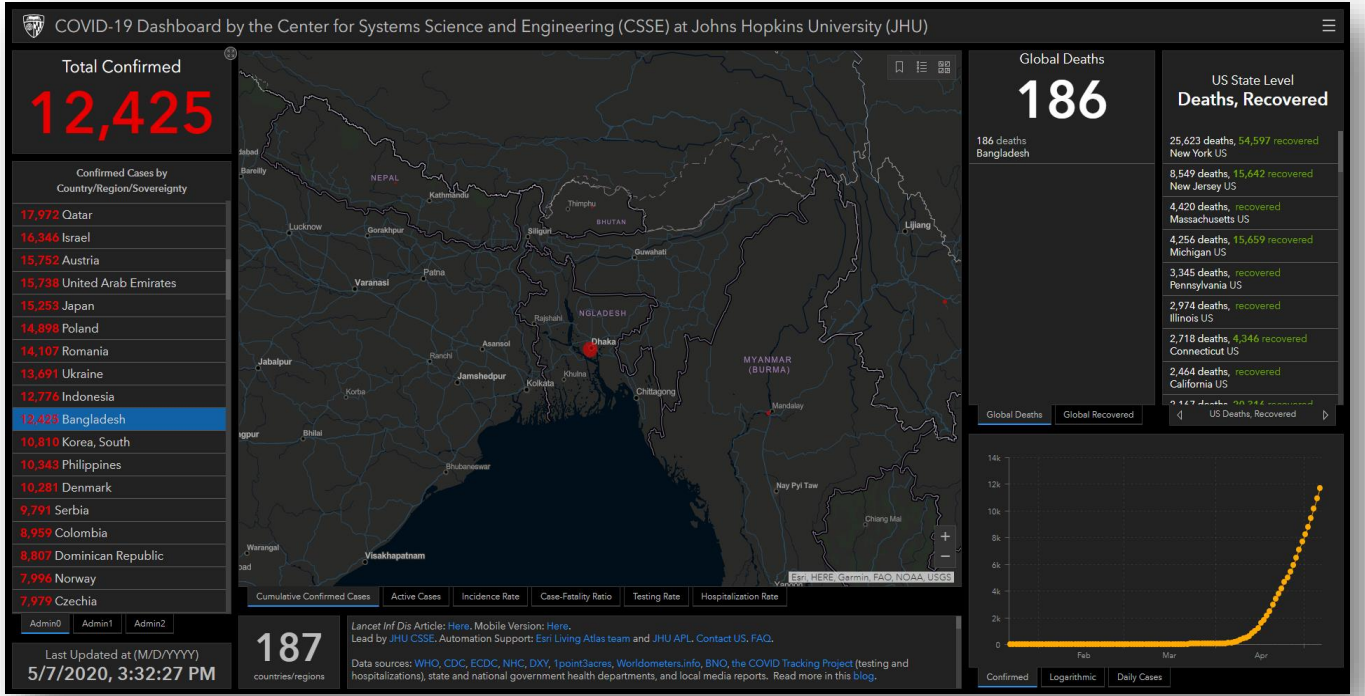
লগারিদমিক গ্রাফ ও বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস

সমুদ্র জিত সাহা

করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পর সব জায়গায় এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফের পাশাপাশি লগারিদমিক গ্রাফের নাম খুব শোনা যাচ্ছে সব জায়গায়। এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ তো বুঝলাম x^r আকারের গ্রাফ। দিনের ব্যবধানে কী পরিমাণ রোগী বাড়ছে সেটা দেখানোর জন্য তৈরি গ্রাফ। যেখানে X অক্ষ বরাবর দিন আর Y অক্ষ বরাবর রোগীর সংখ্যা, খুবই স্বাভাবিক এবং সহজেই বোঝা যায়।

লগারিদমিক গ্রাফেও X অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরে একই পরিমাণ একক বৃদ্ধি পায়, কিন্তু Y অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। লগারিদমিক গ্রাফে দশ ভিত্তিক লগের মান সমান হারে বাড়ে, আর লগের হার সমান হারে বাড়া মানে লগ দিয়ে যার মান প্রকাশ করা হচ্ছে তার মান ১০ গুণোত্তর পদ্ধতিতে বাড়ানো। অর্থাৎ, সাধারণ লেখচিত্রে Y অক্ষ বরাবর যখন মান 1,2,3.... বা 10,20,30..... করে বাড়ে তখন লগারিদমিক গ্রাফে 1,10,100,1000..... এভাবে মান বাড়ে।তো এই গ্রাফের সুবিধা কী? সাধারণ গ্রাফে কী সুন্দর মান বাড়ছে, মোস্ট ইম্পোর্টেন্টলি কীভাবে বাড়ছে; সুন্দর, সহজে বোঝা যায়। লগারিদমিক গ্রাফে অত সহজে এসব বোঝা যায় না। তাহলে লগারিদমিক স্কেলে গ্রাফ আঁকানো হচ্ছে কেন?
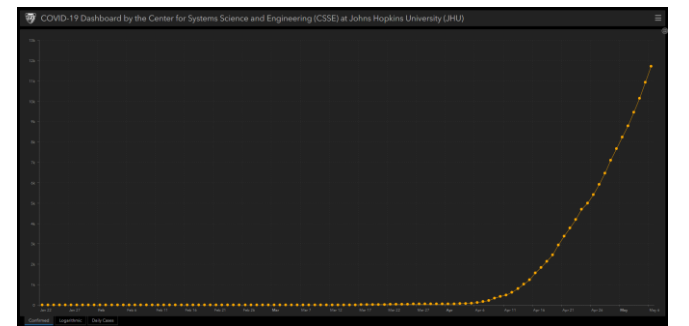
উপরে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতির গ্রাফ দেখুন - দিন বনাম শনাক্ত রোগীর সংখ্যার গ্রাফ। স্বাভাবিকভাবেই এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ।এখানে দিন যত যাচ্ছে লেখের ঢাল তত বাড়ছে, রোগীর সংখ্যা তত দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এই গ্রাফ দেখে কোনোভাবেই বলা যাচ্ছে না "এত" দিন পর রোগীর সংখ্যা কত হবে।ঢাল যে

পরিবর্তন হচ্ছে সবসময়। এখানে আমাদের হিরো লগারিদমিক গ্রাফ, একই জিনিস, শুধু রোগীর সংখ্যা লগারিদমিক ভাবে

লিখলে দেখা যায় সুন্দর একটা ধ্রুব ঢাল বিশিষ্ট লেখ (শুরুর দিকে একটু ব্যাঘাত দেখা যাচ্ছে, দেশে করোনা টেস্টিং এর প্রতিবন্ধকতার জন্য)।
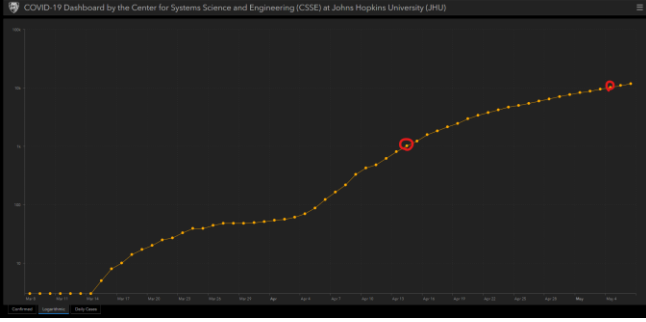
খেয়াল করুন, রোগীর সংখ্যা ১৪ এপ্রিলে ছিল ১ হাজার, আর ৪ মে তে ১০ হাজারের বেশি।২০ দিনের ব্যবধানে ১ হাজার থেকে ১০ হাজার রোগী। তাহলে ১ লক্ষ রোগী হতে কতদিন লাগবে? দেখুন, আমাদের লেখচিত্রের ঢাল ধ্রুব।অর্থাৎ ১ হাজার থেকে ১০ হাজার আক্রান্ত রোগী হতে যেখানে ২০ দিনের মত লেগেছে, ১০ হাজার থেকে ১ লাখ আক্রান্ত রোগী হতেও মাত্র ২০ দিনের মত লাগবে। সুতরাং, সবাই নিজের ও প্রিয়জনদের জীবন বাঁচাতে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন, কষ্ট হলেও ঘরে থাকুন। আপনার আশেপাশের মানুষদের কথাও মনে রাখুন, অর্থনৈতিক সংকটে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ান।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাবান দিয়ে কিছু সময় অন্তরে অন্তরে ২০ সেকেন্ড সময় ধরে হাত ধৌত করুন

ভেন্ট্রিলোকুইজম

মো: তাজরি

অনেকে হয়তো শব্দটার সাথে নতুন পরিচিত। ভেন্ট্রিলোকুইজম হচ্ছে কোনো ব্যাক্তি তার কণ্ঠ ব্যবহার করে এমন ভাবে শব্দ উচ্চারন করা যেন দর্শক মনে করে শব্দটা ব্যাক্তির মুখ থেকে নয় অন্য কোন স্থান থেকে এসেছে।এই ভেন্ট্রিলোকুইজম এর মাধ্যমে অনেক বড় মানের তান্ত্রিক মানুষকে ধোকা দিয়ে মোটা অংঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়।বিশেষ করে স্পিরিচুয়ালিস্টরা এটা ব্যবহার করে মানুষকে ধোকা দেয়।স্পিরিচুয়ালিস্ট হচ্ছে যারা আত্মা ডাকে।বিশেষ করে তারা প্ল্যান চেট বা ওইজা বোর্ডে এই টেকনিকটা ব্যবহার করে থাকে।যেকোন সাধারন মানুষ এই টেকনিকে সহজে ধোকা খেয়ে যাবে।বাংলাদেশেও ভেন্ট্রিলোকুইস্ট আছে।তবে তারা নিজেরাও জানে না যে টেকনিক ব্যবহার করে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে এটাকে যে ভেন্ট্রিলোকুইজম বলে।চলুন যেনে নিই ভেন্ট্রিলোকুইজম সম্পর্কে।

ভেন্ট্রিলোকুইজম বা Ventriloquism বলতে এক ধরনের শব্দ শিল্পকে বুঝানো হয়।বাংলায় মায়াস্বর।যে ভেন্ট্রিলোকুইজম পারদর্শী তাকে বলা হয় ভেন্ট্রিলোকুইস্ট বা মায়াস্বরী।একজন ভেন্ট্রিলোকুইস্ট এমন ভাবে তার কন্ঠকে ব্যবহার করে যাতে মনে হবে অন্য কোন উৎস থেকে শব্দটা আসছে।টিভিতে এমন অনুষ্ঠান দেখেছেন হয়তো যেখানে ব্যাক্তি একটা পতুলের সাথে কথা বলে। পুতুলটিও কথা বলে ব্যাক্তির সাথে।আসলে পতুলের কথাটা ব্যাক্তিই বলে আমরা সেটা বুঝতে পারি না।বলতে পারেন এক ধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে।এই ভেন্ট্রিলোকুইজম বহু আগে থেকে এর চর্চা আছে।এই অদ্ভুত নামটাও হওয়ার পিছনে কারণও আছে। দুইটা ল্যাটিন শব্দ Venter ও Loqui মিলে তৈরি হয়।যেখানে Venter অর্থ পেট ও Loqui অর্থ কথা।এই নাম এর পিছনে কারণ আছে।মানুষের মুখ থেকে কথা না বেরিয়ে পেট থেকে বের হয় এই ধারনা নিয়ে এই নাম দেওয়া হয়।অনেক তান্ত্রিক এর মতামত এমন যে এক আত্মা নাকি ব্যাক্তির কন্ঠে প্রবেশ করে এমন আওয়াজ করে।আসলে তা নয়।এর পিছনে বিজ্ঞান আছ।

কলাকৌশলঃ-

ভেন্ট্রিলোকুইজম কৌশলটা অনেক জটিল আর সময় সাপেক্ষ।কেউ যদি ভেন্ট্রিলোকুইজম শিখতে চায় তাহলে তাকে বহুদিন চর্চা করা লাগে।গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে শব্দ গুলো উচ্চারন করা লাগে।আরেকটা দিকে খেয়াল রাখতে হয়।সেটা হচ্ছে যেন ঠোট না নড়ে।ঠোটের নড়াচড়া করা যাবে না।এই জন্য কিছু বর্নকে মায়াস্বরীরা স্কিপ বা এড়িয়ে যায়।বাংলায় এমন বর্ন হচ্ছে ব,ম,প বা ওষ্ঠ বর্ন গুলো। আর ইংলিশে হচ্ছে f,v,p ও m। ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা এই বর্ন গুলোর জায়গায় ভিন্ন বর্ন ব্যবহার করে থাকে।যদি উদাহরন দিই তাহলে ব এর জায়গায় তারা থ উচ্চারন করে।আর যারা ভেন্ট্রিকুইজম এর মাধ্যমে শো দেখায় তারা পুতুল বা ডামি নিয়ে শো দেখায়।এখন দর্শকরা না বুঝে সে জন্য ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা পুতুল বা ডামিটির ঠোট লম্বা ও বেশি ফাকা রাখে।আর তারা বাচ্চা পুতুল বা ডামি ব্যবহার করে থাকে।যাতে মনে হয় বাচ্চাটি নতুন কথা শিখেছে।তাদের আরো একটা বিষয় খেয়াল করা লাগে যেনো তাদের কথার পাশাপাশি ডামিটার আচরন ঠিক রাখা।এইসব কিছুই ঠিক থাকলে দর্শক কাছে মনে হবে পুতুলটি কথা বলছে।একধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।তা ছাড়া যারা

স্পেশাল ভেন্ট্রিলোকুইস্ট তারা হরবোলা হওয়া লাগে হরবোলা হচ্ছে তারা যারা ভিবিন্ন পশু পাখির ডাক নকল করতে পারে একজন ভালো হরবোলা একজন ভালো ভেন্ট্রিলোকুইস্ট হতে পারবে তা ছারা সাধারন মানুষ চাইলেও হতে পারবে তার জন্য তাকে কয়েক বছর ধরে চর্চা করা লাগবে।

ইতিহাসঃ-

ভেন্ট্রিলোকুইজম অনেক পুরোনো বিদ্যা প্রাচীন গ্রিকরা একে বলত gastromancy। বুঝায় যাচ্ছে ভেন্ট্রিলোকুইজম কত পুরানো বিদ্যা। এই বিদ্যাতে প্রথম পুতুল ব্যবহার হয় ১৭৫৭ সালে অস্ট্রিয়ান ব্যারন ডি মেঙ্গেল নামে জনৈক ব্যাক্তি উনার পর থেকে আস্তে আস্তে পুতুল ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ভেন্ট্রিলোকুইজম একটি বিনোদন মাধ্যম গড়ে উঠে আধুনিক ভেন্ট্রিলোকুইজম এর পিছনে অনেক দক্ষ ব্যাক্তির আবদান থাকলেও, আধুনিক ভেন্ট্রিলোকুইজম এর জনক বলা হয় ফ্রেড রাসেলকে। এই ফ্রেড রাসেলই প্রথম ভেন্ট্রিলোকুইজমকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় স্টেজ শো করতেন। পরবর্তীতে পল উইনচেল, জিম্মি নেলসন, ডেভিড স্ট্রেসম্যান, জেফ ডুনহাম, টেরি ফেটোর, ওয়েল্যান্ড ফ্লাওয়ার্স, সারি লুইস, উইলি টাইলার এবং জে জেনসন এর মতো অনেক গুণী ভেন্ট্রিলোকুইলিস্ট এ অদ্ভুত খেলায় যুক্ত হন তাহলে উপমহাদেশে ভেন্ট্রিলোকুইজম কীভাবে আসলো..?উপমহাদেশে এটা আসে ভারতের প্রফেসর যশোয়ান্ত পাধ্যায় এর হাত ধরে তার ছেলে রামদাস পাধ্যায় টেলিভিশনের মাধ্যমে এই বিদ্যাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন তবে সেটা ব্যর্থ হয় কারণ তখন আঁকা ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা জনপ্রিয় ছিল যার কারণে তা কালো পর্দার আড়ালে চলে যায়।

ভুল ধারনাঃ-

বিভিন্ন বাংলা সাহিত্যে এর কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন সত্যজিত রায়ের লেখা ভূতো গল্পে এর উল্লেখ আছে তা ছাড়া আরো কয়েকটি সাহিত্যেও আছে মাশুদল হক এর আন্তর্জাতিক লেভেলের ভেন্ট্রিলোকুইস্ট বইটিতে এই সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে সন্দুর ভাবে তুলে ধরেছে কিছু কিছু সাহিত্য ভেন্ট্রিলোকুইস্ট নিয়ে ভুল ধারনা দিয়ে থাকে যেমন তিন গোয়েন্দা বইয়ের লেখক রকিব হাসানের লেখা মমি রহস্য বইটিতে দেখা যায় একজন ব্যাক্তি তার কণ্ঠের মাধ্যমে শব্দকে বহুদূরে নিয়ে যায় যেটা অসম্ভব ভেন্ট্রিলোকুইজম মাধ্যমে শব্দকে বেশি দূরে নেওয়া যায় না কারণ যে ভেন্ট্রিলোকুইজম ব্যবহার করে শব্দ উৎস তার ভোকাল কর্ড থেকে আসে সে হিসাবে ব্যাক্তি বেশি দূর তার কণ্ঠকে নিতে পারবে না উৎস একটাই ব্যাক্তি ঠোট নাড়াচাড়া না করা ও

শব্দ অন্যভাবে আসার মাঝে এই ধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় আর আমাদের ভোকাল কর্ড এত শক্তিশালী নয় যে বহুদূরে পর্যন্ত ঠোট না নড়াচাড়া করে আওয়াজ করতে পারব

আরো কিছু কথাঃ-

বাংলাদেশেও এর ব্যবহার আছে কিছু তান্ত্রিক এই ভেন্ট্রিলোকুইজমকে ব্যবহার করে মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে জ্বীন ডাকার নাম দিয়ে এটি ব্যবহার করে মানুষকে ধোকা দিয়ে মিথ্যা ভবিষ্যত বলে টাকা মেরে দেয় অনেক কবিরাজ আছে জ্বীনকে ডাকার জন্য আপনাকে একটা অন্ধকার রুমে নিয়ে আসবে যদি কবিরাজ আপনাকে পর্দার বাহিরে রেখে ঐ পাশে থেকে জ্বীন ডাকে কথা বলে তাহলে মনে করবেন উনি হরবোলাই দক্ষ আর যদি কবিরাজ আপনার সাথে থেকেই জ্বীনের সাথে কথা বলিয়ে দেয় তাহলে মনে করবেন উনি একজন ভেন্ট্রিলোকুইস্ট।

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

ভূতুড়ে গল্পের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ

সোহানূর রহমান সৌমিক

কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা:

ঘটনা ১:

অফিসে বসে আছেন আপনি।মাথায় চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। দুনিয়ার নানান রকমের চিন্তা।ঘরে ঘরঘর কিংবা ভুনভুন (যেটাই হোক) শব্দে ফ্যান ঘুরছে, ফ্যান বেশি জোরে ঘুরছে না, আস্তেও ঘুরছে না। রাত হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ কোনো অজানা কারণে আপনার শরীরটা শিউরে উঠলো, গতকাল রাতেই Bhoot FM শুনেছেন।একজনের গল্প হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে এক অজানা ভয় আপনাকে গ্রাস করল।মনে হলো, সেই গল্পের ভূতটা যদি এখন আপনার সামনে এসে হাজির হয়? তাহলে কেমন হবে?

যখন আপনি এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা করছেন, তখন হঠাৎ চোখ চলে গেলো ঘরের এক কোণে, আর আপনি ফ্রিজ হয়ে গেলেন।আপনি আবিষ্কার করলেন কালকের Bhoot FM এর সেই ভূত আপনাকে সত্যি সত্যি দেখা দিয়েছে। দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি, বোধহয় আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

দাঁড়ান দাঁড়ান, অজ্ঞান হবেন না, অজ্ঞান হওয়ার আগে আরেকটা ঘটনা শুনে যান।

ঘটনা ২:

আন্ডারগ্রাউন্ড রাস্তাটি একটি বড় রাস্তার নিচ দিয়ে তার এ পাড় থেকে ও পাড়ে চলে গিয়েছে।অতিশয় ভদ্র পথচারীদের যেন রাস্তা পারাপারের সময় কোনো গাড়ি ডিস্টার্ব না করতে পারে তারই একটা ব্যবস্থা এই আন্ডারগ্রাউন্ড।আপনার খুব কাছের এবং প্রাণের দোস্ত মিস্টার বল্টু, রাস্তা পার হচ্ছেন এই আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে।আর মনে মনে যত দোয়া দরূদ পারেন আওড়াচ্ছেন, কেননা ভূতুড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড হিসেবে পরিচিত এই রাস্তাটি।

কিন্তু দোয়া দরূদে তেমন কাজ হলো না।তিনি দেখতে পেলেন তার সামনে একটা ছায়ামূর্তি। যেহেতু আপনার প্রানের দোস্ত আপনার মত অসীম সাহসী লোক নন, সেহেতু তিনি সেখানেই মূর্ছা গেলেন। ফলে ছিনতাইকারীরা খুব আরামের সাথে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন।

ঘটনা ৩:

১৯৮০ সাল।গবেষক ভিক ট্যান্ডি (Vic Tandy) এক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন।হঠাৎ তার মনে হলো, তিনি সেই রুমে একা নন।কেউ বা কিছু একটা তার সাথে রয়েছে।হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দেখতে পেলেন, টেবিলের পাশে একটা অশরীরী ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু তিনিও আপনার মত অসীম সাহসের অধিকারী নন, তাই তিনি এক লাফে ল্যাবরেটরি পেরিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তার মাথায় চলছে হাজারো চিন্তা। কেনো তিনজন লোক, মানে আপনি, আপনার দোস্ত বল্টু, আর তিনি নিজে একই ছায়ামূর্তি বারবার দেখছেন? উত্তর টা ভেবেই তিনি শিউরে উঠলেন, ভূতটা কি তাহলে আপনাদের ঘাড় মটকানোর জন্য আপনাদের পিছনে লেগেছে?

পরদিন, তিনি ল্যাবরেটরিতে গেলেন।ল্যাবরেটরিতে তার ফেন্সিং (Fencing) খেলার তলোয়ারটা পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন, তলোয়ারটা আপনা আপনিই কাঁপছে।তিনি হঠাৎ বুঝতে পারলেন, এই ঘরে এমন কোনো শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, যা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু এই তলোয়ারটিকে কাঁপাচ্ছে।তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন, এই শব্দটা আসছে একটা ফ্যান থেকে, তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, সেই শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি 19Hz।অর্থাৎ এটা একটা ইনফ্রাসাউন্ড (Infrasound)। মানুষের শ্রব্যতার সীমা 20 Hz থেকে 20,000 Hz পর্যন্ত, কিন্তু ফ্যান থেকে আসা সাউন্ডটা 19 Hz এর, তাই তিনি এ শব্দ শুনতে পারেন না ঠিকই, দেখতে ঠিকই পারেন- ভূতুড়ে সব ছায়ামূর্তি।

এ ধরণের ইনফ্রাসাউন্ড মানুষের মনের ওপর অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এর কারণে মানুষ বিষন্নতায় ভুগতে পারে, খুব খুশির চোটে হঠাৎ লাফিয়ে ড্যান্স করা শুরু করে দিতে পারে, আবার Bhoot FM এর গল্পের ভান্ডার বড় করার জন্য অশরীরিও দেখে ফেলতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে, এ ধরণের ইনফ্রাসাউন্ড উৎপন্ন হয় কোথা থেকে?

ইনফ্রাসাউন্ডের কম্পাঙ্ক যেহেতু কম তাই এই রকমের সাউন্ড বিভিন্ন জিনিস থেকেই আসতে পারে, যেমন ঝড়ো হাওয়ার কারণে উৎপন্ন হতে পারে (ভূত দেখার পারফেক্ট সময়), আন্ডারগ্রাউন্ডের ভেতর ওপরের গাড়ি চলাচলের কারণে ইনফ্রাসাউন্ড সৃষ্টি হতে পারে (ভূত দেখার পারফেক্ট জায়গা ও ছিনতাইকারীদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী সাউন্ড), ফ্যানের ঘূর্ণন, এমনকি আসবাবপত্র থেকেও আসতে পারে এ ধরণের সাউন্ড।

কিন্তু কথা তো আরো আছে, কেনো আপনারা মানুষের মতো দেখতেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন? চেয়ার, টেবিল, ফ্যান,

এগুলো কেনো নয়? উত্তর হচ্ছে, আপনি Bhoot FM শুনে শুনে জেনে গিয়েছেন, যে ভূতগুলো মানুষকে দেখা দেয়, তারা আসলে মানুষেরই অতৃপ্ত আত্মা, কাজেই তারা মানুষের রূপ ধরেই আসবে। আবার ছোটবেলা থেকে দাদা দাদির বদৌলতে কত রকমের ডাইনি, পিশাচ, শাকচুন্নি আরো কত পদের ভূতের কথা জেনেছেন, খেয়াল করে দেখুন, তাদের মোটামুটি সবার আকৃতিই মানুষের মতো।কাজেই এতদিন ধরে এসব শুনতে শুনতে আপনার ধারণা হয়ে গেছে যে যদি কিছু দেখা দেয়ও, তারা মানুষের অবয়বেই আসবে।তাই মস্তিস্ক যখন মনের ভেতর এসব তৈরি করে, তখন মানুষের অবয়বেই তৈরি করে।

ঘটনা ৪:

আপনি ঘুমিয়ে আছেন। বেশ আরামের ঘুম দিয়েছেন। স্বপ্নে গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিচ্ছেন। হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে গেলো।আর তখন যা দেখতে পেলেন, তা দেখার জন্য আপনি প্রস্তুত ছিলেন না (কেউই প্রস্তুত থাকে না রে Bhoot FM এর ব্রাদার্স রা, এবার একটু অন্য ডায়ালগ ছাড়েন)।

আপনি দেখতে পেলেন, কোনো এক অশরীরি, কিংবা শরীরি, সে যাই হোক, আপনার ওপর বসে আপনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।তার চোখ লাল, চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, ভয়ংকর চেহারা, ব্লা ব্লা আরো অনেক কিছু।ভয়ে আপনার যায় যায় অবস্থা। আপনার প্রাণপনে দৌড় লাগাতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু হায়, আপনি হাত নাড়াতে পারছেন না, পা নাড়াতে পারছেন না, আপনার পুরো শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে। আপনি ভয়ে, ঘেমে একাকার। অশরীরিটি যাচ্ছে না।এক সময় অশরীরিটি মিলিয়ে যেতে শুরু করল।আস্তে আস্তে আপনি শরীরে বল ফিরে পেলেন।প্রচন্ড ভয়ে তারপরেও আপনি নড়াচড়া করতে পারছেন না।

ঘটেছে কি এমন কখনো আপনার সাথে? যদি ঘটে থাকে, তাহলে "আমার সাথেই কেন এমন হয়" বলে চিল্লাফাল্লা করবেন না। আপনিই একা নন যার সাথে এমনটি হয়।এমন অনেক মানুষ

রয়েছেন যারা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছেন এবং তার পাশে দুই-চারজন জ্বীন পরী বসে থাকতে দেখেছেন।

এবার আসি আসল কথায়। এই বিষয়টাকে বলা হয় স্লিপ প্যারালাইসিস (Sleep Paralysis)।এটি মূলত ঘটে যখন, আপনি গভীর ঘুমে রয়েছেন, কোনো কারণে যদি আপনার শরীর জেগে ওঠার আগেই আপনার মস্তিস্ক পুরোপুরি জেগে ওঠে, তখন। আপনার মস্তিস্ক যখন বুঝতে পারে যে আপনার শরীর এখনো জেগে ওঠেনি, তখনই শুরু হয় হ্যালুসিনেশন। তখন আপনার মস্তিস্ক আপনার মনের ভেতর একে একে জ্বিন, পরী শয়তান, অশরীরি সব আনতে থাকে।

আর শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা? আসলে সত্যি কথা বলতে ঘুমের সময় আপনি কখনোই ইচ্ছে করে শরীর নাড়াতে পারবেন না (বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন)।মস্তিস্ক তার শরীরকে নিরাপত্তার খাতিরেই ঘুমের সময় অবশ করে রাখে, যাতে আপনি ও আপনার পাশে যিনি শুয়ে আছেন, দুইজনই নিরাপদ থাকেন।কাজেই খুব স্বাভাবিক কারণেই আপনি শয়তান দেখার মুহূর্তে শরীর নাড়াতে পারবেন না।কারণ, আপনি তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

ঘটনা ৫:

এই ঘটনাটি যিনি প্রকাশ করেন, তিনি তার সময়ের একজন অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন।

ডাঃ উইলিয়াম উইলমার (Dr. William Wilmer), যিনি সে সময়ের সেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরও চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন,

যাদের মধ্যে রয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফর্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট-ও। এই অত্যন্ত উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ডাক্তার যখন আমেরিকান জার্নালে এক ভূতের গল্প প্রকাশ করলেন তখন সকলেই রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটি তার এক পেশেন্টের, নাম প্রকাশ না করার অনুরোধের জন্য ডাঃ উইলমার তার পেশেন্টের সত্যিকার নাম না লিখে "মিসেস এইচ (Mrs. H)" নাম লিখেছিলেন।

১৯১২ সালে, এইচ পরিবার, একটি পুরোনো বাড়িতে ওঠেন। ১৮৭০ সালের দিকে তৈরি করা বিরাট একটি বাড়ি।বাড়িটি ছিল পরিত্যক্ত, বহুদিন সেটায় কোনো মানুষজন নেই, তাই বাড়িটি মেরামতও করা হয়নি বহুদিন।
নির্জন স্থানে না থাকলেও বাইরের কোনো শব্দ বাড়িটির ভেতরে যেত না বাড়ির ডিজাইনের কারণে এবং সর্বত্র কার্পেট থাকার কারণে।তাই ভেতর থেকে বেশ ভূতুড়ে বলেই মনে হতো।রাতের বেলা তারা গ্যাসের বাতি, এবং বেসমেন্টে থাকা এক চুল্লির দ্বারা আলো ও তাপ পেতো।
সে বাড়িতে ওঠার কিছুদিনের ভেতরেই তারা (মিস্টার ও মিসেস এইচ) বিষন্নতায় ভুগতে থাকেন।
একদিন সকালে হঠাৎ মিসেস এইচ তার ওপরের তলার ঘরে কারোর হাঁটার শব্দ শুনলেন। সাথে সাথে দৌড়ে তিনি ওপরে উঠলেন, যে ঘরে শব্দ শুনেছিলেন, অবাক হয়ে দেখলেন সে ঘরে কেউ নেই। তিনি তার আশেপাশের সমস্ত ঘর এমনকি তার ওপরের তলার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন।সেখানে কেউ ছিল না।
খুব তাড়াতাড়ি তারা আরো বাজেভাবে বিষন্নতায় ভুগতে থাকেন, তাদের বাচ্চাকাচ্চাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, মাথাব্যথায় ভুগতে থাকেন, এমনকি খাবারও খেতে পারতেন না। তাদের বাচ্চারা খেলাধুলায় অনাগ্রহী হয়ে পড়ে।
এরপর একদিনের ঘটনা। মিসেস এইচ তার বাচ্চাদের নিয়ে শহরের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন।মিস্টার এইচ বাড়িতে একা। রাতের বেলা বেলের শব্দে বারে বারে তার ঘুম ভেঙে যেতে থাকে। যতবারই বেলের শব্দে ঘুম ভাঙে, ততবারই দরজা খুলে দেখেন কেউই নেই।মিসেস এইচ যখন তার বাচ্চাদের নিয়ে ফিরে এলেন, তার বাচ্চাদের মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে শুরু করল এবং খারাপভাবে অসুস্থ হতে শুরু করল।

মিসেস এইচ প্রায়ই অনুভব করতেন যে তার বাম হাতে কোনো এক দড়ি বা সুতো শক্তভাবে বাধা রয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার হাতে কোনো দড়ি বাঁধা ছিল না।

এরপর কোনো এক রাতে মিসেস এইচ ঘুম ভেঙে শুনলেন পেছনের দেয়ালের ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে কেউ ওপরে উঠছে।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ওদিকে কোনো সিঁড়িই ছিল না।
এভাবে ঘটনা ঘটতেই লাগলো, ভালো হতো যদি বিষয়টা এইসব ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, কিন্তু তা হলো না।বিষয়টা আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করল, যখন মিসেস এইচ তার ড্রয়িং রুমের এক কোণে কোনো এক কালো চুল ও কালো পোশাক পড়া মেয়েকে দেখলেন।মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসছিল।মিসেস এইচ ও সাহস করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু কাছাকাছি যেতেই মেয়েটি স্রেফ হওয়ায় মিলিয়ে গেল।বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে গেলো না, তিনি এরকম কিছু জিনিস দেখলেন আরো তিনবার।একবার ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলেন একজন বৃদ্ধ পুরুষ আরেকজন অল্পবয়স্ক মেয়ে তার বিছানায় বসে বসে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

একসময় পরিবারটি তাদের বিষন্নতা কাটানোর জন্য অপেরা দেখতে যান।সেই রাত্রেই মিসেস এইচ ঘুমন্ত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দেখেন এবং তার স্বামী ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারেন কেউ একজন তার গলা টিপে ধরেছে।জেগে উঠে তিনি দেখেন মিসেস এইচ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এবং সে ঘরে কেউ নেই।এমনকি তাদের এক বাচ্চাও স্পষ্ট অনুভব করে যে তার কোলে কেউ বসে আছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার কোলে কেউ ছিলনা।

এরপর মিস্টার এইচ তার ভাইয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন।তার ভাই বলেন, তারা খুব সম্ভবত কোনো বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তিনি উপদেশ দেন, তারা যেন খুব তাড়াতাড়ি কারো সাহায্যে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

এরপর তারা কোনো এক বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনেন, তার নাম বলা হয় মিস্টার এস (Mr. S)।মিস্টার এবং মিসেস এইচ পুরো ঘটনা তাকে খুলে বলেন, বাচ্চাদের দুরাবস্থা দেখান।তিনি সবকিছু ভালোমতো শোনেন। এরপর মিস্টার এস পুরো বাড়ি খুব ভালোভাবে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেন।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, তাদের ঘরের সেই চিমনিটি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়াগুলোর বাইরে বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো বাইরে না গিয়ে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়তো।ফলে সারা বাড়িটি কার্বন মনো অক্সাইড (CO) নামক এক বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে সবসময় ভরে থাকতো। ফলে তারা যতক্ষন বাড়িতে থাকতো তারা নিঃস্বাসের সাথে বিষাক্ত গ্যাস

কার্বন মনো অক্সাইড শরীরে নিয়ে নিজেদেরও বিষাক্ত করে ফেলতো।মিস্টার এস তাদের বলেন, বাচ্চাদের আর একটি রাতও

যেন এখানে থাকতে না দেয়া হয়, না হলে হয়তো পরবর্তী দিন তাদের ঘুম আর নাও ভাঙতে পারে।

অবশেষে তারা একজন প্রফেশনালের শরণাপন্ন হলেন এবং পরীক্ষা করার পর দেখা গেল তাদের বিষন্নতা, মাথাব্যথা এসব কার্বন মনো অক্সাইডের কারণেই হয়েছে এবং তাদের সাথে ঘটা ভূতুড়ে কান্ডগুলোর কারণও আসলে কার্বন মনো অক্সাইডের বিষক্রিয়ার কারণে হওয়া হ্যালুসিনেশন। এরপর তারা তাদের চিমনি ঠিক করেন, তারপর থেকে তারা পুরোপুরি ঠিকঠাক ভাবেই সেই ভূতুড়ে বাড়িতে কোনো সমস্যা ছাড়াই বসবাস করতে পেরেছিলেন।

মোরাল অফ দা স্টোরিঃ বাড়িতে ভূতের আছর পড়লে ওঝা নয়, কোনো একজন প্রফেশনালকে ডাকুন যে বিষাক্ত কোনো গ্যাস আছে কিনা খুঁজতে পারবে।

কার্বন মনো অক্সাইড এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস, আমাদের রক্ত অক্সিজেনের মতোই সহজেই কার্বন মনো অক্সাইডকেও গ্রহণ করতে পারে। ফলে বমি বমি ভাব, মাথা ব্যাথা, দুশ্চিন্তা, অবসাদগ্রস্থতা, শারীরিক দুর্বলতার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরে বেশি মাত্রায় প্রবেশ করলে মানুষ মারাও যেতে পারে।সেই সাথে হ্যালুসিনেশনের মাত্রাও বেড়ে যায়। এই বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় কম অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কাঠ কয়লা পোড়ালে, সিগারেটের ধোঁয়ায়, গাড়ির কালো ধোঁয়ায় ইত্যাদি জিনিস হতে।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, রাতের বেলা অশরীরি কিংবা শরীরি (যেটাই হোক) কিছুর অস্তিত্ব টের পেলে সিগারেট ধরাবেন না (কেননা Bhoot FM শুনে আপনি জেনে গিয়েছেন যে আগুন দেখলে ভূত ধারেকাছে আসে না)। উল্টো সিগারেটের ধোঁয়ার কারণে যে অশরীরি আপনাকে দেখা দেয় নি, সেটাও দেখা দিয়ে দিতে পারে। কাজেই এখন থেকে "সিগারেট মৃত্যুর কারণ" স্লোগানের সাথে আরো একটা স্লোগান যুক্ত করুন, "সিগারেট ভূত দেখার কারণ"

ঘটনা ৬: মাইকেল ফ্যারাডে ও ওইজা বোর্ডের গল্প:

মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday) এর নাম শুনেছেন? হ্যাঁ সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কথাই বলছি। সারা বিশ্ব আজ যার কাছে কৃতজ্ঞ।মহান বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তার বিষয়ে বলেন,"তার আবিষ্কারগুলোর মাত্রা আর ব্যাপকতা, বিজ্ঞান আর শিল্পকারখানার জগতে সেগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করলেই বোঝা যায় - এই লোকটাকে যত বড় সম্মানই দেয়া হোক না কেন, সেটা যথেষ্ট নয়।'

কিন্তু এই মাইকেল ফ্যারাডে সাহেব যে ভূতের ওঝা-ও (!) ছিলেন তা কি জানেন? কি অবাক হলেন?
সে যাই হোক, বিজ্ঞানী হিসেবে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোনো ভাষা নেই, তাই করবোও না, কিন্তু একটা কথা বলাই যায়- তিনি না থাকলে আজকের এই ভূতুড়ে পোস্ট লেখা হতো না, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার কাছে।
[অনেক বড় ভূমিকা লিখে ফেলেছি তাই ভূমিকাটি আর আগাবো না, মূল লেখায় চলে যাই]

মানুষের কৌতূহলের কোনো সীমা নেই। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের এক আজব কৌতূহল ছিল মৃত মানুষের আত্মার সাথে যোগাযোগ করার।নানান জায়গায় নানান রকম ভাবেই এর চেষ্টা করা হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি উপায় হলো ওইজা বোর্ড (Ouija Board [প্রথম ছবি]) এর মাধ্যমে আত্মা ডাকাডাকি, আরেকটি হলো Table Tilting, বা বাংলায় বললে টেবিল ঝাঁকুনি পদ্ধতি।এক কথায় এগুলোকে প্ল্যানচেট হিসেবেই সবাই চেনে।
এগুলো অনেক প্রাচীন পদ্ধতি হলেও, মানুষের মাঝে পরিচিতি পেতে শুরু করে ১৮৪০ কিংবা ১৮৫০ সালের দিকে।

ওইজা বোর্ডঃ বোর্ডটি তৈরি হয় কাঠ কিংবা তামা দিয়ে।বোর্ডের ওপর বড়ো বড়ো অক্ষরে A থেকে Z পর্যন্ত সবগুলো অক্ষর লেখা থাকে, আর তার নিচে 0 থেকে 9 পর্যন্ত।আরো লেখা থাকে "হ্যাঁ-না" জাতীয় উত্তর করার জন্য Yes এবং No।
হার্ট আকৃতির (❤) একটি কাঠের টুকরা, যেটাকে আসলে বলা হয় প্ল্যানচেট, সেটা বোর্ডের ওপর রেখে দেয়া হয়।আত্মা ডাকার সময় সবাই এই টুকরার ওপর হাত রাখে।আর আত্মা ডাকার পর সেই আত্মাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে সেই প্ল্যানচেটটিকে বিভিন্ন অক্ষরে অক্ষরে ঘুরিয়ে বানান করে করে প্রশ্নের উত্তর দেয় আত্মা। যেমন প্রশ্নের উত্তর যদি হয় "হ্যাঁ" তাহলে প্ল্যানচেটটি Yes লেখার ওপর চলে যায়, "না" হলের No লেখায় চলে যায় ইত্যাদি।

টেবিল ঝাঁকুনি পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিটা বেশ মজার।কয়েকজন মানুষ একটা টেবিলের চারপাশে বসে পড়েন। তাদের সবার হাত টেবিলের ওপর রাখেন।নিয়ম হলো, সবার হাতই তার পাশের দুইজনের হাতকে ছুঁয়ে থাকতে হবে।এরপর তারা সবাই মিলে ধ্যান করতে থাকেন, মনে মনে কোনো মৃত ব্যক্তিকে আসার আমন্ত্রণ জানান।
মৃত ব্যক্তির আত্মা আসা মাত্র টেবিল আপনা আপনিই ঝাঁকি দিতে আরম্ভ করে।কখনো কখনো এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বাকি তিন পা শূন্যে তুলে রাখে।অবস্থা বেগতিক হলে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে নাচতে সারা ঘর ছুটে বেড়ানোর দাবিও করা হয়েছে।

যাই হোক, কোনো সন্দেহ নেই এসব যারা করে তারা বেশিরভাগই ধোঁকাবাজ প্রতারক।কিন্তু প্রত্যেকেই কি প্রতারক? এর উত্তর পাওয়ার জন্য আসুন আমরা স্বরণ করি মাইকেল ফ্যারাডে সাহেবকে। চমকাবেন না, আমি ফ্যারাডে সাহেবের আত্মাকে ডাকার কথা বলছি না, ভূতে আছর করা পোস্ট কেউ পছন্দ করে না (যদিও এটা ভূতুড়ে পোস্ট)। আমি ফ্যারাডে সাহেবের করা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলছি, যা তিনি জীবিত থাকতে কোনো একসময় করেছিলেন।

তিনি তার পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, টেবিলের ঝাঁকি কিংবা প্ল্যানচেটের কারসাজি, সব কিছুই নিঃসন্দেহে যারা এই প্ল্যানচেট করেন তাদের নিজেদের মাধ্যমেই হয়। মস্তিষ্কের ইডিওমোটর ইফেক্ট (Idiomotor Effect)-এর কারণে এসব ঘটে থাকে। ইডিওমোটর ইফেক্ট হচ্ছে সেই ঘটনা, যেখানে কেউ তার অবচেতন মনে কিছু নির্দেশ গ্রহণ করে, এবং সেই অনুযায়ী তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাড়াচাড়া করতে নির্দেশ দেয়।কিন্তু সে নিজেই যে এই নাড়াচাড়া করেছেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না কেননা এইসব ঘটে তার অবচেতন মনের নির্দেশে।

মানুষ যখন প্ল্যানচেট করতে বসে, তখন তারা ধরেই নেয় যে টেবিল নড়ে উঠবে, তাই মনের অজান্তেই তাদের অবচেতন মন এই নড়াচড়ার নির্দেশ গ্রহণ করে ফেলে, ফলে প্ল্যানচেট করার সময় তারা তাদের অবচেতন মনের নির্দেশে নিজেরাই টেবিলটি নাড়াতে থাকে, কিন্তু অবচেতন মনের নির্দেশে নাড়ানোর ফলে তারা বুঝতেই পারেন না যে তারা নিজেরাই টেবিল নাড়াচ্ছেন।

একই কথা ওইজা বোর্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।যিনি আত্মাকে প্রশ্ন করেন, তিনি আশা করেন যেন তার মনের মতো কোনো উত্তর দেয় আত্মা।ফলে তার অবচেতন মন তার প্রশ্নের আশা করা উত্তর অনুযায়ী তার হাতকে নাড়াতে থাকে, আর প্ল্যানচেটটি সেই কারণে বিভিন্ন অক্ষরের দিকে যেতে থাকে।কিন্তু তিনিই যে প্ল্যানচেটটিকে নাড়াচ্ছেন, তা তিনি বুঝতে পারেন না কেননা এসব হচ্ছে তার অবচেতন মনের নির্দেশে।

আলেয়ার গল্প ও অন্যান্য:

১.

আপনি গ্রামে গিয়েছেন।খুব উত্তেজিত।গ্রামে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা।ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক ডোবার ধারে চলে এলেন।হঠাৎ চোখ গেল ডোবার ধারের ছোট এক জঙ্গলের মতো জায়গায়।আর সাথে সাথেই স্থির হয়ে গেলেন।
একটি সুন্দর কিংবা ভয়ংকর (সুন্দর নাকি ভয়ংকর তা নির্ভর করে যে দেখছে তার ওপর) আলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেটা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।এখান থেকে ভাসতে ভাসতে ঐখানে চলে গেলো।কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকার পর খেয়াল করলেন, সেই আলোর চারপাশে অদ্ভুত ভূতুড়ে ধোঁয়াও আছে।
নিশ্চই শয়তানের আলো, কিংবা ভুতের আলো, কিংবা পরীর আলো (কিসের আলো, এটাও নির্ভর করছে যে দেখছে তার ওপর), তা ছাড়া আর কি হবে? আগুন জ্বলার জন্য তো কোনো জ্বালানি দরকার হয়, এটা তো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।নেভার নামেও কোনো খবর নেই। হঠাৎ আপনার মাঝে একটু বিজ্ঞানমনস্কতা উঁকি দিতে শুরু করলো, চিন্তা করলেন,ভুত বলতে তো কিছু নেই, একটু এগিয়ে দেখেই আসি জিনিসটা কি।কিন্তু যেই ওটার কাছাকাছি গেলেন, স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
জিনিসটার একটা সুন্দর নাম আছে, আলেয়া।আর ইংরেজিতে বলে "Will-o'-the-wisp"।বিভিন্ন ঢঙের মানুষের দৌলতে এর বিভিন্ন ঢঙের কেরামতির বিবরণ পাওয়া যায়।অনেকে বলে, আলেয়া দেখে হাঁটতে শুরু করলে সেটাও সরতে থাকে, যতই আলেয়ার কাছে যেতে চেষ্টা করুক না কেন, আলেয়াকে সেই একই দূরত্বে দেখা যায়, অনেক সময় ধরে হাঁটার পরও সেটার কাছে যাওয়া যায় না।ভুত মানুষকে এই আলেয়া দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে তার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিতে এর বিভিন্ন চটকদার অলৌকিক বিবরণ আছে - কিন্তু আলেজান্দ্রো ভোল্টা

(Alessandro Volta)-এর মত এক রসকষহীন বিজ্ঞানী এসে এসব কিছু পায়ের তলায় ফেলে পিষে ফেললেন।

ভোল্টা সাহেব প্রথম মিথেন গ্যাস আবিষ্কার করেন, তার সন্দেহ ছিল এই আলেয়ার রহস্যের পিছনে নিশ্চই মিথেন গ্যাসের কোনো হাত (গ্যাসেরও আবার হাত থাকে?) রয়েছে।

মিথেন এক প্রকার জৈব যৌগ।গাছপালা, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ যখন অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পচতে থাকে, তখন বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হয় মিথেন, ফসফিন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। জীবের দেহাবশেষ যখন পুকুর বা ডোবার পানির নিচে পচতে থাকে, তখন মিথেন, ফসফিন উৎপন্ন হয়। এই মিথেন আর ফসফিন যখন বুদবুদ আকারে ওপরে উঠে আসে, তখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে একা একাই জ্বলে ওঠে। আবার ফসফিন যখন জ্বলে, তখন তা থেকে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়, ফলে সেই আলোর চারিদিকে ধোঁয়াও দেখা যায়।

আর যখন কেউ অতিশয় সাহসী হয়ে এই আলেয়ার কাছে যায়, তখন এই গ্যাস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, আর আলেয়াও বাতাসে মিলিয়ে যায়।

২.

সুইজারল্যান্ডের কিছু বিজ্ঞানী একবার এক এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক স্টিমুলেশন দেয়ার সময় তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তার কিরকম লাগছে। তিনি যা উত্তর দিলেন তা মোটামুটি ভয়াবহ।

তিনি বললেন, তিনি তার সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছেন। সেই ছায়ামূর্তি তার প্রতিটা নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গির নকল করছে।তিনি যদি উঠে বসেন, ছায়ামূর্তিও উঠে বসে, হাত নাড়ালে ছায়ামূর্তিও হাত নাড়ায়।বিজ্ঞানীরা যখন তাকে একটি কার্ড দিলেন কার্ডটি পড়ার জন্য, সেই ছায়ামূর্তিটিও সেই কার্ডটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো!

সত্যিকার অর্থে যেটা ঘটেছিল, তা হলো, বিজ্ঞানীরা ওই রোগীর মস্তিষ্কের বাম টেম্পোরোপ্যারিয়েটাল জাংশনে (Left Temporoparietal Junction)-এ স্টিমুলেশন দিচ্ছিলেন। মস্তিষ্কের এই অংশের কাজ হলো, শরীরের অবস্থান কোথায় তা জানান দেয়া, শরীরের অবস্থা জানান দেয়া ইত্যাদি।আরো সহজ করে বলতে গেলে, এই অংশের কাজ হলো নিজের অস্তিত্ব এবং অন্য কারো অস্তিত্ব বুঝতে সাহায্য করে।বিজ্ঞানীরা যখন মস্তিষ্কের এই অংশে স্টিমুলেশন দিচ্ছিলেন, তখন মস্তিষ্কের ওই অংশের কাজে ব্যাঘাত ঘটছিলো, তাই এক সময় রোগী তার অবস্থান বুঝতে অসমর্থ হলেন এবং ফলে তিনি তার সামনে এক ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন যেটা তাকে পুরোপুরি অনুকরণ করে যাচ্ছিলো।

৩.

২০১৩ সালে গাজীপুরের কোনো এক ফ্যাক্টরির প্রায় ৩০০০ কর্মচারী রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করে।তাদের আন্দোলনের বিষয়বস্তু বেতন কম দেয়া কিংবা এরকম কিছু না। তাদের আন্দোলনের কারণ ছিল, তাদের ফ্যাক্টরির মহিলা টয়লেটে এক ভুতের উপদ্রপ শুরু হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ইভ টিজার ভুতের ব্যাপারে কোনরুপ পদক্ষেপ নেয়নি।

এক ভয়ংকর রাগী ভুত নাকি সেখানকার মহিলা টয়লেটে ঢুকে মহিলাদের উত্যক্ত করছিলো।নারী নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা তো দূরের কথা, ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁকও করেনি।ফলশ্রুতিতে কর্মীরা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামে।

আসলে যা ঘটেছিলো, তা হলো সবাই গণহিস্টেরিয়ার শিকার হয়েছিলো।এ ধরণের ঘটনা ঘটে তখন, যখন কেউ প্রচন্ড মানসিক চাপে থাকে। ফ্যাক্টরিতে ১২-১৪ ঘন্টা শিফটিং ডিউটির কারণে প্রত্যেকেই মানসিক চাপের মধ্যে ছিল।ফলে উপসর্গ হিসেবে দেখা দিলো মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। আর এর সাথে সামাজিক, ধর্মীয় বিশ্বাস তো রয়েছেই।

তদন্ত করে দেখা গিয়েছিলো, ওই দুষ্টু ভুত দেখেছিল মাত্র কয়েকজন।এমনকি যে মহিলা প্রথম এই ভুত দেখে সবার মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে সবাইকে রাস্তায় নামিয়েছিলো সেও স্বীকার করেছিলো যে সে আসলে নিজের চোখে ভুত দেখেনি, বাথরুমে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলো, আর মনে করেছিলো এটা ভুত ছাড়া আর কার কারসাজি হবে? তাই সে সবাইকে বলে বেরিয়েছিল যে এটা দুষ্টু জ্বিন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।আর এর পরে যখন আরো দুই একজন মাথা ঘুরে পড়ে গেল, তখন সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো।আর শুরু হলো এক ভয়ংকর ইভ টিজার ভুতের গল্প।

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

বৈশাখ মাস।টাঙ্গুয়ার হাওড়।মিডিয়াম সাইজের একটা ট্রলার। তাতে আমরা কয়েকজন।

সারাদিন বারবার ঝড় হয়েছে, বিদ্যুতের শিখা দমকে কেঁপে উঠেছে আমাদের নৌকা। ছইয়ের ভেতরের টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় তাস খেলেছে ওরা তখন। বিকালে মেঘ কেটে গেলো, হাওড়ের বুক আলো করে উঠল হলুদ রঙের একটা পূর্ণিমার চাঁদ। তার ভরা জোছনার আলোয় থই থই করল হাওড়ের কালো পানি। নৌকার ছাদে উঠে আসলাম আমরা।জমে উঠলো ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে মকবুল ছিল একটু হুজুর টাইপের।অনেক রকম জ্বিন ভূতের গল্প তার ঝুলিতে আছে। আছে আত্মার গল্প, প্ল্যানচেটের গল্প, কিভাবে তার বোন নিষিদ্ধ এই আত্মা ডেকে আনার কাজ করে- এমন এক ভয়ঙ্কর গ্রুপের সাথে জড়িয়ে যায় তার গল্প। মকবুলের গল্পগুলো লিখতে গেলে আস্ত একটা বই হয়ে যাবে, ওর গল্পগুলো আরেকদিন বলব।মকবুলের গল্প শেষ হলে গল্প ধরল মিরপুরের আহাদ।ওর ঝুলিতে ছিল একটাই গল্প। আজকের টপিক ওই গল্পটা।

আহাদরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে মিরপুরের কলোনিতে। কলোনির বাসাগুলো ফাঁকা ফাঁকা, মাঝখানে অনেক গাছপালা। আহাদ তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ে। কলোনির রাত, চারদিক নিশ্চুপ তখন।আহাদ একা তার রুমে মশারির নিচে শুয়ে শুয়ে তিন গোয়েন্দা পড়ছে।টিউব লাইটের মিটিমিটি আলো অদ্ভুত আলো আঁধারি তৈরি করেছে রুমে।

আহাদ চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখল। ঘরের ডান দিকে একটা দরজা, পর্দাটা কেঁপে উঠল হঠাৎ করে।আহাদ পাত্তা না দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলো। কিছুক্ষণ পরের কথা। দুটা রোমশ হাত মশারির উপর দিয়ে আহাদকে চেপে ধরল। একটা হাত তার কপালে।আরেকটা হাত তার কাঁধে।যে অ্যাঙ্গেল থেকে চেপে ধরেছে তাতে শুধু তার পেটের দিকটা দেখা সম্ভব ছিল তার।

আহাদের মনে আছে কালো কালো লোমের কথা, ৪০-৫০ সেকেন্ড অমানুষিক আতংকের কথা।বিছানায় শরীর থরথর করে কাঁপছিল তখন। এই পুরো সময়টা সে ফ্রিজ হয়ে ছিল। তারপর আহাদ অমানুষিক একটা চিৎকার দেয়, আঙ্কেল আন্টি ছুটে আসে রুমে।আহাদের পাশে কেউ নেই তখন।

যে রোমশ প্রাণীটা আহাদের ঘাড় চেপে ধরেছিল আহাদ তার মুখ একবারও দেখে নি।সেই জোছনা রাতে আহাদ যদি এতোগুলো মানুষের সামনে বানিয়ে বানিয়ে গল্পটা বলে তাহলে আহাদ পাকা অভিনেতা। আহাদকে সেরকম মনে হয় নি কখনো। গল্পটা শুনে হুমায়ুন সাথে সাথে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল, পরে সারারাত ঘুমাতে পারে নি, নিজের কাঁধ চেপে ধরে জেগে উঠেছিল বারবার।

এই গল্প এখানেই শেষ করে দিলে ভালো হতো, আমি সেটা করবো না।মিসির আলির মতো ভিতরে ঢুকে দেখবো সেই রাতে আসলে কি হয়েছিল।চলুন শুরু করা যাক।

২।

মিরপুর এলাকায় বানরের উৎপাত কিরকম আহাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।সে বলল, এতো জোরে চেপে ধরেছিল, সে থরথর করে কাঁপছিল, নড়তে পারছিল না।বানরের এতো শক্তি থাকার কথা না।

আমাদের অন্য ব্যাখ্যায় যেতে হবে।

৩।

স্কিজোফ্রেনিয়া অদ্ভুত পরিবর্তন করে মানুষের ব্রেইনে, কর্টেক্সের কনশাসনেসের জায়গাটা উলটে পালটে যায় তখন। আমার এক মামার স্কিজোফ্রেনিয়া আছে। তিনি দেখেন গুণ্ডারা তাঁকে আর তাঁর মাকে মারতে আসছে।স্কিজোফ্রেনিয়া ব্রেইনে চেঞ্জ করে, আপনাকে যা দেখাচ্ছে তা আপনি না দেখতে পারবেন না কখনো।স্কিজোফ্রেনিয়া মানে পাগল না, কিন্তু এই রোগ মানুষকে পাগল করে তোলে।প্রবল বুদ্ধিমান নোবেল বিজয়ী জন ন্যাশের এই রোগ ছিল, পরে তিনি বুঝতে শিখেছিলেন যা দেখছেন তা সত্যি না।সব মানুষ সেটা পারে না।

স্কিজোফ্রেনিয়ার কোন পারফেক্ট চিকিৎসা আছে বলে আমার জানা নেই।আমার মামাকে নিয়ে তার মা সাড়া জীবন স্ট্রাগল করে যাচ্ছেন, স্কিজোফ্রেনিয়া এই দুটা মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।আহাদের ডেফিনিটলি স্কিজোফ্রেনিয়া ছিল না, থাকলে সে এতো সহজে ভালো হতো না।

৪।

সাবসনিক শব্দ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া করে মানুষের মনে, আস্তে আস্তে অস্বস্তি, তারপর কেউ তাকিয়ে আছে এরকম ফিলিং শুরু হয়।তারপর তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে।কাছাকাছি ইফেক্ট আনে অস্বাভাবিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম। কর্টেক্সের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টিমুলেশন দিয়ে আপনাকে ভূত দেখানো সম্ভব।

অনেক ভূতের বাড়ির ঘটনা সাবসনিক শব্দ আর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।তবে যেসব জায়গায়

সাবসনিক শব্দের সোর্স থাকে সেখানে ঘটনা বারবার ঘটে। মিরপুরের ওই কলোনিতে কতবার ভূত এসেছিল আমার জানা নেই।

৫।

কনশাসনেসের তৃতীয় পর্বে স্লিপ প্যারালাইসিসের কথা বলেছি।

স্লিপ প্যারালাইসিস আতংকের এক ছদ্মনাম।আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবেন আপনি আর এক চুলও নড়তে পারছেন না।আপনি সব দেখছেন, সব শুনছেন কিচ্ছু করতে পারছেন না। এই অভাবনীয় আতঙ্কের সময় ব্রেইন আপনাকে বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝামাঝি নিয়ে যায়। আপনি Augmented Reality দেখেন।আপনি আপনার ঘরটা দেখবেন, ওইটা সত্যি। ঘরের মাঝখানে যে এলিয়েনটা দাড়িয়ে আছে সে সত্যি না।সে আপনার মূর্ত আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ। এলিয়েন আবডাকশনের শিকার অনেক সাবজেক্ট স্লিপ প্যারালাইসিসের কথা স্বীকার করেছেন।

আহাদের স্লিপ প্যারালাইসিস ছিল। এই ঘটনার সবচেয়ে লজিক্যাল ব্যাখ্যা হতে পারে স্লিপ প্যারালাইসিস।তিন গোয়েন্দা পড়তে পড়তে সে হয়তো ঘুমিয়ে পরেছিল, তারপর চেপে বসে ঘুমের দানব।আধো ঘুম আধো জাগরণে তার ব্রেইন হয়তো তাকে কিছু একটা দেখায়।পরে সত্যি স্মৃতি আর মিথ্যা স্মৃতি এক হয়ে আরও অনেক কিছু যোগ হয় কাহিনীতে।

৬।

সব শেষে আরেকটা ব্যাখ্যা কিন্তু সব সময়ই থাকে।অন্ধকার নিশুতি রাতে পর্দা ফাঁক করে সেদিন ঘরে ধুঁকেছিল অন্য জগতের কোন অজানা প্রাণী, আসলেই ঘাড় চেপে ধরেছিল ক্লাস 6 এ পড়া আহাদের।রহস্যময় এ পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।যে বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে মেনে নিতে পারে সে যথেষ্টই ওপেন মাইন্ডেড।বিজ্ঞান বিশ্বাসের ধার ধারে না।প্রমাণ চাই তার।

লেভিটেশন

প্রজেশ দত্ত

Superhero movie এর ভক্ত যারা তারা সবাই কম বেশি Doctor Strange চরিত্রের সাথে পরিচিত।Marvel comics এর Captain Universe, Doctor Strange এর কাছে প্রচুর ম্যাজিক, ট্রিক, mystical power এর সাথে রয়েছে Cloak Of Levitation. এই Cloak of Levitation তাকে শূন্যে ভেসে থাকতে, উড়তেও সাহায্য করে।অর্থাৎ অভিকর্ষ বলের বিপরীতে গিয়ে তাকে ভাসিয়ে রাখে শূন্যে।

Levitation (লেভিটেশন) শব্দের কোন সরাসরি বাংলা অর্থ হয়তো নেই।এই টার্মের সারকথা হলো-

কোনো প্রকার যান্ত্রিক সহায়তা, প্রায়োগিকতা ছাড়াই কোনো ভারী বস্তুকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা।এই ভারী বস্তু হতে পারে কোনো মানুষ বা কোনো প্রাণী বা বস্তু।

Levitation এর ক্ষেত্রে যা হয়-

1) কোনো বস্তুকে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে শূন্যে ভাসাতে হয়।
2) অভিকর্ষ বলকে অতিক্রম করার জন্য বস্তুর উপর বিপরীতমুখী বল দিতে হয় যার দরুণ বস্তু শূন্যে ভাসতে পারে।
3) শূন্যে ভাসমান বস্তুর উপর ক্রিয়ারত মোট বল হয় ০। অর্থাৎ গ্রাভিটির বিপরীতে প্রয়োগকৃত বল= বস্তুর ওজন। যদি প্রয়োগকৃত বল ওজন থেকে বেশি হয় তো বস্তু উপরের দিকে উঠতে থাকে।
4) Magnetic force, Electrostatic force, aerodynamic force, hydrodynamic force এর সাহায্যে কোনো কিছুকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা যায়।তবে hydrodynamic force ব্যবহার করে কোনো কিছুকে ভাসানো levitation নয়। কারণ, এক্ষেত্রে বস্তুর সাথে সরাসরি সংযোগ থাকে পানির, বস্তু machanical support পায় এক্ষেত্রে।

Levitation তাহলে Paranormal কেনো? যেহেতু এটি বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্ভব। এটাকে paranormal বানিয়েছে Magician, তপস্বী এবং সাধারণ মানুষ (যাদের Levitation সম্পর্কে ধারণা নেই)। Magician রা তাদের ম্যাজিক শো তে এমন অনেক বিষয় দেখিয়ে থাকেন। যেমনঃ আঙুলের ইশারায় কোনো বস্তুকে উপরে তোলা, মাঝে মাঝে কোনো মানুষকে উপরে তোলা ইত্যাদি।স্বাভাবিকভাবে কেউ যখন শুধু নিজের আঙুলের ইশারায় কোনো বস্তুকে নাচাতে পারবে বিজ্ঞানের প্রমাণিত নীতি, সূত্র ভেঙে তখন সেটা লৌকিক না, অলৌকিকই মনে হবে।মানসিক/আধ্যাত্মিক শক্তি (spiritual energy) দিয়ে অভিকর্ষ শক্তিকে হার মানিয়ে দেয় তারা।কিন্তু মজার বিষয় হলো এটাই যে, তারা তাদের এই জাদু "preparation time" না নিয়ে বা স্টেজের বাইরে গিয়ে দেখাতে পারে না। যেমন ধরুন আপনি একটা ম্যাজিক শো তে গেলেন, সেখানে দেখলেন জাদুকর এটা ওটা শূন্যে ভাসিয়ে দিচ্ছে। খেয়াল করবেন যত বড় magician ই হোক একটা নির্দিষ্ট এলাকা (stage) এর বাইরে সে নিজের এই জাদু দেখাতে যাবে না।তাকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে যদি তাকে বলেন রান্নাঘর থেকে খাবারের থালা শূন্যে ভাসিয়ে আনতে বা একটা হালকা চামচ শূন্যে ভাসাতে তবে সে হয়তো নৈশভোজ ভুলে পালিয়ে যাবে।

Magician রা Levitation এর সাথে সম্পর্কিত জাদুগুলো দেখানো জন্য বেশ কিছু বিষয়ের সহায়তা নিয়ে থাকেন-

1) Hallucination
2) Levitation string

1) Hallucination: তারা ভ্রম (hallucination) তৈরির জন্য 3D holographic projection এর সহায়তা নিয়ে থাকতে পারে।চিত্রে একটা ল্যাম্পের ছবি দেখানো হয়েছে। এটি 3D moon lamp। ল্যাম্পটি দুর থেকে দেখলে এবং এ নিয়ে কোনো ধারণা না থাকলে আপনার মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক কোনো একটা বস্তু হাওয়ায় ভাসছে।কিন্তু বাস্তবে এটি একটি 3D ইমেজ যা আপনি স্পর্শ করতে গেলে বুঝবেন আপনার চোখের ভুল। সাল্লু ভাইয়ের Kick movie তে এরূপ 3D ইমেজের সাহায্যে মানুষকে বোকা বানানোর অনেক উদাহরণ আছে।

যখন কোনো অতি ভারী বস্তু/মানুষকে ম্যাজিক শো তে ম্যাজিশিয়ানরা উঁচুতে তোলে তখন হতেই পারে এসব বস্তু/মানুষকে ঢেকে দেওয়া হয় holographic projection এর সাহায্যে তৈরিকৃত ভ্রমের আড়ালে।

কিছু 3D projection দ্বারা তৈরি ইমেজ দেখানো হলো।

2) Levitation string: খুব সুক্ষ্ম সুতা যা নিকট হতে বোঝা গেলেও একটু দুর থেকে বোঝা যায় না। এই সুতার ব্যবহার হরহামেশাই হয়ে থাকে magic show গুলাতে।মানুষের মতো ভারী বস্তু এতে তোলা সম্ভব না হলেও মোটামুটি ভারী বস্তু এর দ্বারা তোলা সম্ভব।
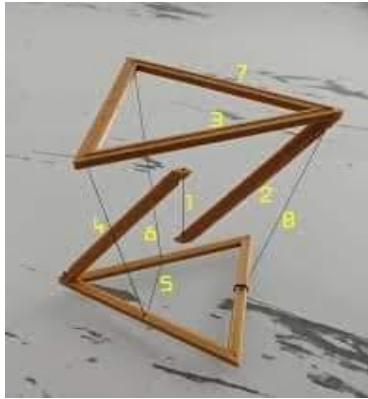
এবার levitation এর আরও কিছু উপায় জেনে নিই।

1) Magnetic levitation: কোনো ছোটো চুম্বককে বা চৌম্বক পদার্থকে অপেক্ষাকৃত বেশ বড় চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষিত করার মাধ্যমে সেটাকে শূন্যে ভাসানো সম্ভব।

Magnetic levitation প্রদর্শন করানোর সহজ পন্থা হলো diamagnetic levitation. এটার কয়েকলাইনের একটা ছোটো ব্যাখ্যা দেই। রসায়নের ভাষায়, যেসব উপাদান (substance) এর অযুগ্ম ইলেক্ট্রন জোড় নেই সেসব উপাদান হলো ডায়াম্যাগনেটিক। এসব diamagnetism বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কোন উপাদান চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় না।বরং একটু বিকর্ষিত হয়।এক্ষেত্রে বাইরে থেকে কোনো diamagnetic বস্তুর উপর বাহ্যিক চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলে সেই বস্তুর উপাদানের পরমাণুসমূহের ইলেক্ট্রন তাদের অরবিটে পুনঃবিস্তৃত হয়, স্থির তড়িৎ সৃষ্টি হয় এবং এদের ভিতরে স্বল্প মাত্রায় চুম্বকত্ব ধর্ম আসে কিন্তু প্রয়োগকৃত চুম্বকক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে।যার ফলে এটি বাহ্যিক চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষিত হয় এবং অভিকর্ষকে অতিক্রম করে শূন্যে উঠে। খুব ক্ষুদ্রাকৃতির অনুজীবকেও এই পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসানো যায়।

2) Electrostatic levitation: এক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যবহৃত ক্ষেত্রটি একটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র।এবং যে বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে হবে সেটি অবশ্যই চার্জিত। এই পোষ্ট যেহেতু অলৌকিকতার "অ" মুছে ফেলে তাকে লৌকিক প্রমাণের জন্য করা তাই "Earnshaw's theory" এখানে টানা হয় নি।

সর্বপ্রথম Dr. Won-kyu Rhim নাসা ল্যাবে একটা Electrostatic levitator তৈরি করেন।

একটা ছোটো শূন্য প্রকোষ্ঠে (vaccum chamber) দুটি তড়িৎদ্বার একটা অপরটির সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। তড়িৎদ্বার দুটোর মধ্যে আছে একটা electrostatic field. এই ফিল্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয় বাইরে থেকে।এই তড়িৎক্ষেত্রে আছে ২ মিমি লম্বা একটি চার্জিত ডায়ামিটার যা এই দুই তড়িৎদ্বারের মধ্যে ভাসমান থাকে।তবে স্থির নয়, ভাসমান অবস্থায় এটি এদিক ওদিক নড়াচড়া করে তবে কোনো তড়িৎদ্বারের সাথে আটকে যায় না।এটা মুলত Earnshaw's theorem এর কারণে হয়।যা হোক, electrostatic field এর অনুবাদ করলে হয় স্থির তড়িৎ ক্ষেত্র।চিরুনি মাথায় ঘষে ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাকে আমরা আকর্ষিত করি যে ক্ষেত্রের সাহায্যে এটা সেটাই। যদি চিরুনির বিপরীত পার্শ্বে সমান শক্তি সম্পন্ন একটি স্থির তড়িৎ ক্ষেত্র থাকত তবে কাগজের টুকরা গুলো চিরুনীতে আটকে মাঝে ভাসত। তবে ঘর্ষনের ফলে চিরুনীতে এত শক্তিশালী স্থির ক্ষেত্র তৈরি হয়না যা দিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে।ম্যাজিক শো তে ম্যাজিসিয়ান দের এই ট্রিকস ব্যবহারের সম্ভাবনাও কম।

3) <u>Acoustic levitation</u>: আমার হিসেবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সবচেয়ে সহজ উপায়ে আপনাকে বোকা বানানো সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় ultrasonic sound. এই শব্দের কম্পাঙ্ক শ্রবণসীমা 20,000 Hz থেকে অনেক বেশি যার ফলে আপনি কখনই এই শব্দ শুনতে পারবেন না।

আরও একটা বিষয় হলো, magnetic levitation এর ক্ষেত্রে ভাসমান বস্তুর মধ্যে চৌম্বকত্ব এবং electrostatic levitation এর ক্ষেত্রে বস্তুকে চার্জিত হতে হয়। কিন্তু Acoustic levitation এর ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত নেই। তবে এটা দিয়ে সহজে বোকা বানানো গেলেও শব্দ তরঙ্গের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখা অনেক কষ্ট।

এছাড়াও রয়েছে optical levitation যেখানে আলো ব্যবহৃত হয়।Aerodynamic levitation যা আপনি দুটি hair dryer বা vaccum cleaner দিয়ে ব্যবহারিক ভাবেই পরীক্ষা করতে পারেন।আরও আছে hydrodynamic levitation যেখানে পানির স্রোতের সাহায্যে কোনো বস্তুকে উপরে ভাসমান রাখা হয়।

এত এত পদ্ধতি তো বললাম, এসকল পদ্ধতি কেউ যদি সঠিক ভাবে আয়ত্ত করে তো তার কাছে কোনো বস্তুকে শূন্যে ভাসমান রেখে কয়েকশ মানুষকে অবাক করা কি কঠিন কিছু??

এবার আসি মানুষের লেভিটেশনের ক্ষেত্রে।

"Though it is possible to levitate objects as big as humans, scientists are a long way off developing the technology for such feats"- Dr. Philbin

অর্থাৎ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উন্নতি এখনো অনেক বাকী যেনো মানুষ শূন্যে ভাসতে পারে।তবে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই জাদু দেখাচ্ছে, তখন উপরে বর্ণিত বিজ্ঞানের এতো উন্নতি হয়নি।কিন্তু তখনো প্রযুক্তি ছিল, ছিল যন্ত্র কারিগর এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা। তারা মানুষকে শূন্যে ভাসানোর যান্ত্রিক পদ্ধতি বের করেছিল, তবে সেটা মনস্তাত্ত্বিক শক্তি বা মেডিটেশন দিয়ে নয়।

গাছ মানবী রহস্য

জাহিরুল ইসলাম

২০১৪ সালের ৯ই অক্টোবর। রাত ৮ টা। ঘটনাস্থল- ঢাকা জেলার সাভার পৌরসভার রেডিও কলোনি এলাকার অদূরে মিলিটারি ফার্ম । হেঁটে হেঁটে কেরামত আলি বাসায় ফিরছিলেন। আশেপাশে মানুষজন তেমন কেউ ছিলনা। একটি আম গাছের নিচ দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাছের ওপর থেকে নারীকণ্ঠ শুনেই চমকে যান কেরামত আলী।

আশেপাশে তাকিয়ে কোন মানুষকে খুঁজে পেলেননা তিনি । মনে মনে আল্লাহ খোদাকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকেন তিনি । কিন্তু যত দ্রুত হাঁটতে থাকেন , মেয়েটার কন্ঠ আরো জোরে শোনা যেতে থাকে । মনে হতে থাকে ,এই বুঝি তাকে ধরে ফেলল । একটা সময় তিনি দৌড় শুরু করেন । প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড় যাকে বলে । কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই তিনি রেডিও কলোনির কাছাকাছি পৌছে যান । রাস্তায় কিছু মানুষজন দেখতে পেয়ে তিনি তাদেরকে ঘটনাটা জানান ।

ঢাকা-আরিচা মহসড়কে ডিউটিতে থাকা হাইওয়ে পুলিশের কাছে পৌছে যায় খবরটি। এ কান- ও কান করে অনেকেই তখন ঘটনাটি জেনে ফেলে । তখন দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে রেডিও কলোনির ওই এলাকার অনেক মানুষই রাতের বেলা এই মেয়েলি কন্ঠের ডাক শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু মনের ভুল মনে করে অনেকে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। অনেকে ভয় পেয়ে বিষয়টি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেননি। রেডিও কলোনির অনেকেই এই গাছের ভূত সম্পর্কে জানে। অনেক মা নাকি তাদের বাচ্চাদের গেছো ভূতের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতো।

যাই হোক, ৯ই অক্টোবর রাতে এলাকাবাসী ডিসিশন নিল, আজ গিয়ে দেখতে হবে ওখানে কি আছে। ভাল কিছু থাকুক অথবা খারাপ কিছু থাকুক, এর একটা হেস্তনেস্ত আজ করেই ছাড়ব। তারা পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য চায়। খবর শুনে প্রথমে পুলিশ, পরে ফায়ার ব্রিগেড ও সেনা সদস্যরা যান ঘটনাস্থলে।

রাত ৯টার দিকে সাভার মডেল থানা থেকে পুলিশ আসে। এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে তারা ঘটনা স্থলে পৌছায়। কেরামত আলী যে গাছটার নিচে মেয়েলি কন্ঠ শুনেছিলেন, সেই আম গাছে টর্চ মারা হলে দেখা যায়, গাছের উপরে সাদা কাপড় পরে কিছু একটা বসে আছে। দেখতে মানুষের মত আকারেরই, কিন্তু গাছের অনেক উপরের ডালে সে টি বসে ছিল, নিচ থেকে অনেক ডালপালার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছিলনা ।

পুলিশ এবং এলাকাবাসী ডাকাডাকি করলে আম গাছের উপরে বসে থাকা 'মানুষ' টা রেসপন্স করে । মেয়েলি কন্ঠে সে জানায়, 'আমার নাম আমেনা । আমি একজন জ্বীন । আমি এই গাছেই থাকি। আমাকে কেউ গাছ থেকে নামানোর চেষ্টা করবিনা। কেউ নামাতে আসলেই তার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাব।'

পুলিশ তখন কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এই মেয়েটিকে (অথবা জ্বীন টিকে) উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসের কাছে খবর পাঠায় । কিছুক্ষনের মধ্যেই ফায়ার ব্রিগেড এসে পৌছায় ।

সাভার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ওই নারীকে গাছ থেকে নেমে আসতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি গর্জন করে আমাদের শাপ-শাপান্ত করতে থাকেন। নিজেকে জ্বীন দাবি করে তিনি বলতে থাকেন, কেউ জোর করে তাকে নামানোর চেষ্টা করলে তার পরিবারের অমঙ্গল হবে। লাফিয়ে পড়ারও হুমকি দিতে থাকেন তিনি।
অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরাও আমেনাকে নামানোর আর কোন উদ্যোগ না নিয়ে খবর পাঠায় সেনাবাহিনীকে । যেহেতু এটা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া, সেহেতু আর্মি আসতে দেরি হয়নি । কিন্তু তারাও বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নিচে নামাতে পারেননি। আর কেউ তাকে নামানোর জন্য গাছে ওঠার সাহস ও পায়নি।

রাতে টহলে থাকা এক পুলিশ সদস্য বাংলানিউজ এর সাংবাদিককে জানান, সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা নিজেরা এক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেই ওই নারীকে গাছ থেকে নামিয়ে আনতে। একজন গাছে ওঠামাত্রই প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি গাছে ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। এ সময় তিনি উদ্ধারকারীদের 'খেয়ে ফেলব', 'কপালে অমঙ্গল ডেকে আনিস না' বলে হুংকার দিতে থাকেন । ভয় পেয়ে সেই পুলিশ সদস্য নিচে নেমে আসে ।

পুলিশ, আর্মি এবং ফায়ার ব্রিগেড তখন সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, উপরে থাকা প্রানীটা যদি মানুষই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে জীবিত উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করতে গিয়ে মানুষটা যেন আহত না হয়, সে ব্যাপারে কেয়ারফুল হতে হবে। জোর করে গাছে উঠে নামাতে গেলে সে আহত হতে পারে। কিংবা রাগ করে গাছ থেকে লাফ দিতে পারে। তার উপরে, রাতের বেলায়, আকাশে চাঁদ নেই এবং আলোর তেমন কোন সোর্স নেই বিধায় গাছের উপরের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাচ্ছেনা। সবাই তখন দিনের আলো ফোঁটার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় ।

এরই মাঝে ঘটনাস্থলে এসে পৌছায় মঞ্জিল হোসেন নামের এক যুবক। গাছের উপরে থাকা আমেনা বেগমকে তিনি নিজের মা বলে পরিচয় দেন। গাছের উপরে থাকা 'মানুষ' টির সাথে কথা বলে তিনি পরিচয় সম্পর্কে তাৎক্ষনিকভাবে নিশ্চিত হন ।

মঞ্জিল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, আমার মা দীর্ঘদিন ধরেই রাতে গাছে বসবাস করেন। তবে চক্ষু লজ্জায় বিষয়টি আমরা কাউকে প্রকাশ করিনি এতদিন। প্রায় এক যুগ ধরে প্রায়শই গাছে রাত্রিযাপন করছেন আমার মা। এক বেলায় গাছে উঠলে পরের বেলায় নির্দিষ্ট সময়ে নেমে আসেন তিনি। যেমন যদি বিকেল ৫টায় গাছে ওঠেন তাহলে গাছ থেকে নামবেন ঠিক ভোর ৫টায়। এটাই মায়ের নিয়ম। আমরা প্রথম প্রথম খোঁজ নিতাম। গাছে গাছে টর্চ লাগিয়ে মাকে খুঁজতাম। এখন বিষয়টি গা সওয়া হয়ে গেছে।

আজ রাতে গাছ থেকে ভূত নামানোর খবর শুনেই আমি ছুটে যাই সামরিক খামারে। এসে দেখি, গাছের উপরে আমার মা ই বসে আছে । মাকে নেমে আসতে বলি। কিন্তু কোনো কথাই শোনে না মা। যদিও আমি অবাক হইনি। শান্ত হয়েই আমরা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করি। মায়ের স্বভাব সম্পর্কে যা জানি, সেটা হচ্ছে টাইম হলে মা নিজেই একা একা নেমে আসবে। আপনাদের এত পুলিশ ফায়ার ব্রিগেড মই দড়িদড়া কিচ্ছু লাগবেনা।'

ঘটনাস্থলে আরো পাওয়া যায় রুবিনা বেগমকে। রুবিনা বেগম নিজেকে আমেনা বেগমের মেয়ে বলে দাবি করেন । তিনি জানান, মাঝে মাঝে মায়ের কথার সুর পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন পরিবারের কাউকেই তিনি চিনতে পারেন না। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে কথার সুর পরিবর্তন হয়ে যায়। তখনই বুঝতে পারি তার ওপর জ্বীন ভর করেছে। বেলা ৩টা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাকুল হন। একসময় তার চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাতে সংবাদ পাই সামরিক ফার্মের বনে একটি উঁচু আম গাছে উঠেছেন মা।

তিনি আরও জানান, অনেক বলেছে মানসিক ব্যাধি। আধুনিক চিকিৎসা করানোর সামর্থ আমাদের নেই। কবিরাজের শরণাপন্ন হয়েছি, তাবিজ-কবজ দিয়েছি। কিন্ত তিনি এখনো জ্বীনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

তাদের কথা সত্য প্রমান করেই ভোর ৪ টায় আমেনা বেগম সম্পূর্ন স্বাভাবিক অবস্থায় আম গাছ থেকে নেমে আসেন । গাছ থেকে নেমেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। ছেলে মঞ্জিল হোসেন এবং মেয়ে রুবিনা বেগম ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যান বাসায় । দুপুরে নিজ বাড়িতে জ্ঞান ফিরে পেলেও ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন তিনি । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলছিলেন না। তবে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে তার পরিবার। গাছ থেকে নেমেই প্রতিবারই এভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গী জ্বীন তাকে ছেড়ে গেলেই শরীরে ব্যথা শুরু হয় বলে বিশ্বাস পরিবারের সদস্যদের।

রহস্যের সমাধান

যোগাযোগ করা হলে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাইকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আব্দুর রহিম সাংবাদিকদের জানান, এটা অসুখ, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ওই নারী স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। গ্রামে অশিক্ষা আর কুসংস্কারের প্রভাবে এসব রোগীদের অনেকেই জ্বীনে ধরেছে বলে মনে করেন।

এ রোগ যথাযথ চিকিৎসায় ভালো হয় বলেও জানান চিকিৎসক আব্দুর রহিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের আধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম জানান, এ ধরনের রোগী সাধারণত স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। তারা মানসিক বিভ্রাট ও হ্যালুসিনেশনে ভোগে। তারা মনে করে কারো নির্দেশে পালন করতে এই কাজগুলো করে। অনেকে ভাবে আমিতো বানর বা জ্বীন তাহলে আমি বাসাতে কেন থাকবো। আমার তো থাকার কথা গাছে। সেই চিন্তায় সে গাছে উঠে থাকে। তার বিভ্রাট কেটে গেলে নেমে আসে। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগীদের সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখানো হলে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিলে ঠিক হয়ে যায়। তবে অনেক সময় লাগে পূর্ণ সুস্থ হতে।

ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকার অদূরে, সাভারে । ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া বলে সাংবাদিকরা খুব সহজে খবর সংগ্রহ করতে পারেননি । এই কারনে ১০ই অক্টোবরের পরে আর কখনো কোনো দিন কোনো প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় এই গেছো মানবী সম্পর্কে কোনো খবর পাইনি । (আপনারা কেউ কোনো খবর পেলে আমাদের জানান)

আসুন জেনে নেওয়া যাক স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটি সম্পর্কে । স্কিজোফ্রেনিয়া একটি তীব্র মাত্রার জটিল মানসিক রোগ । এটিকে এক-দু লাইনে সংজ্ঞায়িত করতে মেডিকেল গবেষকরা পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যান। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে মস্তিস্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত হয়। ফলে, রোগীর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দৈনন্দিন ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এদের অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, কাজকর্ম কোনকিছুই বাস্তবিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীরা নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি করে নেয় যার মাঝে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া থাকে না। বাস্তবতার সাথে তাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি আর বোধশক্তির এত বেশি ফারাকের জন্য অনেকেই এটিকে সাইকোসিস বলে থাকে। স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত রোগীরা নিজেরাও বুঝতে পারে না যে সে একটি মানসিক রোগের স্বীকার।

মানব মস্তিস্কে নিউরন বা স্নায়ুকোষের পরিমাণ অনির্দিষ্ট, এ সংখ্যাটি বিলিয়ন বিলিয়ন হতে পারে। প্রত্যেকটি স্নায়ু বা নিউরনের শাখা-প্রশাখা থাকে যার সাহায্যে সে অন্য স্নায়ু বা মাংসপেশি বা অন্য কোনো গ্রন্থি থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করতে পারে। নিউরন বা স্নায়ুকোষের শেষাংশে বা টার্মিনাল থেকে কতক রাসায়নিক পদার্থ নি:সৃত হয়। এগুলোকে নিউরোট্রান্সমিটার বা রাসায়নিক দূত বলা হয়ে থাকে। এগুলোর সাহায্যে মূলত নানা ধরনের উদ্দীপনা স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটিতে ওপরে আমরা যে যোগাযোগব্যবস্থার কথা বললাম সেটি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

আসুন মানব মস্তিষ্ককে আমরা টেলিফোন সুইচ বোর্ডের সাথে তুলনা করে স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা নেয়ার চেষ্টা করি। সুস্থ মস্তিস্কের সুইচিং সিস্টেম খুব ভালো কাজ করে। এতে নানান ধরনের সংবেদী তাড়না বা খবর আসে এগুলো কোনো রকম

তথ্য ঢোকায়। ব্রেনে বা মস্তিষ্কে তথ্যসমূহের সঠিক প্রক্রিয়াজাত হয়ে থাকে -ফলে ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি ও সার্বিক কার্যাবলি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। এবার আসি যারা স্কিজোফ্রেনিক তাদের নিয়ে। এদের নিউরনের যোগাযোগব্যবস্থায় গণ্ডগোল থাকে, ফলে তার প্রভাব পড়ে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও তার কাজকর্মে বা আচরণে। এদের প্রত্যক্ষণ বা পারসেপশন ও বোধশক্তি হয় বিঘ্নিত। চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন মস্তিষ্কে উল্টা-পাল্টা খেলায় মেতে ওঠে। কখনো এগুলো মস্তিষ্কে ঠাসাঠাসিভাবে ট্রাফিক জ্যামের মতো জ্যাম সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাদের আচরণ ভুল গন্তব্যের দিকে মোড় নেয়।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীদের অনুভূতি বা ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি শাণিত ও তীক্ষ্ণরূপ ধারণ করে। যেসব তথ্য পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, মস্তিষ্কে এক্ষেত্রে সেসব তথ্যকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই এসব তথ্যের তাড়নায় ব্যক্তি যে সাড়া দেয় তা থাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসংলগ্ন। স্কিজোফ্রেনিকরা এমন কথাবার্তা শুনতে পান যে, তাকে বলা হচ্ছে 'তুমি এটা কর ওটা কর'। অথচ আশপাশে কেউ নেই বা আশপাশে কেউ থাকলেও তারা কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এ অলীক বা গায়েবি আওয়াজকে বলা হয় 'অডিটরি হ্যালুসিনেশন'। একজন স্কিজোফ্রেনিকের উদাহরণ দিচ্ছি- , তিনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছিলেন পথের মাঝে চলন্ত বাসে তার কানে গায়েবি আওয়াজ আসতে শুরু করল এবং তা তার কানে বলল 'তুই এক্ষণি বাস থেকে নেমে যা'। যেই শোনা সেই কাজ । -তৎক্ষণাৎ স্কিজোফ্রেনিক রোগীটি চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ল। পরে সে যখন আবার সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে দেখা করল তখন দেখা গেল তার ক্ষতবিক্ষত চেহারা অর্থাৎ স্কিজোফ্রেনিকরা কানে যা শোনে তা বিশ্বাস করে ও সাথে সাথে মানে। স্কিজোফ্রেনিক রোগীরা অনেক সময় চোখেও এমন জিনিস দেখে যা অন্যরা দেখে না।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর মধ্যে বিচিত্র সব অনুভূতি দেখা যায়। সে কখনো মনে করে, পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ সে নিজে। সেই কারণে কেউ কোনো পরামর্শ বা উপদেশ দিতে গেলে সে মারমুখি হয়ে উঠে। স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। অনেক সাধারণ বিষয় সে সহজভাবে নিতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ সে প্রবল উত্তেজিত হয়ে উঠে। অকারণে উত্তেজিত হয়ে সে কাছের মানুষকে মারতে উদ্যত হয়। বকাবকি ও গালিগালাজ হয়ে উঠে তার সারাক্ষণের সঙ্গী। কোনো রোগীকে দেখা যায়, এই হাসছে আবার কোন কারণ ছাড়াই কাঁদছে। সত্যিকার পরিস্থিতির সাথে এদের আবেগজনিত প্রকাশ অনেকাংশে খাপ খায় না।

স্কিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা একটু দীর্ঘমেয়াদি। রোগীকে মেডিকেশন বা ওষুধ নিয়মিত সেবন করাতে হয়। অনেকের বেলায় সহায়তাকারী বা সমর্থনমূলক কাউন্সিলিং করা হয়। অবশ্য অনেক রোগীর ক্ষেত্রে পুনর্বাসন চিকিৎসার অংশ হয়ে দাঁড়ায়। রোগীকে বাসায় রেখে বা হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করাবেন কি না তা মূলত রোগটির তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। তাই স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে বা পরিবারের সদস্যকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

স্কিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রে ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারের ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়। এটি স্নায়ুতন্ত্রে বিভিন্ন কোষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে। তাই দেখা যায় যে, স্কিজোফ্রেনিকদের মস্তিষ্কে ডোপামিন রিসেপ্টরের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে এবং এদের মস্তিষ্কে সাধারণের তুলনায় অসংলগ্ন বা অসামঞ্জস্য সংকেত বহন করে থাকে।

বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় , বাংলাদেশের প্রায় ০.২৪% মানুষ (প্রায় ৪ লক্ষ) স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত । এদেরকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হলেই এরা সুস্থ হয়ে উঠবে ,কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুসংস্কারের কারনে এদেরকে পীর ফকির সাধু সন্যাসীর কাছে নেওয়া হয় । সঠিক মেডিকেল চিকিৎসার অভাবে এদের রোগ ভাল হয়না ।

সাভারের এই ঘটনায় প্রমানিত হল যে গাছের উপরে একজন মানুষই বসে ছিল , কোনো জ্বীন ভূত বসে নেই। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক গ্রামে অনেক গেছো ভূতের গল্প শোনা যায়। অনেক জায়গায় বড় বট, শ্যাওড়া,তেতুল বা অন্যান্য বড় গাছের নামের সাথে ভূতের গল্প জড়িত থাকে । গল্পগুলো অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে, সেগুলার কোনোটাতেও আসল ভূতের কোনো অস্তিত্ব নেই। সাভারের গেছো মানবীর মতই কোনো ঘটনা হয়তো ওই গাছগুলোর সাথে জড়িত । পরে মানুষের মুখে মুখে গল্পগুলো বিবর্তিত হয়ে হয়ে এখন ভূতের গুজব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাভারের এই ঘটনার অনুরূপ ঘটনা পাওয়া যায় গোপালগঞ্জে, ২০১৭ সালের ২৮শে মার্চ। মুকসুদপুর উপজেলার কৃষ্ণদিয়া বাকু মৃধা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী

হাবিবা খাতুন আকস্মিকভাবে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। বাড়ির লোকজন বিভিন্ন স্থানে তাকে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। একপর্যায়ে বাড়ির লোকজন বাড়ির পাশের ৫০ ফুট উচ্চতার একটি তালগাছের মাথায় হাবিবা খাতুনকে দেখতে পান। স্থানীয় লোকজন তাকে তালগাছ থেকে তাকে নেমে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে কারো কোনো অনুরোধে কর্ণপাত করেনি। অনেকে তাকে নামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

এ সময় তাকে নামাতে গেলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে ‘তালগাছই আমার বাড়ি, তালগাছই আমার ঘর। তাই আমি এখানেই থাকবো। আমি নামবো না।’ এ ঘটনাকে ওই কিশোরীর উপর জ্বীনের আসর বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। তাদের ধারণা জ্বীনের টানেই সে এই বিশাল তালগাছে উঠে গেছে। আবার কেউ কেউ হাবিবার উপর কোনো অশরীরি আত্মা ভর করেছে বলেও মন্তব্য করছেন।

পরবর্তীতে ফায়ার ব্রিগেডের সহায়তায় তাকে ওই রাতেই নামানো হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাবিবা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত।

এডাল্টদের তুলনায় বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের স্কিজোফ্রেনিয়া বা ন্যান্য মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে । অশিক্ষিত বাবা-মা এই ঘটনা গুলোকে ‘জ্বীনের আছর’ বলে মনে করে। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে দেখা যায় মজু ব্যাপারীর মেয়েকে ভূতে ধরেছে মনে করে তার উপর ওঝার সাহায্য অনেক রকম অত্যাচার করা হয়। কিন্তু ওই মেয়েটার সকল সিম্পটম এর সাথে স্কিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো মিলে যায় । উপযুক্ত চিকিতসা সহায়তা পেলে মেয়েটার জন্য অনেক উপকার হত।

মীরপুরের ভূতের বাড়ির দুই বোন

জাহিরুল ইসলাম

মীরপুর । সেকশন ৬ । ব্লক সি । রোড ৯ । বাড়ি নাম্বার ১ । সাড়ে ৭ কাঠার উপরে জায়গা আছে এই প্লটে । এই বাড়িটা এলাকাবাসীর কাছে ভূতের বাড়ি নামে পরিচিত ।

২০০৩ সালে প্রথম এই ভূতের বাড়ি নিয়ে মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়। ওই সময় পাশের বাড়ির ছাদ থেকে লোকজন দেখতে পায় যে বাড়ির ভেতরে ২ জন মেয়ে একটি খেঁজুর গাছের নিচে কবর খুঁড়েছে এবং একটি ডেডবডি সেখানে কবর দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিষয়টা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেখতে পায় ,বাড়িতে মাত্র ২ বোন এবং তাদের মা থাকতো। এদের অন্য কোনো আত্মীয়স্বজনের কথা কেউ জানাতে পারেনি। এদের মা মারা যাওয়ার পরে ২ বোন অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনকে খবর না দিয়ে নিজেরাই কবর দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

পুলিশ তখন ডেডবডিটা উদ্ধার করে মীরপুরের জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থানে দাফন করে। তবে ২ বোনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তারা ওখানেই বসবাস করতে থাকে ।

তখন জানা যায়, এই বাসায় থাকতো মোট ৫ জন মানুষ । ফ্যামিলির প্রধান ছিলেন শরিফুদ্দিন আহম্মেদ ভুঁইয়া । তিনি মারা যান ১৯৮২ সালে। তার স্ত্রীর নাম রওশন আরা বেগম । (২০০৩ সালে মারা গেলেন) তাদের ৩ মেয়ে, কামরুন নাহার হেনা, ডাক্তার আইনুন নাহার রিতা এবং ইঞ্জিনিয়ার নুরুন নাহার মিতা ।

মেজো মেয়ে ডাক্তার আইনুন নাহার রিতা সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি করেন ১৯৮৮ সালে। বিসিএস দিয়ে ১৯৯১ সালে সরকারী চাকরিতেও ঢুকেন কিন্তু ১৯৯৬ সালে কোনো এক অজানা কারণে চাকরি থেকে রিজাইন নেন ।

ছোট মেয়ে নুরুন নাহার মিতা ১৯৯২ সালে বুয়েট থেকে পাশ করেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট নিয়ে । সিলেট গ্যাস ফিল্ডে চাকরি করেছেন কিছুদিন । বুয়েটের পেট্রোলিয়াম ডিপার্টমেন্টের কনসাল্ট্যান্ট হিসেবেও চাকরি করেছিলেন কিছুদিন । কোন এক অজানা কারনে ২ বোনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘদিন বাসায় মায়ের কাছেই বসে থাকতেন ।

২.

এলাকাবাসী জানায় , দাফনের কয়েকদিন পর থেকেই মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। কারো সঙ্গেই যোগাযোগ করতো না, কথাও বলতো না। মাঝে মাঝে তাদের গাছের আম পাড়তে কেউ গেলে বকাঝকা করতো, এই যা। এলাকার অনেকেই নাকি তাদের মৃত মাকে হাঁটাচলা করতে দেখেছে। বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেছে। এরপর থেকেই নাম হয়েছে ভূতের বাড়ি।

১২ বছর ধরে রিতা-মিতার বাড়ির পাশেই রিক্সা মেরামতের যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেন জুবেইদা বেগম। রিতা-মিতাকে দীর্ঘদিন দেখেছেন তিনি। জীবিত থাকতে তাদের মাকেও দেখেছেন। তাদের বিষয়ে জানতে চাইলে জুবেইদা বেগম বলেন, দুজন সবসময় বোরকা পরতো। কারো সঙ্গে কথা বলতো না। দিনের বেলায় কখনোই বের হতো না। মা মারা যাওয়ার পর মাঝে মাঝে বোরকা পরে বাজার করতে যেত।

মো. সোহেল নামে ওই গলির এক বাসিন্দা বলেন, আমরা যখন রাতে রাস্তায় আড্ডা দিতাম তখন তাদের বের হতে দেখতাম। দুজন ১১টার পর গলিতে হাঁটতে বের হত। অনেকদিন ১২টার সময় দেখেছি।

এলাকাবাসীর কাছে রিতা মিতা দাবি করতেন , আল্লাহর সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয় । এই বাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাবনা । এইবাড়ি থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই আমাদের বড় বোন কামরুন নাহার হেনা বাড়িটা দখল করে নেবে। তাই আমরা কোথাও যাইনা, সারাক্ষণ বাসাতেই থাকি ।

পরবর্তী কয়েক বছর এই ২ বোন আক্ষরিক অর্থেই বাসা থেকে বের হতেন না। বাজার করতে বের হতেন না। দিনের পর দিন খাবার, কাপড়চোপড় কিংবা চিকিৎসা সরঞ্জাম ছাড়া তারা কিভাবে বেঁচে আছে সেটা একটা রহস্য ছিল এলাকাবাসীর কাছে। ঈদ কিংবা অন্য কোনো অকেশনেও কখনো তাদেরকে কেউ বের হতে দেখেনি । বাড়ির ভিতরে কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে ২ বোন তাদের গালাগাল করে তাড়িয়ে দিত ।

৩.

এই ভূতের বাড়ির রহস্য সম্পর্কে খবর পৌছে যায় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights -BSEHR) এর কাছে ।

২০০৫ সালের ৮ জুলাই মানবাধিকার কমিশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এডভোকেট এলিনা খান , ইনভেস্টিগেশন অফিসার এডভোকেট ওয়ালিউল ইসলাম লোনা এবং লিগাল রিটেইনার এডভোকেট মাহমুদা আক্তার ভূতের বাড়িতে এক অভিযান চালান । এলাকাবাসীর সহায়তায় ২ বোনকে তারা তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন । দীর্ঘদিন চারদেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকায় শরীরের স্বাভাবিক গড়ন হারান তারা। দিনের পর দিন না খেয়ে তারা হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের শরীরের নানা ধরনের রোগব্যাধী বাসা বেঁধেছিল। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন তখন তাদেরকে হাসপাতালে পাঠায় ।

বাড়ির ভিতরে দেখা যায় ,ইলেক্ট্রিসিটি কিংবা গ্যাসের কোনো লাইন নেই । সম্ভবত ইলেক্ট্রিক বিল এবং গ্যাস বিল নিয়মিত জমা না দেওয়ার কারনে তাদের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল । রাতের বেলা তারা কোন লাইট ছাড়াই ভূতের বাড়িতে থাকতো । প্রচন্ড গরমের দিনেও তারা ফ্যান চালাতে পারতো না । গ্যাস না থাকায় তারা রান্না বান্নাও করতে পারতোনা । বাড়ির ভিতরটা প্রচন্ড নোংরা ছিল । ২ বোন ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখতোনা । বাড়ির ফ্লোরে প্রচুর দুধের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছিল । ধারনা করা হয়, বছরের পর বছর ধরে ২ বোন কেবলমাত্র প্যাকেটের গুড়ো দুধ পানি দিয়ে গুলিয়ে খেয়ে বেচে ছিল ।

(দুধ একটি সুষম খাদ্য । শর্করা, আমিষ,স্নেহ,ভিটামিন খনিজ লবন,পানি—আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ৬ টি উপাদানই আছে এর মধ্যে। ডাক্তার হওয়ার কারনে এটা রিতার জানা ছিল। একারনে সম্ভবত দুধ খেয়ে দীর্ঘদিন বেচে থাকার প্লান করেছিলেন।)

এলাকাবাসী তখন দাবি করেন,২ বোন বাসার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের নামাজ রোজা এবং অন্যান্য ইবাদাত করতেন । তারা তাদের মৃত মা কে ফিরিয়ে আনার জন্য এইসব ইবাদাত করতেন ।

ডাক্তাররা রিতা মিতাকে পরীক্ষা করে বলেন, এরা শারীরিক এবং মানসিক ২ ধরনের রোগেই ভুগছেন । দীর্ঘদিন ধরে এদের চিকিৎসা দরকার ।

খবর পেয়ে এদের বড় বোন কামরুন নাহার হেনা বোনদের দেখতে আসেন । সাংবাদিকদের তিনি বলেন ''১৯৮২ সালে বাবা মারা যাওয়ার পরে আমাদের ফ্যামিলি খুব অসহায় হয়ে পড়ে । তেমন কোন মুরুব্বি ছিল না আমাদের আশেপাশে সাপোর্ট দেওয়ার মত । সাড়ে ৭ কাঠা জমির এই বাড়িটা রক্ষা করা বেশ একটা সাইকোলজিকাল প্রেশার হয়ে যায় আমাদের জন্য । ছোটো ২ বোনের ব্রেইনে সম্ভবত অনেক প্রেশার পড়ে তখন । ১৯৮৪ সালে আমার বিয়ে হয়ে যায় । ২ বোন তখন আমাকে সন্দেহ করা শুরু করে । আমাকে বলতো, আমি এবং আমার জামাই মিলে নাকি ওই বাড়ি দখল করার চেষ্টা করছি । আমি ওই বাসায় বেড়াতে গেলেও আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতো । তাই আমিও আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমিয়ে দেই ।২০০৩ সালে মা মারা যাওয়ার পরেও আমাকে কোনো খবর দেয়নি । পরে এলাকাবাসী জানার পরে আমি জানতে পারি''

হেনার সহায়তায় দুই বোনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অনেকদিন ধরে এদের শারীরিক এবং মানসিক রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয় । চিকিৎসা নিতে বারবার এরা অস্বীকৃতি জানায় ।এদেরকে এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করতে চাইলে এরা আপত্তি জানাতো । দুইজন সবসময় একসাথে একই ওয়ার্ডে পাশাপাশি থাকতে চাইতো।

যাই হোক, ৮ মাস চিকিৎসার পরে তারা বাসায় ফিরে আসে । ডাক্তার রিতাকে বংগবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে (পিজি হাসপাতাল) ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্টোপ্যাথোলজিতে একটা চাকরি দেওয়া হয় । তবে ছোট বোন ইঞ্জিনিয়ার মিতা কোনো চাকরি খুজে পায়নি । সে বাসায় বসেই কোরান শরীফ অনুবাদ করা শুরু করে ।

৪.

ডাক্তার তাদের মানসিক রোগ সারার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কিছু ওষুধ খেতে বলেছিল । কিন্তু ২০০৭ সালে এসে তারা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় । ফলস্বরুপ ২০০৭ সালে তারা আবার আগের মত অবস্থায় চলে যায় । বাসা থেকে বের হতোনা । পিজি হাসপাতালে এক মাস ধরে ডাক্তার রিতা এ্যাবসেন্ট ছিল । তখন হাসপাতালের সহকর্মীরা খোজ খবর নিতে আসে । এলাকাবাসী জানায় , রিতা মিতা আবার আগের মত হয়ে গেছে । বাসা থেকে বের হয় খুব কম । মাঝে মাঝে দোকানে এসে গুড়ো দুধের প্যাকেট কেনে ।

অফিস কলিগ এবং এলাকাবাসী তখন আবার রিতা মিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন । আড়াই মাস চিকিৎসার পরে তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে । বড় বোন হেনা তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে রাখার অনেক চেষ্টা করে , কিন্তু অন্য ২ বোন সেটা রিফিউজ করে এবং মীরপুরের 'ভূতের বাড়ি'তে গিয়েই বসবাস করতে থাকে । বেশ কিছুদিন ভালই ছিল তারা , কিন্তু

সম্ভবত এক সময় তারা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় । ফলস্বরূপ , আবার তারা চাকরি বাকরি বাদ দিয়ে নিজেদেরকে ঘরের ভেতরে বন্দী করে রাখে ।

৫.

২০১১ সালে বাংলাদেশ প্রতিদিন এর ২ সাংবাদিক দেয়াল টপকে ভূতের বাড়ির ভেতরে ঢোকেন । সেখানে তারা এক লোমহর্ষক সিচুয়েশন দেখতে পান ।

দীর্ঘক্ষণ দরজা খোলার অনুরোধের পর ঘর থেকে শ্লথগতিতে বের হয়ে আসেন ছোট বোন মিতা। চাবি দিয়ে খোলেন ঘরের দরজা। দরজা খুলে দুর্বল মিতা ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবেদককে ভেতরে ঢুকতে বলেন। আঙিনার কাঁটাযুক্ত আগাছা পেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই তীব্র দুর্গন্ধ নাকে লাগে। বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন ঘরটি ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্য সময় ঘরে মোমবাতি জ্বললেও গতকাল তাও ছিল না। দেয়াল হাতড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, অগোছালো ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালিশ-কাঁথা থালা-বাসন হাঁড়ি-চামচ ইত্যাদি। পুরো ঘর শুকনো পাতা, ময়লা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল। ঘুরে বেড়াচ্ছিল ইঁদুর ও তেলাপোকা। দেয়ালে ঝুলছিল মাকড়সার বড় জাল। লক্ষ্য করে দেখা গেল, চাদর দিয়ে ঘরটিকে দুই ভাগ করেছেন দুই বোন। প্রথমভাগে বালতিতে টয়লেট সারছেন। দ্বিতীয়ভাগে কাপড় বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করেছেন। চাদরের অপরপ্রান্তে দেখা হয় কঙ্কালসার রিতার সঙ্গে। অন্ধকার ঘরে রিতার নিথর দেহ ভয়ের উদ্রেক করে।

মিতা জানান, এক সপ্তাহ ধরে রিতা কথা বলা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন। পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। কয়দিন ধরে চোখের ইশারায় কথা বলছেন রিতা। কেমন আছেন জানতে চাইলে মিতা বলেন, 'খুব খারাপ। টানা ৪০ দিন না খেয়ে আছি আমরা। টাকা নেই। খাবার না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। দুর্বল দেহে ঘরের বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। যোগাযোগ না থাকায় আমাদের সাহায্য করতেও কেউ আসছে না।' মিতা বলেন, বাড়িটি তাদের মায়ের। ঘরের সামনের ফার্নিচারের দোকানের মাসিক ভাড়ায় তাদের সংসার চললেও বহুদিন ধরে দোকান মালিক তাদের ভাড়া দিচ্ছেন না।' আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে জানতে চাইলে মিতা বলেন, 'তাদের মা-বাবা কানাডায় অকল্যান্ডে আটকে পড়েছেন।' অথচ মিতা আলাপচারিতার একপর্যায়ে বলেছিলেন, ১৯৮২ সালে তাদের বাবা এবং ১৯৯৬ সালে মা মারা যান। মা-বাবার সঙ্গে আধ্যাত্মিক উপায়ে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। মিতা জানান, তারা পাঁচ বোন। এর মধ্যে তিন বোন রিনা, হেনা ও আসমাকে ছোটবেলায় অপহরণ করা হয়েছে। এ কথায় পরিষ্কার হয় মানসিকভাবে সুস্থ নন তিনি।

মিতা আরও জানান, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি তার ও রিতার আগ্রহ তৈরি হয়। মিতা জানান, তারা সবার সঙ্গে মিশতে চান। কিন্তু লোকজন প্রথম কয়েক দিন আগ্রহ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বললেও পরে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন। মিতা বলেন, বড় বোনের কারণে এখনো আমি বন্দী রয়েছি। রিতা এই বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যত্র যেতে চায় না। আর বোনকে রেখে আমিও অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না।' বোনের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বিগ্ন মিতা বলেন, 'আমরা বাঁচতে চাই। আমরা চিকিৎসা চাই। আমাদের বাঁচান। এই বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হতে চাই।'

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার এডভোকেট এলিনা খান তখন সাংবাদিকদের বলেন, পারিবারিক জীবন যাপনের অভাবেই ২ বোনের ক্ষেত্রে বারবার একই ঘটনা ঘটছে । এরা কেউ বিয়ে করেনি । বড় বোন হেনার সাথেও সম্পর্ক খুব একটা ভাল নয় । এদেরকে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। এইজন্য বারবার এদের মানসিক রোগ ফিরে আসছে।তাঁদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া যেকোনো কাজে মনটাকে ব্যস্ত রাখলে হয়তো তাঁরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন। সবচেয়ে বেশি ভয় লাগে, তাঁরা যদি খুব অসুস্থ হন কিংবা মৃতপ্রায় অবস্থা হলেও তো কেউ জানবে না।''

বেশ কিছুদিন ধরে চিকিৎসা নেওয়ার পরে ২ বোন এবার বড় বোন হেনার বাসায় গিয়ে উঠল । এলাকাবাসী জানায় , এরপরে ২ বোনকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । দীর্ঘদিন ধরে এদের আর কোনো খোজখবর কেউ জানতোনা । এদের বাড়ির সামনে একটি ফার্নিচারের দোকান আছে । নাম -উডল্যান্ড ডোর এন্ড ফার্নিচার । এর দোকান থেকে মাসে মাসে ভাড়া নিত ২ বোন । ২০১১ সালের পর থেকে বড় বোন হেনার জামাই মাসে মাসে ভাড়া নেওয়া শুরু করে দোকান থেকে ।

৬.

১০ই জুন ২০১২ সালে একজন ব্লগার খুজে পান এই দুই বোনকে । ধানমন্ডির শংকরে ২ বোন একটি বাসা

ভাড়া নিয়েছেন । এই বাসার একটু দূরেই বড় বোন হেনার বাসা । আমি ব্লগটা থেকে এখানে কোট করছি

রিতা-মিতার বড় বোনের বাসা,রয়েলে গার্ডেনে তাদের খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, দুই মাস আগে তারা বড় বোনের বাড়ি ছেড়ে কাছাকাছি একটি একতলা ভাড়া বাসায় উঠেছেন। গত ডিসেম্বরে রিতা-মিতার সঙ্গে এই প্রতিবেদকের যখন শেষ সাক্ষাৎ হয়, তখনই দুই বোন বড় বোনের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে নিজেদের অনিচ্ছার কথা জানান। এ ধারাবাহিকতায় গত মার্চে তারা বড় বোনের দোতলা বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। এ ব্যাপারে রিতা-মিতার দুলাভাই ও হেনার স্বামী আবদুল মমিন বলেন, ‘স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্যই রিতা-মিতা আমাদের ছেড়ে গেছে। বহু অনুরোধের পরও দুই বোন আমাদের কথা রাখেনি। নিজ পরিবার ও একমাত্র সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে আমরাও আর তাদের ধরে রাখেনি।’ জানা যায়, গত বছর জুনে ভূতের বাড়ি থেকে রিতা-মিতাকে উদ্ধারের পর বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান কিছুদিন তাদের চিকিৎসা করেন। রিতা-মিতার দাবি, তাদের স্কিজোফ্রেনিয়া নেই। বর্তমানে তারা চিকিৎসা বন্ধ রেখেছেন।

তবে নতুন জীবনে তারা কারও সাহায্য নিচ্ছেন না। এরই মধ্যে ডা. রিতা ধানমণ্ডির একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। তা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। মিতা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাজে জড়িত না থাকলেও পবিত্র কোরআন শরিফের ইংরেজি অনুবাদ নিয়েই বর্তমানে ব্যস্ত। তাকে এ কাজে মিতাও সহযোগিতা করছেন। মিরপুরে ভাড়া দেওয়া ফার্নিচারের দোকান ‘উডল্যান্ড’-এর টাকা দিয়ে ভালোই কাটছে দুই বোনের জীবন। আগের মতো তারা কখনো বসুন্ধরা, কখনোবা নন্দন মেগাশপে গিয়ে কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন। রিতা-মিতার ভাগ্নি সামিনা জানান, খালারা যত দিন তাদের রয়েল গার্ডেনের বাসায় ছিলেন ততদিন তাকে নিয়েই ঘুরতে যেতেন বা আড্ডা দিতেন। রিতা-মিতার এখন অধিকাংশ সময় কাটে লেখালেখিতে। শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে তারা এখন সুস্থ। কথাবার্তায় নেই কোনো অসংলগ্নতা। কোরআন শরিফ অনুবাদের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বিশ্ব সংকটের কারণ নিয়েও তারা একটি বই অনুবাদ করছেন। দুজনই জানান, পুরনো পেশায় ফিরে যাওয়ার আর ইচ্ছা নেই। রিতা-মিতা বলেন, ‘ইসলাম ধর্মের প্রচারে বাকি জীবন কাজ করে যেতে চাই। আমাদের মা রওশনারা বেগমেরও ইচ্ছা ছিল আমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেব। এ জন্য আমরা সমমনাদের নিয়ে একটি গ্রুপ গড়ে তুলতে চাই।

‘বিয়ে করবেন না?’ এমন প্রশ্নে প্রকৌশলী মিতা জানান, ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে মতের মিল হবে এমন কাউকেই বিয়ে করব। এ প্রসঙ্গে ডা. রিতা জানান, যে ছেলে অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকেই বিয়ে করবেন। রিতা-মিতা বলেন, বড় বোন হেনা ও তার স্বামী আবদুল মমিন তাদের অনেক যত্ন নিয়েছেন। এটি তাদের বড় পাওয়া। হেনা জানান, ‘বহু দিন অভিভাবকহীন থাকার কারণে রিতা-মিতা স্বাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই তারা যখন আবারও আলাদা থাকতে চাইল আমি আর বাধা দেইনি’। তিনি বোনদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন বলে জানান।

৭.

এরপর দীর্ঘদিন কোনো সাংবাদিক তাদেরকে আর খুজে পাননি । লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন তারা । ২০১৩ সালে ২৪শে জুন বগুড়া সদর থানার পাশে অবস্থিত আকবরিয়া হোটেলে ২ রহস্যময়ী নারীকে আটক করে পুলিশ ।

হোটেলের ম্যানেজার লিটনুর রহমান জানান, ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টার দিকে দু’জন নারী রাত্রি যাপনের জন্য আসেন। খাতায় তারা একজন ডা. আইনুন্নাহার (বয়স ৪৯) ও অন্যজন প্রকৌশলী নুরুন্নাহার (বয়স ৪৫) নাম লেখেন। বাবার নাম লেখেন মৃত সরফ উদ্দিন। ঠিকানা লেখা হয় বি.বাড়িয়ার নাসিমনগরের মগুলগ্রাম। তারা প্রায় চার মাস আবাসিক হোটেলের ২১ নম্বর রুমে থাকেন। হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া করতেন ও রীতিমতো বাইরে বেড়াতে যেতেন। এ সময় তারা ৭০ হাজার টাকা ভাড়া পরিশোধ করেছেন।‘তাঁরা প্রায় সারা দিন হোটেল কক্ষেই থাকতেন। কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। কারও সাহায্যও নিতেন না। মাঝেমধ্যে একজন বাইরে এসে খাবার নিয়ে যেতেন। কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে তাঁরা হোটেল ভাড়া পরিশোধ না করায় তাঁদের খোঁজ করা হয়। এ সময় তাঁরা অসংলগ্ন ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলেন। কয়েক দিন ধরে দরজা বন্ধ করে দিলে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।’

ম্যানেজার আরও জানান, এক সপ্তাহ ধরে তারা হোটেল ভাড়া বন্ধ করে দেন। গত দু'দিন ধরে ঘর থেকে বের হন না। খাওয়া-দাওয়া করেননি। বিষয়টি সদর থানার পুলিশকে অবহিত করা হয়। রোববার দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে পুলিশ ও আইনজীবীরা তাদের দু'বোনকে নিয়ে যান।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র সদস্য অ্যাডভোকেট শাহজাদী লায়লা জানান, রোববার দুপুরে সদর থানা পুলিশ তাকে বিষয়টি জানালে তিনি প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর পুলিশের সহযোগিতায় শহরে থানা রোডের আকবরিয়া আবাসিক হোটেল থেকে ডা. রিতা ও প্রকৌশলী মিতাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করেন। প্রথমে তারা দরজা খুলতে রাজি হননি। তাঁদের অনুরোধ করে বলা হয়, 'আপনারা কিছু খান'। তাঁরা বলেন, 'হোটেলের সব শয়তান, সব দোজখে যাবে, বাংলাদেশ শয়তানে ভরে গেছে, সব দোজখে যাবে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া দরজা খোলা যাবে না।' প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দরজা খুলে মিতা বলেন, 'ম্যাডাম, ওনার হুকুম হয়েছে আপনার সঙ্গে যাওয়ার, চলুন আমরা যাব। একটু দাঁড়ান ও (বড় বোন) ছাত্রী পড়াচ্ছে, পড়ানো শেষ হলেই যাব।'

ইঞ্জিনিয়ার মিতা আরো বলেন, 'তারা দু'বোন বাংলাদেশের মালিক। বাংলাদেশ দোজখ হয়ে গেছে। আল্লাহর নির্দেশে তারা কানাডা থেকে বগুড়ায় এসেছেন। তারা এখনও যুদ্ধ করছেন। শত্রুরা তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। মিরপুরের বাড়ি উৎসর্গ করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ পেলেই তারা আবারও কানাডায় ফিরে যাবেন।'

যাইহোক,অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের রুম থেকে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয় । কিছুদিন পরে তারা ঢাকায় আসে এবং বড় বোন হেনা ২ বোনের দেখাশোনার দায়িত্ব নেন ।

৮.

এরপরের গত ৫/৬ বছর ধরে কোনো সাংবাদিক এদেরকে আর খুজে পায়নি । এ্যাটলিস্ট, আমি এদের সম্পর্কে আর কোনো নিউজ পাবলিশ হতে দেখিনি কোথাও। উডল্যান্ড ফার্নিচারের ভাড়া তুলতেছে বড় বোন হেনা এবং সেনাবাহিনীতে কর্মরত বড় দুলাভাই । ওই দোকানের নয়ন নামের একজন কর্মচারী বলেন, ''তাদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া নিষেধ আছে। হেনা আপা ভাড়া নিতে এসে আমাদের বলে গেছেন, যদি কোনো মিডিয়া আমাদের কাছে যায় তাহলে তোদের বিপদ আছে?''

রিতা-মিতাদের বাড়ির পেছনের নয় নম্বর রোডের তিন নম্বর বাড়িটি একটি বহুতল বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট। এর ম্যানেজার মো. মামুন শিকদার বলেন, ''ভাই, রিতা-মিতার কথা আমি শুনেছি। কিন্তু তারা এখন আর এখানে থাকে না। শুনেছি তারা লন্ডনে থাকেন তাদের বোনের সঙ্গে। তার দুলাভাই সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। শুনেছি তিনি এসে প্রতি মাসে ভাড়া নিয়ে যান।''

মামুন শিকদার আরও বলেন, ''আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েদের খেলার সময় বল ওই বাড়ির মধ্যে চলে গেলে আমি দেয়াল টপকে ওই বাড়ির মধ্যে যাই। সেখানে ঝোপঝাড়ে ভরা। মনে হয় কয়েক শ বেজি সেখানে বাস করে। একটি একতলা ভবনের দুটি ঘর কতকাল ধরে বন্ধ, আল্লাহই জানে। আর চৌচালা টিনের ঘরের দুটি রুমে ফার্নিচারের দোকানের মালামাল রাখে। তবে এখানকার কেউই রিতা-মিতা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না।''

ডাক্তার রিতার পুরনো কর্মস্থল পিজি হাসপাতালে গিয়েও কেউ তাদের সম্পর্কে কোনো ইনফর্মেশন দিতে পারেনি ।

রহস্যের সমাধান

এই ২ বোনের চিকিতসার শুরু থেকেই ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহিত কামাল । অনেকেই হয়ত তার লেখা বিভিন্ন বই পড়েছেন । মন নামে ধানমন্ডিতে তার নিজের একটি মানসিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রয়েছে ।

ডক্টর মোহিত কামাল এবং অন্যান্য ডাক্তাররা রিতা মিতার এই রোগকে স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) বলে চিহ্নিত করেছেন । দিনের পর দিন কারো সাথে যোগাযোগ না রাখা এবং ঘরের ভেতর বসে নিজের মনে কাজ করে যাওয়া--এটা কেবলমাত্র স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর পক্ষেই সম্ভব । স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী এক ধরনের ঘোরের ভেতরে বাস করে । তাদের আশেপাশের জগতের রিয়েলিটির সাথে তারা ফ্যান্টাসিকে এক করে ফেলে । নিজের তৈরি করা কাল্পনিক জগতে বাস করতে থাকে তারা । রিতা মিতা যে কাল্পনিক জগত তৈরি করেছিল, সেই জগতে তাদের মৃত বাবা মার সাথে তাদের রেগুলার যোগাযোগ হত । সত্যিকার জগতের সিচুয়েশন (বাসায় খাবার নেই,বাসা নোংরা,চাকরি করতে যাওয়া উচিত ইত্যাদি) এর তুলনায় কাল্পনিক জগতের ঘটনাগুলো তাদের

কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন ছিল ।এই কারনে তারা কাল্পনিক জগত নিয়েই পড়ে ছিল, সত্যিকার জগতের ব্যাপারে উদাসীন ছিল ।

যারা বিভিন্ন ধরনের নেশা করে, এই ধরনের ঘটনা মাঝে মাঝে তাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। কিন্তু স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটা নর্মাল কোন নেশার চেয়ে বেশি মারাত্মক । কারন নেশা কয়েক ঘন্টা পর কেটে যায় , কিন্তু স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর হ্যালুসিনেশন দিনের পর দিন চলতেই থাকে ।

রিতা-মিতার প্রথম চিকিৎসক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘‘প্রথমে আমি রিতা মিতাকে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। তখন তাদের অভিভাবক ছিলেন অ্যাডভোকেট এলিনা খান। তিনি ওদের আমার চেম্বারে নিয়ে আসতেন। কয়েক মাসের চিকিৎসায় তারা সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে তাদের আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর রিতা-মিতাকে আর আমার কাছে আনা হয়নি। কেন আমার কাছে আনা হয়নি, সেটা আমি বলতে পারব না।’’

মোহিত কামাল বলেন, ‘‘সুস্থ হওয়ার পর রিতাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যলয়ে চাকরি দেওয়া হয়। তবে ওই সময়ে মিতাকে চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। হয়তো চাকরিতে ব্যস্ত থাকতে পারলে দুই বোন সুস্থ থাকত।’’

তবে রিতা-মিতার পুরোপুরি সুস্থ থাকতে না পারার জন্য আশপাশের মানুষের কিছু নেতিবাচক আচরণ দায়ী বলে মনে করেন মোহিত কামাল।

তিনি বলেন, ‘‘সুস্থ হওয়ার পর কখনো তারা শপিং মলে কিংবা কোথাও গেলে মানুষ তাদের বলত ‘ওই পাগল এসেছে’। এমন কথা শুনে রিতা-মিতা অবাক হতেন। এতে মেন্টাল ট্রমা হয় তাদের। এসব কারণে তারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন।’’

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ কেন হয় ?
বংশগত কারনে স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে । বাবা মা কিংবা অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বরের স্কিজোফ্রেনিয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে এই রোগ হতে পারে । এছাড়া বিভিন্ন রকম মানসিক প্রেশারে থাকলে স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে ।

রিতা মিতার মা কে শেষ জীবনে কোনো ডাক্তার দেখেছে কিনা জানা যায়নি । হতে পারে যে তিনি স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন । বাংলাদেশের মানুষ স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়না । সবাই একে পাগল বলে উপহাস করে । রিতা মিতা সম্ভবত এই কারনেই তাদের মা কে নিয়ে চুপচাপ ঘরের ভেতরে বসে থাকতো। মাকে বাইরে যেতে দিতোনা, নিজেরাও বাইরে যেতনা ।

এছাড়া রিতা-মিতার জীবনেও কিছু সমস্যা ছিল । এদের বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল, ক্যারিয়ার ও ভাল, কিন্তু বিয়ে হয়নি । কোনো এক ধরনের হতাশা থাকতে পারে তাদের মধ্যে । বিশাল সম্পত্তি, কিন্তু সেটা রক্ষা করতে হয়তো তারা ভয় পাচ্ছিল । বিভিন্ন দিক থেকে (এলাকার মাস্তান,আত্নীয়স্বজন) এর লোভ ছিল সম্পত্তির দিকে ।পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যও একটা মানসিক প্রেশার ছিল হয়তো । এত প্রেশারের কারনে ২ বোন স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট হয়ে গিয়েছিল।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করাতে হয় । ওষুধপত্র খেতে হয় এবং মানসিক কাউন্সিলিং ও নিতে হয় । ওষুধ খেলে এই রোগ কন্ট্রোলে থাকে, কিন্তু পুরোপুরি সারা বেশ কঠিন কাজ । এই জন্য ডাক্তারের পরামর্শ বাদে কখনোই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করা উচিত নয় । রোগী কখোনো নিজে নিজে বুঝতে পারবেনা যে আমার রোগ কন্ট্রলে আছে ,নাকি পুরোপুরি সেরে গেছে ।এই জন্য সবসময়ই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত ।

পুনশ্চ:
২ বোন কিন্তু একই সাথে স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট হয়নি । ডাক্তাররা বলেছেন , ছোটবোন ইঞ্জিনিয়ার নুরুন নাহার মিতা মূল স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট । মিতাই তার মৃত মা এর সাথে যোগাযোগ করে কিংবা আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলে । বড় বোন ডাক্তার রিতা ছোট বোনের মুখ থেকে শুনে এবং ছোটো বোনের বিশ্বাস থেকে অনুপ্রানিত হয়ে সেও বিভিন্ন অলিক জিনিস দেখা শুরু করেছে ।

মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই রোগকে বলে Shared Delusion। একজন যখন ডিলুশন দেখা শুরু করে, সে যখন তার বিশ্বাসের কথা কাছের মানুষদেরকে জানায়, তখন তারাও ডিলুশনে ভোগা শুরু করে ।

মনে করুন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এর ডিলুশন শুরু হয়েছে। সে জিন পরি অনেক কিছুই দেখতেছে । সে তার বিশ্বাসের

কথা যদি তার কাছের মানুষদের (বউ মেলানিয়া ট্রাম্প বা মেয়ে ইভাংকা ট্রাম্প) জানায় , এবং তারা যদি মানসিকভাবে দুর্বল হয়, তাইলে তারাও ভূত দেখা শুরু করবে। কিন্তু দূর সম্পর্কের মানুষকে (মনে করুন-জেরার্ড কুশনার, ট্রাম্পের মেয়ে জামাই) জানালে তাদের উপর এই প্রভাব পড়বেনা। তারা ভূত দেখা শুরু করবে না ।

রিতা এবং মিতার ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছে । যদি এদেরকে আলাদা করে চিকিৎসা দেওয়া হত, কিংবা চিকিৎসার পরেও যদি ২ জনকে আলাদা জায়গায় রাখা হতো, তাহলে তাদের রোগ সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল । কারন তখন একজনের মধ্যে যদি ডিলুশন তৈরিও হত, সেটা পরের জনের কাছে ট্রান্সমিট হত না। কিন্তু বিভিন্ন কারনে দুইজনকে আলাদা রেখে চিকিতসা দেওয়া আর সম্ভব হয়নি । এই কারনে বারবার তাদের দুইজনেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ব্যাপারটাকে তুলনা করতে পারেন বর্তমান সময়ের করোনা আক্রান্ত ফুটবলার পাওলো দিবালা আর তার গার্লফ্রেন্ড ওরিয়ানা সাবাতিনির সাথে। এই কাপল ৪ বার করোনা আক্রান্ত হয়েছে। আবার সূস্থও হয়ে উঠেছে। পুরা সময় দুইজন একসাথেই ছিল। কখনো হয়তো দিবালা অসুস্থ হয়, সে তার গার্লফ্রেন্ডকে করোনা ছড়ায়। তারপর ওষুধ পত্র খেয়ে আবার তারা সূস্থ হয়। কিছুদিন পর হয়তো সাবাতিনি করোনায় আক্রান্ত হয়, সেখান থেকে দিবালার গায়ে ছড়ায়। এইভাবে তারা মোট ৪ বার করোনা পজিটিভ হয়েছে একসাথে থাকার কারনে। দুইজন আলাদা থাকলে সংক্রমন কম হত।

রিতা-মিতাও একসাথে থাকার কারনে বারবার অসুস্থ হচ্ছিল। দুইজন আলাদা থাকলে রোগ কম হত।

২০১৭ সালে দিল্লীতে রিতা-মিতার মতই আরেকটা ফ্যামিলি পাওয়া যায় । মা , কলাবতী (৪২) এবং মেয়ে দীপা (২০) প্রায় ৪ বছর ধরে নিজেদের এক রুমে বন্দী করে ফেলেছিল। কলাবতীর ছেলে একটা রোড এ্যাক্সিডেন্ট এ মারা যাবার পর থেকে তাদের এই অবস্থা হয়েছিল । না খাইতে না খাইতে তারা একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। দুইজনেরই ওজন কমে ২৫ কেজির ও নিচে নেমে এসেছিল। দিল্লীর পুলিশ জানিয়েছিল, এরাও দীর্ঘদিন ধরে স্কিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে না যাওয়ার কারনে এদের অবস্থা এতটা খারাপ হয়েছে।

জ্যোতিবিহীন জ্যোতিষশাস্ত্র

(শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর "বই পড়া" প্রবন্ধের ধাঁচে)

"The study of the universe as a whole is a unique enterprise. At least in one sense one is seeking to understand the totality of things." - J. N. Islam

জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দটির সাথে আমরা তেমন পরিচিত না হলেও জ্যোতিষশাস্ত্র ও রাশিচক্র শব্দ দুটি আমাদের সুপরিচিত।অবশ্য এক জন জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রেমিক হিসেবে আপনি কোনো জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন তা আমি কখনোই চাইবো নে। প্রথমত, এটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, এটি শুধু একাটি বিশ্বাসমাত্র যা আমাদের জীবনে বিশেষ কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে না।এটি আমাদের স্ব-স্ব নীতির ওপর নির্ভরশীল।তবে আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রের ঘোর বিরোধী হলেও প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র কে হেয় করবার লোক আমি নই। তার কারণ, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র যে আজকের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি তা শুধু আমি নয়, সকল জ্যোতির্বিদরাই বিশ্বাস করেন।প্রাচীন জ্যোতিষীরা যে শুধু হাত গণনা করতেন - এ কথা সত্য নয়। তারা আকাশও পর্যবেক্ষণ করতেন বটে। প্রাচীন কালেও মানুষের চোখ এড়ায়নি পরম জ্যোতির্ময় সূর্য্য।তারাও দেখতেন - সূর্য্যের উদয়ে দিনের শুরু, প্রাণীজগতের প্রাণচাঞ্চল্য, ফুল ফলের প্রাণ উচ্ছ্বাস।আর তার অনুপস্থিতিতে শুরু হয় এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নময় জগৎ।তারা অবশ্য এ জগতে দেখতেন যে, কিছু আলোকোজ্জ্বল বস্তু যেন অন্ধকারকে দূরীভূত করার চেষ্টা করত, তবে সফল হত না। তারা এ বিষয়টিকে অনেক গম্ভীরভাবে নিয়েছিল।এতটাই গম্ভীর যে, তারা লক্ষ্য করতে শুরু করে - যখন নির্দিষ্ট কিছু তারকারাজি আকাশে আলো মেলে তখন আবহাওয়া গরম ও দিবা দীর্ঘ হতে শুরু করে। আবার যখন অন্য ধাঁচের তারকারাজির আবির্ভাব ঘটে তখন যেন শীতল আবহাওয়া বিরাজ করে।দিবাকে হ্রস্ব করে দেয়। তারপর এক কালে যখন কৃষি যুগের সূচনা ঘটে; তারকারাজি যেন মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তারা যেন বলে দেয়- কখন ফসলের বীজ বপন করতে হবে, শস্য সংগ্রহ করতে হবে।

আকাশে তারকাদের এ চক্রে তখন এতটাই গুরুত্ব বহন করতে শুরু করে যে, মানুষ মনে করে, ওখান টায় যেন সৃষ্টিকর্তা বসে বসে মানুষের ছেলেখেলা দেখেন আর সাময়ে সময়ে কখন কি করা দরকার তা জানিয়ে দেন।তারা আরও বিশ্বাস আনে - যেহেতু এরা আমাদের আবহাওয়া, ঋতু, দিবার হ্রস্ব-দীর্ঘ এসব নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বুঝি এরাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রক। আর এ বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় জ্যোতিষশাস্ত্রের। অবশ্য এর পর জ্যোতিষীরা গভীর রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতো আর এর সাথে মানুষের হাত দেখে নানান গণনা করে অনুমান করতেন যে কিভাবে তা মানুষকে প্রভাবিত করে। এরপর তারা আসমান-জমিনের কসম খেয়ে বলতেন তাদের অনুমান সত্য হবেই।তবে বাস্তবে তা হতো না। যদিও জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণী শোনার পর যারা বিশ্বাস রেখে তার সত্য পূরণে কর্মে লিপ্ত ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে আংশিক সত্য হলেও, যারা শুধু বিশ্বাস রেখেই এর বিপরীত কর্মে লিপ্ত ছিলেন তাদের বেলায় এর সত্যতা আংশিকও প্রকাশ পায়নি। অবশ্য এক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের ত্রুটি আমাদের নিজেদের মাঝে, তারকাদের নয়।তবে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র প্রকৃত পক্ষেই মানুষকে আকাশ পর্যবেক্ষণ ও তারাদের মাঝে মিল, সম্পর্ক ও নানা নিদর্শনের সুযোগ দিয়েছিল যা বস্তুত মানুষকে সেকালে মহাবিশ্ব সম্পর্কে অণু পরিমাণ ধারণাদেয় যা আজকের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে এ জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞান অধিকাংশে কৃতজ্ঞ।

এখন প্রশ্ন আসে জ্যোতির্বিদ্যা তাহলে কি?

আপনি মানুষ, আপনার ভর আছে, আপনার দেহের কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া বিদ্যমান, আপনি অক্সিজেন গ্রহণ করেন - এসবের আলোচনা যথাক্রমে - পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা'য় বিস্তারিত রয়েছে। তবে জ্যোতির্বিদ্যা ভিন্নতর এক বিষয়। এটি বিজ্ঞান বটে, তবে এটি আপনার সঠিক ঠিকানা নির্ধারণ করে।এটি আছে বলেই আমরা আজ জানি যে, আমরা ১২,৭৪২ কি.মি. ব্যাসের একটি গোলকের ওপর অবস্থান করি যা, পাথর ও লোহার সমন্বয়ে তৈরি।সূয্যের আলোয় এখানে দিবা রাত্রি সংঘটিত হয়, আবার একই সূয্যের আলোয় আলোকিত হয় আশেপাশের গ্রহ, গ্রহাণু, নানান মহাজাগতিক ধূলিকণা, ধূমকেতু তারপর আসে কাইপার বেল্ট, যার অবস্থান উরট ক্লাউডে, তারপর আসে নিকটবর্তী তারকারাজি যারা নানান নেবুলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সর্পিলাকার ছায়াপথ আকাশগঙ্গা'র কেন্দ্রর কৃষ্ণবিবর'কে আবর্তন করে। এটির চারপাশে রয়েছে ১৫০টির মত গোল্লার ক্লাস্টার।আবার অনেক ছায়াপথ অন্য ছায়াপথ কে খেয়ে ফেলে, অনেক কে আমাদের ছায়াপথ থেকে দেখা যায়, যেমন: অ্যানড্রোমিডা। এরা আবার আমাদের ভার্গো ক্লাস্টারের প্রান্তদেশে অবস্থিত, যা আবার ভির্গো সুপার ক্লাস্টারের অংশ যা অবশ্য মহাবিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ গঠনের বস্তুর অংশ এরা সকলে আবার দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অন্তর্গত যার সীমানা ৯০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং এটি প্রতিনিয়ত বড় হচ্ছে।গতকাল যে গতিতে বাড়ছিল, অজানা ডার্ক এনার্জি ফলে আজকে তার চেয়েও বেশি গতিতে বাড়ছে।এসব হয়তো কোনো অসীমের অংশ, আবার হয়তো এরূপ অনেক মাল্টিভার্স রয়েছে যারা স্পেইস-টাইমের মধ্যদিয়ে আজীবন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। আশাকরি এবার বুঝতে পারছেন যে কিভাবে জ্যোতির্বিদ্যা আপনার ঠিকানা নির্ধারণ করে।

অবশ্য যদি এরপরও প্রশ্ন থাকে আসলে জ্যোতির্বিদ্যা কি জিনিস, যখন খুব ছোট ছিলাম তখন এটি বোঝা ছিল অনেক সহজ বিষয়। মনে করতাম এর মানে হল - আকাশের বিষয়বস্তু যেমন - চাঁদ, সূয্য, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।তবে এসব বিষয় কে একত্রে পায়রার খোপে ফেলা সহজ কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ : বুধগ্রহ।আপনি যখন খালিচোখে বা দূরবীণ দিয়ে একে দেখবেন, তা অবশ্যই জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা। তবে এর গায়ে পাঠানো রোভার গুলো? ওরাতো জ্যোতির্বিদ্যা করছে না! ওরা করছে, রসায়ন, ভূবিদ্যা, জলানুসন্ধানবিদ্যা, শৈলতত্ত্ব সবই শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান বাদে। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞান আসলে কী? এটিকে অবশ্য বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলোর মত সংজ্ঞায়িত করা অনেকটা ঘোলাটে। অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান মানে, আকাশ পর্যবেক্ষণ তা ঠিক তবে এর সংজ্ঞাসীমানা এর চেয়েও বিশাল। মানুষ স্বভাবত সকল বিষয়কে আলাদা ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ভালোবাসে, তবে প্রকৃতি অতো খুঁতখুঁতে নয়।

যারা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করেন তাদের বলা হয় জ্যোতিষী , এ আমরা সকলেই জানি।আর যারা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেন তাদের বলে জ্যোতির্বিদ।বেপারটা আরেকটু সহজ করা যাক - আমাকে নিয়েই বলি, আমার দূরবীন নেই।রাতের আকাশে খালি চোখে তারা দেখতে চলে যাই, কোনটা কোন মণ্ডল তা খুঁজে বেরাই, মাঝে মাঝে উল্কাঝড় উপভোগ করি, অনলাইনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেড়াই, আবার এ নিয়ে লিখালিখিতো আছেই। এসব করার পর নিজেকে জ্যোতির্বিদ বলতে আমার তেমন একাটা দ্বিধা বোধ হয় না।অবশ্য এক্ষেত্রে আমি একজন অপেশাদার জ্যোতির্বিদ।আশাকরি বিষয়টি একটু পরিষ্কার হয়েছে। এছাড়া যেসকল জ্যোতির্বিদগণ বিভিন্ন হাইপোথিসিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে থাকেন তাদের বলা হয় জ্যোতিঃপদার্থবিদ। আবার, অনেক জ্যোতির্বিদগণ নিজে নিজে দুরবিন বানান না। তারা এরজন্য ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হন। আবার অনেক সংস্থানে সকল জ্যোতির্বিদেরা দূরবীণ ব্যাবহার করেন না। শুধুমাত্র যারা এটি ব্যাবহারে পারদর্শী তারাই এর দায়িত্ব নেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদরা নানা পর্যবেক্ষণমূলক যন্ত্র মহাশূন্যে প্রেরণ করেন আবার এর কিছু যন্ত্র যায় অন্য কোনো দুনিয়ায় যেমন : চাঁদ, মঙ্গল ইত্যাদি।অবশ্য এসবের জন্য জ্যোতির্বিদ, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার এদের সকলেরই প্রয়োজন হয়, সম্পূর্ণ বিষয়টি বোঝার জন্য।

পরিশেষে লাগে কিছু বিশেষ ব্যাক্তিদের যারা আপনাকে, আমাকে এ বিষয়ে জানান। যেমন - শিক্ষক, প্রোফেসর, লেখক, ছবি নির্মাতা, এমনকি চিত্রশিল্পীও।তবে একেবারেই সহজ ও পরিষ্কার করে বলতে কি - আপনার যদি মহাকাশ নিয়ে আগ্রহ থাকে, আপনি যদি রাতের আকাশে তারা দেখতে ভালোবাসেন, মথার উপরের আকাশটায় কি হচ্ছে তা জানার আগ্রহ থাকে আহলে আপনি জ্যোতির্বিদ নন একথা বলার সাধ্য কারো নেই।
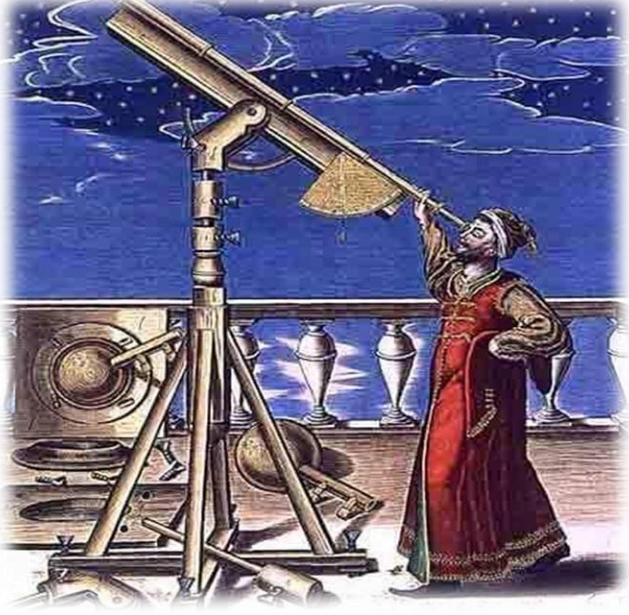
জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে এতক্ষণ বলা কথা গুলো নিরর্থক ও নির্মম হয়ে যাবে যদি এর চর্চার অভাব ঘটে।জ্যোতিষীদের অবশ্য জ্যোতিশাস্ত্র চর্চার জন্য তেমন কনো বিশেষ স্থানের প্রয়োজন পড়ে না।তবে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য এ কথা মিথ্যা।জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য শুধু যত্রতত্র নয় বরং বিশেষিত জায়গাই প্রয়োজনীয়।দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, তবে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য চাই জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাগার। অবশ্য অপেশাদার জ্যোতির্বিদদের জন্য এর চর্চা মেঘমুক্ত আকাশের নিচে আলোক দূষণ মুক্ত জায়গাতে চলে।দেশে খোঁজ নিয়ে দেখলে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যারা এক্ষেত্রে অপেশাদার হতে পেশাদারে পদোন্নত করতে চান।তবে আমাদের দেশে জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাগার ও আলোক দূষণ মুক্ত অঞ্চল দু'টোরই বড় অভাব।সেইজন্য দেশে প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা একরকম নেই বললেই চলে।উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না।তবে এ'কথাও সত্য যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না।অবশ্য এর প্রমাণ আমি পেয়েছি - বেশ কিছুদিন আগে এক ভাইয়ের সাথে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় উনার মনে যে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা নিয়ে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে এ ভাবের প্রকাশ ঘটে।এ আসলে উনার দোষ নয়। আমাদের দেশে যেখানে এখনও ছেলেবেলা থেকে শোনানো হয় চাঁদে চরকা কাটা বুড়োর গল্প, যেখানে অন্যান্য দেশে তারকা মণ্ডলের ইতিকথা।আবশ্য চাঁদের বুড়োর গল্প শোনে আমাদের দেশে কারো সেই বয়স্ক বুড়োর সাথে দেখা করবার সংকল্প জেগে ছিল কিনা, তা আমার জানা নেই। তবে ১৯৬৯ সালে নেইল আর্মস্ট্রংয় চাঁদে ঠিকই গিয়েছিলেন, তবে কোনো বুড়োর অস্তিত্ব পান নি। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর আমাদের দেশে যে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায় নি এ কথা অস্বীকার করবার মতো লোক পাওয়া ভারী মুশকিল। তবে এরপরও আমাদের দেশ জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে অনেকটাই উদাসীন। এদিকটায় আমাদের থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত-ও অনেক এগিয়ে।অবশ্য প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবর্ষের অবদান অনেকটাই উল্লেখযোগ্য। আবার প্রাচীনামলে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।এক্ষেত্রে দেশে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এত অভাব থাকা সত্ত্বেও যারা এ বাধা বিপত্তি পেরিয়ে চর্চার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে গিয়েছেন তাঁদের অনেকেই বিশ্ববরেণ্য। বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের অন্যতম ও প্রধান একটি শাখা।বিজ্ঞানের এ আধুনিক যুগেও যে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার অভাবে আমরা জ্যোতিষীদের হাত দেখানোতেই বেশি বিশ্বাসী; বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এটি আমাদের জন্য একটি বড়ই লজ্জার বিষয়। দেশে জ্যোতির দর্শন থেকে হাতের দর্শন বেশি। একটি জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাগার অবশ্য এর অনেকটাই উপশম ঘটাতে পারে। তবে দেশে একটি উন্নতমানের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার দাবি আমার একার নয় দেশের সকল পেশাদার ও অপেশাদার জ্যোতির্বিদ-দেরও দাবী বলে আমার বিশ্বাস।আর এ বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় জ্যোতির্বিদরা চর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলাম। সে বাক্যসমূহে আপনাদের মনে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ও একটি জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন যোগাতে সক্ষম হয়েছি কি না জানিনে। বাকিটুকু ছেড়ে দিলাম আমার পাঠকবর্গের ওপর। তাদের মনে সমর্থন যোগাতে সক্ষম হলেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে।

বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল: রহস্য নাকি অতিরঞ্জন?

আবু রায়হান

বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় কুখ্যাত জায়গার মাঝে এটি অন্যতম। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত বিষয়গুলো Pseudoscience এর অন্তর্গত। যার মাঝে আসলে কোন Science নাই কিন্তু মনে করা হয় আছে তাই হচ্ছে Pseudoscience। আজও কেন মানুষ এই অপবিজ্ঞানের পিছনে ঘুরে বেড়ায় তা বড় প্রশ্ন।উত্তর হতে পারে, মানুষ স্বভাবতই রহস্য পছন্দ করে, রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ায়। তাই সামান্য কিছু কাকতালীয়তা আর অনেকখানি কল্পণা মিলে শয়তানের ত্রিভুজ তৈরি হয়, আকাশে পিরিচ উড়ে বেড়ায়।

বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল আজ কল্পবিজ্ঞান ছাড়া আর কোন জায়গাতেই খাপ খায় না।

অপবিজ্ঞান গুলো স্থায়ীত্ব পায় কারণ এদের ঘিরে অনেক কাকতালীয় ঘটনা ঘটে।তাই উল্টো যুক্তি দেওয়া যায়, “যেহেতু শুধু অপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এত কাকতালীয় ঘটনা ঘটে তারমানে সত্যি সত্যি কিছু আছে”।এই যুক্তি ভেঙেই আমরা শুরু করব, “আসলে এত কাকতালীয় ঘটনা ঘটে দেখেই এরা অপবিজ্ঞান হয়ে উঠেছে, নাহলে হতে পারত না”।

কোথায়?

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা (Florida), পুয়ের্তো রিকো (Puerto Rico) এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপ বারমুডা (Bermuda) এই তিনটি স্থানের মধ্যবর্তী কাল্পনিক ত্রিভুজাকার এলাকা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (Bermuda Triangle) নামে পরিচিত। বহু জাহাজ ও বিমান এই অঞ্চলে অলৌকিক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই একে শয়তানের ত্রিভুজ (Devils Triangle) নামেও ডাকে।

ত্রিভুজের বিস্তৃতি:

বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের বিস্তৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে।এই ত্রিভূজের উপর দিয়ে মেক্সিকো উপসাগর থেকে উষ্ণ সমুদ্র স্রোত বয়ে গেছে।এই তীব্র গতির স্রোতই মূলত অধিকাংশ অন্তর্ধানের কারণ।এখানকার আবহাওয়া এমন যে হঠাৎ করে ঝড় ওঠে আবার থেমে যায়, গ্রীষ্মে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। বিংশ শতাব্দীতে টেলিযোগাযোগ, রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি পৌঁছানোর আগে এমন অঞ্চলে জাহাজডুবি খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা।এই অঞ্চল বিশ্বের ভারী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর অন্যতম। জাহাজগুলো আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করে।

এছাড়া এটি হল প্রচুর প্রমোদতরীর বিচরণ ক্ষেত্র।এ অঞ্চলের আকাশপথে বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান চলাচল করে। ত্রিভূজের বিস্তৃতির বর্ননায় বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত দিয়েছেন।কেউ মনে করেন এর আকার ট্রাপিজয়েডের মত, যা ছড়িয়ে আছে ফ্লোরিডা, বাহামা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইশোর পূর্বদিকের আটলান্টিক অঞ্চল জুড়ে, আবার কেউ কেউ এগুলোর সাথে মেক্সিকো উপসাগরকেও যুক্ত করেন।তবে লিখিত বর্ণনায় যে সাধারণ অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে তাতে রয়েছে ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূল, পুয়ের্তো রিকো, মধ্য আটলান্টিকে বারমুডার দ্বীপপুঞ্জ এবং বাহামা ও ফ্লোরিডা স্ট্রেইটস এর দক্ষিণ সীমানা যেখান ঘটেছে অধিকাংশ দূর্ঘটনা।

ত্রিভুজ গল্পের ইতিহাস:

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল বিষয়ে যারা লিখেছেন তাদের মতে ক্রিস্টোফার কলম্বাস সর্বপ্রথম এই ত্রিভুজ বিষয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লিখেন।তিনি লিখেছিলেন যে তার জাহাজের নাবিকেরা এ অঞ্চলের দিগন্তে আলোর নাচানাচি, আকাশে ধোঁয়া দেখেছেন। এছাড়া তিনি এখানে কম্পাসের উল্টাপাল্টা দিক নির্দেশনার কথাও বর্ণনা করেছেন।তিনি ১১ই অক্টোবর, ১৪৯২তে তার লগ বুকে লিখেন -triangle means the residence of devil

আলো:

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত লগবুক পরীক্ষা করে যে মত দিয়েছেন তার সারমর্ম হল – নাবিকেরা যে আলো দেখেছেন তা হল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত নৌকায় রান্নার কাজে ব্যবহৃত আগুন, আর কম্পাসে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে।

১৯৫০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ই. ভি. ডব্লিউ. জোন্স(E.V.W. Jones) সর্বপ্রথম এ ত্রিভুজ নিয়ে খবরের কাগজে লিখেন।

এর দু বছর পর ফেইট (Fate)ম্যাগাজিনে জর্জ এক্স. স্যান্ড(George X. Sand) “সী মিস্ট্রি এট আওয়ার ব্যাক ডোর” ("Sea Mystery At Our Back Door") শিরোনামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেন।এ প্রবন্ধে তিনি ফ্লাইট নাইনটিন(ইউ এস নেভী-র পাঁচটি ‘টি বি এম অ্যাভেঞ্জার’ বিমানের একটি দল, যা প্রশিক্ষণ মিশনে গিয়ে নিখোঁজ হয়) এর নিরুদ্দেশের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তিনিই প্রথম এই অপরিচিত ত্রিভূজাকার অঞ্চলের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ফ্লাইট নাইনটিন নিয়ে আমেরিকান লিজান (American Legion) ম্যাগাজিনে লিখা হয়।বলা হয়ে থাকে এই ফ্লাইটের দলপতি কে নাকি বলতে শোনা গিয়েছে- We don't know where we are, the water is green, no white।এর অর্থ হল "আমরা কোথায় আছি জানি না, সবুজ বর্ণের জল, কোথাও সাদা কিছু নেই"।এতেই প্রথম ফ্লাইট নাইনটিনকে কোন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সাথে যুক্ত করা হয়।এরপর ভিনসেন্ট গডিস (Vincent Gaddis) “প্রাণঘাতী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল”(The Deadly Bermuda Triangle) নামে আর এক কাহিনী ফাঁদেন ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে।এর উপর ভিত্তি করেই তিনি আরও বিস্তর বর্ণনা সহকারে লিখেন "ইনভিজিবল হরাইজন" (Invisible Horizons) মানে “অদৃশ্য দিগন্ত” নামের বই। আরও অনেক লেখকই নিজ নিজ মনের মাধুরী মিশিয়ে এ বিষয়ে বই লিখেন, তারা হলেন জন ওয়ালেস স্পেন্সার, তিনি লিখেন "লিম্বো অফ দ্যা লস্ট" (Limbo of the Lost, 1969, repr. 1973), মানে “বিস্মৃত অন্তর্ধান” ; চার্লস বার্লিটজ (Charles Berlitz) লিখেন “দি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল”(The Bermuda Triangle, 1974),; রিচার্ড উইনার লিখেন "দ্যা ডেভিল'স ট্রায়াঙ্গেল" “শয়তানের ত্রিভূজ” (The Devil's Triangle, 1974) নামের বই,, এছাড়া আরও অনেকেই লিখেছেন।এরা সবাই ঘুরেফিরে একই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাই বিভিন্ন স্বাদে উপস্থাপন করেছেন।

কিছু কাহিনী+প্রারম্ভিকা

১।

‘বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল’ নামটা প্রথম দেন ভিনসেন্ট এইচ গ্যাডিস, সেই ১৯৬৪ সালে।তিনি উত্তর আটলান্টিক সাগরের এক নামহীন জায়গায় অদ্ভুত সব হারিয়ে যাবার ঘটনা থেকে এ জায়গার নাম দেন বারমুডা ত্রিভুজ।

জায়গাটার ক্ষেত্রফল লেখকভেদে প্রায় ১,৩০০,৩০০ থেকে ৩,৯০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।তবে এর আগে ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দ্য মায়ামি হেরাল্ড পত্রিকায় এ অঞ্চলে জাহাজের উধাও হওয়া নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

২।

সত্তরের দশকে খুব বিখ্যাত হয়ে যায় এ জায়গার নাম এবং এর ঘটনাগুলো। তখন থেকেই পাইলট আর জাহাজ চালকেরা নানা কাহিনী বলতে থাকেন এ জায়গা নিয়ে। পরে দেখা যায় বেশিরভাগই আসলে নাম কামাবার জন্য বানোয়াট কাহিনী।এ এলাকাটা আসলে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের মায়ামি, পুয়ের্তো রিকো ও বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ- এ তিন স্থলবিন্দুর সংযোগে গঠিত এক জলজ এলাকা

৩।

ক)পঞ্চদশ শতকে যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান, তখন তার জার্নালে এ ব্যাপারে লিখেছিলেন। বর্তমান ফ্লোরিডা ও পুয়ের্তো রিকোর এ এলাকা যখন পার হচ্ছিলেন, তখন তার কম্পাসের কাটা ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল।সেখানে তিনি নাকি এক অদ্ভুত আলো দেখেছিলেন।

খ)

১৮৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর মারি সেলেস্ত নামের এক মালবাহী জাহাজ নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকে যাত্রা করে।কিন্তু যেখানে মালামাল পৌঁছাবার কথা, সেখানে কোনোদিনই পৌঁছায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জাহাজখানা ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেল বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল এলাকায়।কিন্তু ১১ জন কর্মীর কেউ ছিল না জাহাজে।ব্যক্তিগত জিনিসপাতি, খাবারদাবার, দামি মালামাল, লাইফবোট সবই অক্ষত সে জাহাজে, শুধু মানুষগুলো উধাও। আরো অবাক ব্যাপার, প্লেটে খাবার ছিল, সেগুলোতে পচন ধরে গিয়েছিল যখন উদ্ধারকারীরা পৌঁছায়।কী এমন হয়েছিল যে খাবারের মাঝ থেকে উঠে যেতে হবে?

গ)

১৮৮১ সালে এলেন অস্টিন নামের একটি জাহাজ সমুদ্রে এক পরিত্যক্ত ভাসমান জাহাজ দেখতে পায়। জাহাজের ক্রুরা পরিকল্পনা করল পরিত্যক্ত জাহাজের জিনিসপাতি নিয়ে নেবে। এমন ভাবনা থেকে কয়েকজন নেমে পড়লো জাহাজটিতে।তারা ভাবছিল সেই জাহাজটিকে চালিয়ে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবে।দুটো জাহাজ রওনা হলো একসাথেই।কিন্তু এলেন অস্টিন খুব শীঘ্রই নামহীন জাহাজটির খেই হারিয়ে ফেলল।

পরে যখন আবার খুঁজে পেলো, তখন দেখা গেল, জাহাজটি পরিত্যক্ত, তাদের নিজেদের ক্রুরাও উধাও! তখন এলেন অস্টিন থেকে বার্তা পাঠানো হলো, উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠাতে।যখন উদ্ধারকারী জাহাজ এসে পৌঁছাল, সে জায়গা অর্থাৎ বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল থেকে এলেন অস্টিন ও নামহীন জাহাজ দুটোই উধাও। কোনোদিন তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।কথিত আছে, অনেক জাহাজ নাকি এ দুটো জাহাজকে একসাথে ঘুরতে দেখেছে সমুদ্রে, তারা চেষ্টারত ছিল অন্য জাহাজদের পথভ্রষ্ট করতে

ঘ)

১৯১৮ সালে একইভাবে কোনো চিহ্ন না রেখেই হারিয়ে যায় ইউএসএস সাইক্লপস, ব্রাজিলগামী সে জাহাজটি মার্কিন সরকার কর্তৃক ব্রিটিশদের সাহায্য করতে দেয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে।মার্চের ৪ তারিখে সেটিকে শেষবার দেখা যায় বারবাডোজের তীরে।৩০৬ জন ক্রুও এর সাথে উধাও।১৯৪১ সালেও ইউএসএস প্রোটিয়াস ও ইউএসএস নিরিয়াস একইভাবে নেই হয়ে যায়।

ঙ)

এবার আসা যাক প্লেনের কথায়।বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সবচেয়ে আলোচিত হলো ফ্লাইট নাইনটিন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে মার্কিন নেভির পাঁচ সেরা অ্যাভেঞ্জার বম্বার একটি রুটিন মিশনে বের হয়।লেফটেন্যান্ট চার্লস টেইলর নিয়মিত কথা বলছিলেন রেডিওতে বেজের সাথে।কিন্তু হঠাৎ বাক্যের অর্ধেকেই সব চুপ হয়ে যায়।এমন না যে, ঝিরঝিরে বা অস্পষ্ট হয়ে গেল- একদম নেই হয়ে গেল।আর কোনোদিন সেই পাঁচ বিমানের দেখা মেলেনি।সেগুলোকে উদ্ধার করতে পাঠানো বিমানগুলোও ফেরেনি কোনোদিন। আর জায়গাটি বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল।তদন্তে লেখা হয়েছিল 'অজ্ঞাত কারণে' তারা উধাও।

চ)

১৯৬৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। ৬০০ ফুটের দানবীয় মেরিন সালফার কুইন জাহাজ তার শেষ যাত্রায় রওনা দিল।ভেতরে ছিল ১৫ হাজার টন গলিত সালফার আর ৩৯ জন ক্রু।ফেব্রুয়ারির চার তারিখ পর্যন্ত জাহাজের অবস্থান জানতো সবাই, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে।এরপর হঠাৎ অফ হয়ে গেলো রেডিও ট্রান্সমিশন।অফ হয়ে যাবার আগে কমান্ডার বলছিলেন, আবহাওয়া কত সুন্দর, কত চমৎকারভাবে নেভিগেশন চলছে।

ছ) বলতে থাকলে এরকম আরো অনেকগুলোই বলা যাবে, কিন্তু সবগুলো কাহিনীর সত্যতা আসলে নেই।

ঘটনাসমূহের তালিকা মোটামুটি উইকিপিডিয়া তে লিপিবদ্ধ করা আছে।

তবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই, কেউ কেউ দিয়েছেন আজব সব থিওরি।যেমন, কেউ বলেছেন এখানে শয়তানের আস্তানা, শয়তান টেনে নিয়ে যায় এসব জাহাজ আর বিমান। কেউ বলেন, এখানে আসলে এলিয়েনদের বেজক্যাম্প আছে; এজন্যই এখানে অদ্ভুত আলো দেখা যায়।এখানে ঢুকলে কম্পাস কখনো কখনো অদ্ভুত আচরণ কেন করে- সেটার পেছনে যুক্তি দেয়া হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের।কোনো থিওরি অনুযায়ী, দাজ্জালের দ্বীপ আসলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলেই।কেউ বা আবার বলেছেন এখানেই আসলে হারানো আটলান্টিস শহর আছে, পানির তলদেশে।

জ)

আরেক অদ্ভুত এক তত্ত্ব হলো এখানে নাকি সময় সুড়ঙ্গ (Time Tunnel) আছে।যেমন, ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর অ্যান্ড্রোস আইল্যান্ড বাহামাস থেকে দক্ষিণ ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন পাইলট ব্রুস গার্নোন।তিনি বলেন বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল এলাকায় উড়ে যাবার সময় তিন মিনিটের জন্য তিনি নাকি ছিলেন 'ইলেকট্রনিক ফগ' নামের অদ্ভুত এক ধূসর কুয়াশায়।তিনি যখন পাম বিচে অবতরণ করলেন তখন দেখলেন প্লেনের সবার ঘড়িতে দুপুর তিনটা আটচল্লিশ বাজে। অর্থাৎ মাত্র ৪৭ মিনিটে তিনি আড়াইশ মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রতিদিন তার এ ফ্লাইটে ৭৫ মিনিট লাগে অন্তত। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কুয়াশায় তিনি তিন মিনিটে হারিয়েছেন ২৮ মিনিট! সেবা প্রকাশনীর বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল নিয়ে প্রকাশিত বহু আগের বইটিতে এ ঘটনা এবং আধখাওয়া খাবারওয়ালা ভাসমান জনশূন্য জাহাজেরর ঘটনা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছিল।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চেষ্টা করেছে এ রহস্যের সমাধানের। ২০১৬ সালের ৪ মার্চ প্রকাশিত তাদের আর্টিকেল অনুযায়ী, ৭৫টির মতো বিমান আর প্রায় ৩০০-এর মতো জাহাজ হারিয়ে গেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে।অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন, আসলে মানবঘটিত ভুল, বৈরী আবহাওয়া আর দুর্ভাগ্যের কারণেই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে। কিন্তু আসলে স্বভাবতই এ তত্ত্বগুলো সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় না।এ ব্যাপারে মার্কিন কোস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করলে তাদের অফিসিয়াল বিবৃতি ছিল, "আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, প্রকৃতি আর মানবস্বভাবের অননুমানযোগ্যতা (unpredictability) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকেও হার মানায় বহু বার।" ইউএস কোস্ট গার্ড বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ব্যাপারে বরাবরই অবিশ্বাসী।এমন ঘটনাও আছে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল, জাহাজডুবির পর কোনো দেহ পাওয়া যায়নি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে,

সেখানে আসলে কোস্ট গার্ডরা মৃতদেহের যথেষ্ট ছবি তুলে এনেছিল।

২।

গবেষক আর্নেস্ট ট্যাভেস ও ব্যারি সিংগার বলেছেন যে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওপর ভিত্তি করে প্রচুর ব্যবসা চালানো হয়েছে, এবং হচ্ছে।এটা নিয়ে মিডিয়ায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করা হয়।সুতরাং একে মিথ্যে প্রমাণ করা আসলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর।এজন্য বরং গুজবগুলো আরো ফুলে ফেঁপে উঠছে।

বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখান যে, এ অঞ্চল নিয়ে বেশি মাতামাতির কারণে, অন্য অঞ্চলের দুর্ঘটনাগুলোকে মানবমন বেশি গুরুত্ব দেয় না।এর মানে এই না যে, বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল ছাড়া অন্য জায়গায় এত বেশি দুর্ঘটনা হয় না; এ অঞ্চলটা আসলে সমুদ্রের অন্য অঞ্চলের মতোই, এটাই বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত।আর, অনেক সময়ই কাহিনীগুলো পরে রঙ চং যোগ করে বলা হয়।সত্যি বলতে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের পাড় ঘেঁষে প্রতিদিন অনেক জাহাজ, প্রমোদতরী আর ফ্লাইট যায় আমেরিকা, ইউরোপ আর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে।বেশি বেশি চলাচলার কারণেই এ এলাকার দুর্ঘটনা পরিমাণ হয় বেশি।এর সাথে কোনো ট্রায়াঙ্গলের সম্পর্ক নেই।

৩।

তবে কি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে কোনো রহস্য নেই?

আছে। কয়েকটি ঘটনার যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি তা সত্য।কিন্তু সেগুলোতে যে আসলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কোনো প্রভাব আছে তারও প্রমাণ নেই।

তবে একটি মজার থিওরি দিয়েছিলেন কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির স্যাটেলাইট মিটিওরলজিস্ট ড. স্টিভ মিলার।২০১৬ সালের অক্টোবরে তিনি নাসার স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে সায়েন্স চ্যানেলের What on Earth প্রোগ্রামকে জানান, বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল এলাকা জুড়ে জায়গায় জায়গায় ষড়ভুজ মেঘ দেখা যায়।এখানে এমনকি ঘণ্টায় ১৭০ মাইল গতি পর্যন্ত বায়ু বয়ে যায়।এই এয়ার-পকেটগুলোই নাকি জাহাজ বা প্লেন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।কোনো কোনো মেঘ ২০ থেকে ৫৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।তবে তিনি জানান, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে আরো গবেষণা করা লাগবে।

৪।

তবে বহুদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় একটি তত্ত্ব ছিল মিথেন হাইড্রেড গ্যাস থিওরি।একটি মহাদেশের সীমারেখা থেকে পানির নিচে যতটুকু ভূমি বিস্তৃত হয় সোজা কথায় তাকে কন্টিনেন্টাল শেলফ বলে। সেখানে মিথেন হাইড্রেট প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল উপস্থিতি দেখা যায়।অস্ট্রেলিয়াতে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এরকম জায়গা থেকে সৃষ্ট বাবল বা বুদবুদ পানির ঘনত্ব কমিয়ে বড় জাহাজকেও ডুবিয়ে দিতে পারে।নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট এ বুদবুদের কারণে জাহাজডুবি হয়ে থাকতে পারে, যেহেতু মহাদেশের সীমারেখার সাথেই বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল।এক্ষেত্রে বিনা পূর্বাভাসেই দ্রুত জাহাজডুবি হতে পারে।

কিন্তু প্লেন দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা এ থিওরি দিতে পারে না।

৫।

তাছাড়া এ থিওরি মাঠে মারা পড়ে, যখন একবিংশ শতকেই U.S. Geological Survey (USGS) থেকে জানানো হয়, গত পনেরো হাজার বছরে এ এলাকায় কোনো মিথেন হাইড্রেট গ্যাস নির্গত হয়নি।USGS থেকে ভূতত্ত্ববিদ বিল ডিলিয়নের ভাষ্যে আরো জানানো হয়, বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল আসলে একটি রূপকথা।

আগেই বলেছি বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল নিয়ে লেখা কমসম হয়নি। রিপিট করছি-

এই এলাকার অদ্ভুত স্বভাবের উপর প্রথম লেখাটা সম্ভবত প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে এডওয়ার্ড ভ্যান উইঙ্কল জোনস এর লেখনীতে।ফেইট ম্যাগাজিনে জর্জ স্যান্ড এর “Sea mystery at our back door” প্রবন্ধেই প্রথম ত্রিভুজ ধারনাটা নিয়ে আসা হয়, সাথে যুক্ত করা হয় এই এলাকার সাথে অতিপ্রাকৃতের সম্পর্ক। ১৯৬৪ সালে ভিনসেন্ট গ্যাডিস “The Deadly Bermuda Triangle” এ উল্লেখ করেন ফ্লাইট ১৯ এর নিরুদ্দেশ কিছুই নয়, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে ঘটে যাওয়া আজব ঘটনাগুলোর কোন একটা প্যাটার্নের অংশ।পরের বছরই লেখক এ নিয়ে একটা বই লিখে ফেলেন “The Invisible Horizon”।পরে বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল নিয়ে আরও বই লিখা হয়েছে।জন ওয়ালেস স্পেনসারের Limbo of the Lost, চার্লস বার্লিটজের The Bermuda Triangle, রিচার্ড ওয়াইনারের The Devil’s Triangle এগুলোর মাঝে অন্যতম।বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল নিয়ে যতটুকু রহস্য আর ইতিহাস আছে তার সামান্য বর্ণনা দেওয়া হল।

আমরা দেখব রহস্য আসলে কতটা রহস্য।

Bermuda Triangle-mission solved :
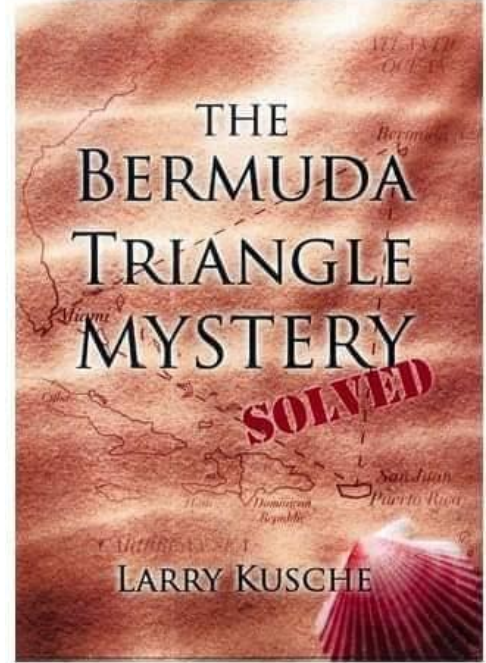
লরেন্স ডেভিড কুসচ হলেন “অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি”-র রিসার্চ লাইব্রেরিয়ান এবং “ দ্যা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল মিস্ত্রি: সলভড (১৯৭৫)” এর লেখক। তার গবেষণায় তিনি চার্লস বার্লিটজ (Charles Berlitz) এর বর্ণনার সাথে প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের বর্ণনার অসংগতি তুলে ধরেন।যেমন- যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকার পরেও বার্লিটজ (Charles Berlitz) বিখ্যাত ইয়টসম্যান ডোনাল্ড ক্রোহার্স্ট(Donald Crowhurt) এর অন্তর্ধানকে বর্ণনা করেছেন রহস্য হিসেবে। আরও একটি উদাহরণ হল- আটলান্টিকের এক বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার তিন দিন পরে একটি আকরিকবাহী জাহাজের নিখোঁজ হবার কথা বার্লিটজ বর্ণনা করেছেন, আবার অন্য এক স্থানে একই জাহাজের কথা বর্ণনা করে বলেছেন সেটি নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বন্দর থেকে ছাড়ার পর নিখোঁজ হয়েছিল।এছাড়াও কুসচ দেখান যে বর্ণিত দূর্ঘটনার একটি বড় অংশই ঘটেছে কথিত ত্রিভূজের সীমানার বাইরে। কুসচ এর গবেষণা ছিল খুবই সাধারন। তিনি শুধু লেখকদের বর্ণনায় বিভিন্ন দূর্ঘটনার তারিখ, সময় ইত্যাদি অনুযায়ী সে সময়ের খবরের কাগজ থেকে আবহাওয়ার খবর আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছেন যা গল্পে লেখকরা বলেননি।

তিনি অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে এক কর নিয়ে আসেন, তারপর এই অংশের যে নাম সেই নামে একটা বই লিখেন।কুশ্যের বই থেকে আমরা নিচের সিদ্ধান্তগুলোতে আসতে পারি:

কুশচ –এর গবেষণায় যা পাওয়া যায় তা হল-

১।

এলাকাটা খুব ব্যস্ত একটা অঞ্চল।অনেক আগে থেকেই এদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণ জাহাজের আনাগোনা চলত, পরেও চলেছে, এখনও চলছে।দুর্ঘটনা ঘটবেই।বাংলাদেশে যে পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটে প্রতিদিন তা একটা বড় প্রমাণ।আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, দেখা গেছে সমুদ্রের অন্যান্য এলাকায় যে পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটে তার তুলনায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সংখ্যা এক বিন্দু অস্বাভাবিক নয়।

২।

ওদিকে যে পরিমাণ ঝড় হয় তার তুলনায় দুর্ঘটনা আর নিখোঁজ সংখ্যা মোটেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এমন অনেক দূর্ঘটনার কথা বলা আছে যে গুলো আসলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে ঘটেইনি।ঘটেছে এর বাইরের এলাকায়।

৩।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সর্বনাশ করেছেন যে লেখকরা, তারা অনেকসময় অনেক নিরুদ্দেশের বর্ণনা করতে গিয়ে ঝড়ের কথা "ভুলেই" গেছেন, যেগুলো আসলে হয়েছিল প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪।

একটা নৌকা হারিয়ে গেলে রিপোর্ট আসবেই, কিন্তু সেগুলোর ফিরে আসার ঘটনাকে হিসেবেই নেওয়া হয়নি।

৫।

লেখকরা এমন অনেক ঘটনার কথা বলেছেন যেগুলো আসলে ঘটেইনি। সহজ ভাষায়, কুশ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যময়তার জন্য এর রহস্যময়তা দায়ী নয় বরঞ্চ দোষটা ফেলতে হবে রহস্যময়তা সৃষ্টিকারী লেখকদের ঘাড়ে।

প্রসঙ্গত, অতিরঞ্জনের একটা উদাহরণ দেয়া যায়।কথা বলছিলাম ফ্লাইট নাইনটিন নিয়ে।এটি সত্য যে, তদন্তে কারণ হিসেবে লেখা হয়েছিল 'অজ্ঞাত'।কিন্তু এর আগে আসলে পাইলটের ত্রুটি লেখা ছিল, কিন্তু মৃতদের স্বজনদের চাপে সেটা পরিবর্তন করা হয়। হারিয়ে যাবার আগে পাইলট বলছিলেন, কম্পাস কাজ করছে না, তিনি কোথায় আছেন বুঝতে পারছেন না, হয়তো ফ্লোরিডার দিকে। জিপিএসহীন যুগে পাইলটদের নিজস্ব অবস্থান বোঝার উপায় ছিল যাত্রাশুরুর বিন্দু ও কতক্ষণ কত বেগে চালিয়েছেন সেটা বুঝে- তাই একবার পথ হারালে সমুদ্রের উপর অবস্থান বোঝা বড্ড কঠিন ছিল। আর জ্বালানি শেষ দিকে থাকলে তো কথাই নেই। এটাই আসলে ফ্লাইট নাইনটিনের উধাও হবার পেছনে মূল রিপোর্ট ছিল। সার্চ পার্টি কোনোদিন ফিরে আসেনি এটা আংশিক সত্য। আসলে, সার্চ পার্টির দুটো মার্টিন মেরিনার প্লেনের একটি প্লেন ফিরে আসেনি।

কারণ, যাবার পথে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মাঝেই তেলের ট্যাংকে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেটির, এবং সেখানেই তার ইতি। বাজে আবহাওয়ার কারণে এর ধ্বংসাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয়নি, তবে পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবত, ২২ জন ক্রুর একজন ভুলবশত সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন এরকম পরিবেশে কেবিনে বিশেষ গ্যাস থাকে- সেখান থেকেই বিস্ফোরণ।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সত্যিই কি অন্য কিছু ঘটে?উত্তর সামনে আসছে।

অন্যদের প্রতিক্রিয়া:

মেরিন বীমা কোম্পানী "লয়েড'স অব লন্ডন"(Lloyd's of London) দেখেছে যে , এই ত্রিভূজে অন্য সমুদ্রের চেয়ে উল্লেখ্য করবার মত ভয়ংকর কিছু নেই।তাই তারা এই অঞ্চল দিয়ে গমনকারী কোন জাহাজের উপর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাশুল আদায় করে না।যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড লেখকদের বর্ণনার উপর ব্যাপক অনুসন্ধানের পর অনুমোদন করেছে এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক কিছু নেই।উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ১৯৭২ সালে ভি.এ. ফগ (V.A. Fogg) নামের একটি ট্যাঙ্কার মেক্সিকো উপসাগরে বিস্ফোরণেরর পর ডুবে যায়।কোস্ট গার্ডরা সে বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কারের ছবি তোলেন এবং বেশ কিছু মৃত দেহও উদ্ধার করেন। কিন্তু কতিপয় লেখক বলেছেন ঐ ট্যাঙ্কারের সব আরোহী অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধুমাত্র এর ক্যাপ্টেনকে তার কেবিনের টেবিলে হাতে কফির মগ ধরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। টিভি সিরিয়াল NOVA / Horizon এর " দ্যা কেস অব দ্যা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (১৯৭৬-০৬-২৭)" পর্বে বলা হয়েছিল , যে সব দূর্ঘটনার কথা বলা হয় সেগুলো ভিত্তিহীন।'

সংশয়বাদী গবেষকগণ, যেমন আর্নেস্ট ট্যাভস (Ernest Taves) এবং ব্যারি সিংগার(Barry Singer), দেখিয়েছেন যে , মিথ্যে রহস্য তৈরি করা বেশ লাভজনক। কারণ তখন ঐ মিথ্যে রহস্যের উপর ভিত্তি করে বই লিখে বা টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে প্রচুর অর্থ কামানো যায়।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল টি কিছু স্থলভাগের উপর দিয়েও গিয়েছে যেমন পোর্তো রিকো (Puerto Rico), বাহামা এমন কি বারমুডা নিজেই।কিন্তু এসব জায়গায় কোন স্থলযানের নিখোঁজ হবার খবর জানা যায়নি।এছাড়া এই ত্রিভূজের মধ্যে অবস্থিত ফ্রীপোর্ট শহরে বড়সড় জাহাজ কারখানা রয়েছে আর রয়েছে একটি বিমান বন্দর, যা কোন গোলযোগ ছাড়াই বছরে ৫০,০০০ টি বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা:

জাহাজ ডুবে যাওয়া:

কন্টিনেন্টালসেলভে(continental shelve) জমে থাকা বিপুল পরিমাণ মিথেন হাইড্রেট অনেক জাহাজ ডোবার কারণ বলে দেখা গেছে।অস্ট্রেলিয়ায় পরীক্ষাগারের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাতাসের বুদবুদ পানির ঘনত্ব কমিয়ে দেয়।তাই সাগরে যখন পর্যায়ক্রমিক মিথেন উদগীরন হয়, তখন পানির প্লবতা(কোন কিছুকে ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা) কমে ।যদি এমন ঘটনা ঐ এলাকায় ঘটে থাকে তবে সতর্ক হবার আগেই কোন জাহাজ দ্রুত ডুবে যেতে পারে।
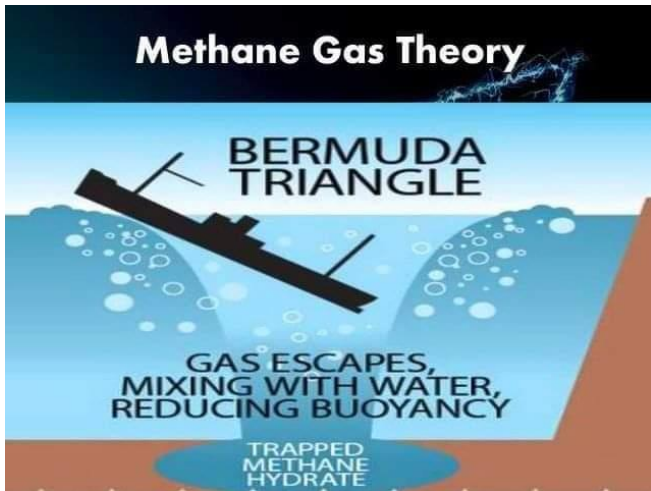
১৯৮১ সালে “ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে” একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বর্ণিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলের বিপরীতে ব্ল্যাক রিজ(Blake Ridge) এলাকায় মিথেন হাইড্রেট রয়েছে।

আবার ইউএসজিএস(ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে) এর ওয়েব পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, গত ১৫০০ বছরের মধ্যে ঐ এলাকায় তেমন হাইড্রেট গ্যাসের উদগীরন ঘটেনি।

কম্পাসের ভুল দিক নির্দেশনা:

কম্পাসের পাঠ নিয়ে বিভ্রান্তি অনেকাংশে এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনীর সাথে জড়িত।

ভূচৌম্বক নিয়ে একটু গবেষণা করলেই একটা কথা পাওয়া যাবে যা হচ্ছে চৌম্বক বিচ্যুতি বা Magnetic Declination। পৃথিবীর সব স্থানেই বিচ্যুতি আছে কিছু না কিছু একটা।পৃথিবীর চৌম্বক মেরু আর ভৌগলিক মেরু সব জায়গায় এক হয় না।এর ফলে আলাদা আলাদা স্থানে কম্পাসের কাটা সরাসরি ভৌগলিক উত্তর দিক বা দক্ষিণ দিক না দেখিয়ে অন্য একটা দিক দেখায়। বিচ্যুতি খুব স্বাভাবিক ঘটনা এবং অনেক অনেক জায়গায় বিচ্যুতি বড় সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলে।নাবিকেরা সাধারণত বিচ্যুতি সম্পর্কে খুব ভাল জানে।কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু বিষয়টা জানেনা তাই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর কম্পাসের আজব আচরণকে অলৌকিক মনে করে ফেলে। বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। শুধু বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল নয়, অনেক জায়গায় কম্পাস উন্মাদ হয়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই।

কম্পাস থেকে চুম্বক মেরুর দূরত্বের উপর ভিত্তি করে এর দিক নির্দেশনায় বিচ্যুতি আসে।উদাহরন হিসেবে বলা যায়- যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র উইসকনসিন(Wisconsin) থেকে মেক্সিকোর উপসাগর(Gulf of Mexico) পর্যন্ত সরলরেখা বরাবর চৌম্বক উত্তর মেরু সঠিক ভাবে ভৌগোলিক উত্তর মেরু নির্দেশ করে।এই সাধারণ তথ্য যে কোন দক্ষ পথপ্রদর্শকের জানা থাকার কথা।কিন্তু সমস্যা হল সাধারণ মানুষকে নিয়ে, যারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না।ঐ ত্রিভুজ এলাকা জুড়ে কম্পাসের এমন বিচ্যুতি তাদের কাছে রহস্যময় মনে হয় কিন্তু এটা খুবই স্বাভবিক ঘটনা।

হারিকেন :

হারিকেন (Hurricane) হল শক্তিশালী ঝড়। ঐতিহাসিক ভাবেই জানা যায়- আটলান্টিক মহাসাগরে বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে শক্তিশালী হারিকেনের কারণে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটেছে, আর ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার। রেকর্ড অনুসারে ১৫২০ সালে স্প্যানিশ নৌবহর “ফ্রান্সিসকো দ্য বোবাডিলা” (Francisco de Bobadilla) এমনি একটি বিধ্বংসী হারিকেনের কবলে পড়ে ডুবে যায়।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনীর সাথে জড়িত অনেক ঘটনার জন্য এধরনের হারিকেনই দায়ী।

গলফ স্ট্রিম:

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে যে পরিমাণ দূর্ঘটনা ঘটে তার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কিছুই নয় আগেই বলেছি। এখন দূর্ঘটনার পিছনে আরও কি কি কারণ আছে সেগুলো আমরা দেখব।বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে ধ্বংস হওয়া জাহাজ পাওয়া যায় না কেন? বড় কারণ হচ্ছে গাল্ফ প্রবাহ(Gulf Stream)।

গলফ স্ট্রিম হল মেক্সিকো উপসাগর থেকে স্ট্রেইটস অব ফ্লোরিডা(Straits of Florida) হয়ে উত্তর আটলান্টিকের দিকে প্রবাহিত উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। একে বলা যায় মহা সমুদ্রের মাঝে এক নদী।নদীর স্রোতের মত গলফ স্ট্রিম ভাসমান বস্তু কে স্রোতের দিকে ভাসিয়ে নিতে পারে।

সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই অত্যন্ত শক্তিশালী উষ্ণপ্রবাহ উত্তর দিকে বয়ে চলেছে।

পানিতে ডুবে যাওয়া জাহাজ বা নৌকা গাল্ফ প্রবাহে পড়ে পানির টানে অনেক দূর চলে যায়, যে কারণে এদের খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তা আর বলতে হবে না।

যেমনি ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের ২২ ডিসেম্বর “ উইচক্রাফট” নামের একটি প্রমোদতরীতে।মিয়ামি তীর হতে এক মাইল দূরে এর ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিলে তার নাবিকরা তাদের অবস্থান কোস্ট গার্ডকে জানায়। কিন্তু কোস্ট গার্ডরা তাদেরকে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পায়নি।
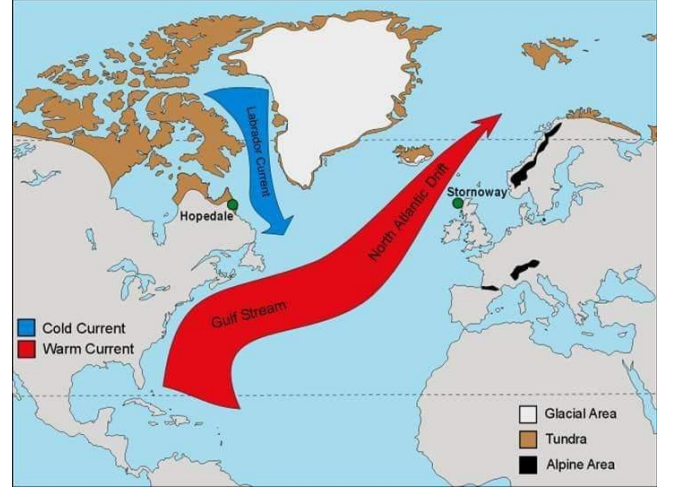
Rogue wave (বাংলা কি হবে? বদমাশ ঢেউ!) আরেকটা কারণ।এই ঢেউগুলো একাকী ঢেউ।অনেকগুলো সাধারণ ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ করে দেখা যায় খুব বড় আর শক্তিশালী একটা ঢেউকে যারা এতই ভয়ানক যে এদের আঘাতে জাহাজ ভেঙে যায়। বিজ্ঞানীরা এদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন মাত্র ১৯৯৫ সালে। তারমানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের বিপুল সংখ্যক জাহাজ ধ্বংস হওয়ার পিছনে বদমাশ ঢেউগুলোকে দায়ী করাই যায়।সমুদ্রের নিচে জমে থাকা মিথেন হাইড্রেটকে অনেকে দায়ী করেন।হঠাৎ করে নির্গত হয়ে বড় বড় জাহাজকে এরা ডুবিয়ে দিতে পারে এক নিমেষে।যদিও বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে বড় পরিমাণ গ্যাস নির্গমনের কোন খবর পাওয়া যায়নি।
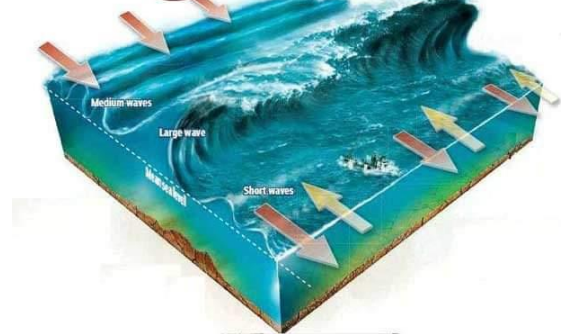
মানব ঘটিত দূর্ঘটনা:

অনেক জাহাজ এবং বিমান নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্তে দেখা গিয়েছে এর অধিকাংশই চালকের ভুলের কারণে দূর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।মানুষের ভুল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আর এমনি ভুলের কারণে দূর্ঘটনা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলেও ঘটেতে পারে।যেমন কোস্ট গার্ড ১৯৭২ সালে ভি.এ. ফগ (V.A. Fogg)-এর নিখোঁজ হবার কারণ হিসেবে বেনজিন এর পরিত্যাক্ত অংশ অপসারনের জন্য দক্ষ শ্রমিকের অভাবকে দায়ী করেছে।সম্ভবত ব্যবসায়ী হার্ভি কোনভার(Harvey Conover) এর ইয়ট টি তার অসাবধানতার কারণেই নিখোঁজ হয়।অনেক নিখোঁজের ঘটনারই উপসংহারে পৌঁছানো যায়নি, কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাদের কোন ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

জলদস্যু+ইচ্ছাকৃত ভাবে যে সব ধ্বংস সাধিত হয়েছে:

যুদ্ধের সময় অনেক জাহাজ শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে ডুবে গিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। এ কারণেও জাহাজ নিখোঁজ হতে পারে। তবে বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু জাহাজ, যাদের মনে করা হয় এমনি কারণে ডুবেছে, তাদের উপর অনুসন্ধান করা হয়।তবে শত্রুপক্ষের নথিপত্র, নির্দেশনার লগ বই ইত্যাদি পরীক্ষা করে তেমন কিছু প্রমাণ করা যায়নি।যেমন- মনে করা হয় ১৯১৮ সালে ইউ এস এস সাইক্লপস(USS Cyclops) এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধে এর সিস্টার শিপ প্রোটিয়াস(Proteu) এবং নিরিয়াস(Nereus) কে জার্মান ডুবোজাহাজ ডুবিয়ে দেয়।কিন্তু পরবর্তীতে জার্মান রেকর্ড থেকে তার সত্যতা প্রমাণ করা যায়নি।

আবার ধারণা করা হয় জলদস্যুদের আক্রমণে অনেক জাহাজ নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারে। সে সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে এবং ভারত মহাসাগরে মালবাহী জাহাজ চুরি খুব সাধারণ ঘটনা ছিল।মাদক চোরাচালানকারীরা সুবিধা মত জাহাজ, নৌকা, ইয়ট ইত্যাদি চুরি করত মাদক চোরাচালানের জন্য।১৫৬০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ছিল জলদস্যুদের আখড়া। কুখ্যাত জলদস্যু এডওয়ার্ড টিচ(Edward Teach (Blackbeard)) এবং জেন ল্যাফিট্টি(Jean Lafitte) ছিল ঐ অঞ্চলের বিভীষিকা। তবে শোনা যায় জেন ল্যাফিট্টি(Jean Lafitte)-ই নাকি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের শিকার হয়েছিল।

আর এক ধরনের দস্যুতার কথা শোনা যায়, যা পরিচলিত হত স্থল থেকে।এধরনের দস্যুরা সমুদ্র ধারে রাতে আলো জ্বালিয়ে জাহাজের নাবিকদের বিভ্রান্ত করত।নাবিকরা ঐ আলোকে বাতি ঘরের আলো মনে করে সেদিকে অগ্রসর হত।তখন জাহাজগুলি ডুবো পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে ডুবে যেত।আর তারপরে ডোবা জাহাজের মালপত্র তীরের দিকে ভেসে এলে দস্যুরা তা সংগ্রহ করত।হয়তো ডুবন্ত জাহাজে কোন নাবিক বেঁচে থাকলে দস্যুরা তাদেরকেও হত্যা করত।

ফ্লাইট নাইনটিন(Flight 19):

ফ্লাইট ১৯ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের নিখোঁজ কাহিনীগুলোর অন্যতম।

পাঁচটি যুদ্ধবিমান কেন অদৃশ্য হয়ে গেল?

ফ্লাইট ১৯, ৫টি টিভিএম আভেঞ্জার টর্পেডো বোমারু বিমানের একটি, যেটি প্রশিক্ষণ চলাকালে ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়। বিমানবাহিনীর ফ্লাইট পরিকল্পনা ছিল ফোর্ট লডারদেল থেকে ১৪৫ মাইল পূর্বে এবং ৭৩ মাইল উত্তরে গিয়ে, ১৪০ মাইল ফিরে এসে প্রশিক্ষণ শেষ করা।বিমানটি আর ফিরে আসেনি।নেভি তদন্তকারীরা নেভিগেশন ভুলের কারণে বিমানের জ্বালানীশূন্যতাকে বিমান নিখোঁজের কারণ বলে চিহ্নিত করে।

বিমানটি অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য পাঠানো বিমানের মধ্যে একটি বিমান পিবিএম ম্যারিনার ১৩ জন ক্রুসহ নিখোঁজ হয়।

বহরটির কোন দূর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সবাই জানত। কারণ বিমান বহরটির পাইলটদের মাঝে একজন মাত্র ছিলেন অভিজ্ঞ, বাকিরা সবাই শিক্ষানবীস।অভিজ্ঞ লেফট্যানেন্ট চার্লস টেলরের কুখ্যাতি আগে থেকেই ছিল পথ হারিয়ে ফেলার, এমন ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটিয়েছেন।অবশ্য আমাদেরও বুঝতে হবে তখন উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছিল না, পাইলটকে নির্ভর করত হত গতি, দিক আর স্মৃতিশক্তির উপর।বিমান বহর থেকে খুব দুর্বল কিছু সিগন্যালে টেলর জানান যে তিনি দিক নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।ভুলটা যে তিনিই করেছিলেন তা পরে সহজে বুঝা গিয়েছে। এমনকি টেলরের ছাত্ররা পর্যন্ত ধারণা করতে পেরেছিলেন তার ভুলটা কি হয়েছে।স্থলভূমি থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ায় জ্বালানী শেষ হয়ে সম্ভবত বিমানগুলো পানিতে পড়ে যায়। ওই বিশেষ অ্যাভেঞ্জারগুলো তাদের ওজনের জন্য বিখ্যাত ছিল, তারমানে পানিতে পড়ার সাথে সাথে বিমানগুলো তলিয়ে যায়।ফ্লাইট ১৯ এর খোঁজে যাওয়া দলটিও নিখোঁজ হয়ে যায় এ ধারণাও ঠিক নয়।আসলে বিমানটির খোঁজে দুটো মার্টিন ম্যারিনার গিয়েছিল যাদের একটা ঠিকই ফিরে আসে।আরেকটাও উধাও হয়ে যায় নি। সেই সময় আরেকটা জাহাজ দূরে একটা বিস্ফোরণ দেখতে পায়, যা ছিল সম্ভবত দ্বিতীয় মার্টিন ম্যারিনার বিমানটির। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওই বিমানগুলো “উড়ন্ত বোমা” নামেই পরিচিত ছিল কারণ অনেক রেকর্ডআছে এদের আকাশে থাকতেই বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার।কিন্তু প্রতিটা ঘটনার এত সুন্দর ব্যাখ্যা থাকার পরও কেন নেভির রিপোর্টে বলা

হল "অজানা কারণে নিরুদ্দেশ" হয়েছে বিমানবহরটি? এই ঘটনাও খুব সাধারণ আর তা হচ্ছে টেলরের মা।দূর্ঘটনার বর্ণনা করতে গেলেই টেলরের উপর দোষ ফেলতে হয়, কিন্তু তার মা এর প্রতিবাদ করেন।শুধু শুধু মহিলার অনূভূতিতে আঘাত না দিয়ে নেভি তাই এভাবেই রিপোর্টটা সাজায়।

ইউএসএস সাইক্লপস(USS Cyclops) :

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ- ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক (যুদ্ধ ছাড়া) ক্ষতি হচ্ছে ইউ এস এস সাইক্লপস নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। অতিরিক্ত ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ভর্তি বিমানটি ১৯১৮ সালের ৪ মার্চ বার্বাডোস দ্বীপ থেকে উড্ডয়নের পর একটি ইঞ্জিন বিকল হয় এবং ৩০৯ জন ক্রুসহ নিখোঁজ হয়।যদিও কোন শক্ত প্রমাণ নেই তবুও অনেক কাহিনি শোনা যায়।কারো মতে ঝড় দায়ী, কারো মত ডুবে গেছে আবার কেউ এই ক্ষতির জন্য শত্রুপক্ষকে দায়ী করে।

উপরন্তু, সাইক্লপস-এর মত আর দুইটি ছোট জাহাজ প্রোটিউস এবং নেরেউস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়। সাইক্লপসের মত এই জাহাজদুটিতেও অতিরিক্ত আকরিকে ভর্তি ছিল। তিনটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত মালামাল ধারণে অক্ষমতার (ডিজাইনগত) কারণেই জাহাজডুবি হয় বলেই ব্যাপক ধারণা করা হয়।

ডগলাস ডিসি ৩ (Douglas DC-3) :

২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে একটি ডগলাস ডিসি - ৩, ফ্লাইট নাম্বার NC16002, সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। বিমান থাকা ৩২ জনসহ বিমানটির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সিভিল এরোনটিক্স বোর্ড তদন্ত নথিপত্র থেকে বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাব্য একটি কারণ পাওয়া যায়, সেটি হল - বিমানের ব্যাটারি ঠিকমত চার্জ না করে পাইলট সান জুয়ান থেকে রওনা দেয়।কিন্তু এটা সত্যি কিনা তা জানা যায়নি।

এখনও রহস্য?

যখন উন্নতমানের টেকনোলজি বের হয়ে গেল নেভিগেশনের জন্য, স্যাটেলাইট বসানো হল, তখন যেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে আর কোন রহস্য রইল না।শয়তানের ত্রিভুজ আর কোন রহস্যের জন্ম দিতে পারল না, একেবারেই চুপ মেরে গেছে। অনেক গবেষণা করেও ওই অঞ্চলে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় নি।এটা কি কোন খেলা? আজ হাজার হাজার জলযান আর আকাশযান ওই অঞ্চলদিয়ে কোন রকমের ব্যাঘাত ছাড়াই চলাচল করে।বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আসলে কোন রহস্য ছিলই না, অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।থাকলে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেত না।

শেষ কথা:

বারমুডা ট্রায়েঙ্গেলকে শয়তানের ত্রিভুজ বানিয়েছে মানুষ।সাধারণ ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে পরিবর্তন করে রহস্যগল্প বানিয়ে তুলেছে। সেই রহস্যগল্পের রহস্য অনেক আগেই ভেদ হয়ে গিয়েছে।

বাড়তি উত্তেজনার জন্য কল্পণা করে নিতে পারেন যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে আসলেও কিছু একটা আছে

ভিনগ্রহের প্রাণী, হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস, ফ্লাইং সসার যা খুশি। তাতে আনন্দ পেলে ক্ষতি নেই মোটেও, শুধু মনে রাখতে হবে যে হ্যারি পটার পড়ে যে আনন্দ আমরা পাই তার সাথে এই আনন্দের খুব একটা পার্থক্য নেই।

মিসির আলি

নাঈম হোসেন ফারুকী

তোমরা জানো কি?
মিসির আলি মোটামুটি ফিকশনের সিরিজ, সেখানকার বহু লজিক ঠিক না।

১. টেলিপ্যাথি বিজ্ঞান মতে সম্ভব না, আর এখন পর্যন্ত কোন কংক্রিট প্রমাণ পাওয়া যায় নি।টেলিপ্যাথির দাবীদার প্রত্যেকেই ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।আর, মায়েরা সন্তানদের খুব ভালো করে চেনে বলে অনেক কিছু অনুমান করতে পারে, কিন্তু মনের কথা পড়তে পারে না।বিশ্বাস না হলে মনে মনে ৫ অংকের একটা র‍্যান্ডম সংখ্যা (টাকার নাম্বার থেকে) ধরে মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

তবে ব্রেইনে সেন্সর বসিয়ে প্যাটার্ন ডিপ লার্নিং এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে মনের কথা পড়া যায়, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে রোবটও গড়ে উঠেছে।

টেলিপ্যাথি মিসির আলির গল্পগুলোর কমন তবিম একটা।

২. মাল্টিভার্স, প্যারালাল ইউনিভার্সের কোন প্রমাণ নেই এখনও।থাকলেও সেখানকার মানুষরা আমাদের মিরর প্রতিবিম্ব এটা কেবলই কল্পনা।(সম্ভবত পুফি)

৩. মৃত্যু হয় ব্রেইন বন্ধ হয়ে গেলে, হার্ট না।ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হলে মানুষ নেয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স করে, এ সময় অনেক সময় তীব্র ধর্মীয় অনুভূতি হয়।তবে একই অনুভূতি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে স্টিমুলেশন দিয়েও দেওয়া যায়।এতে অলৌকিক কিছু নেই।(আমিই মিসির আলি)

৪. মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের চেতনা আছে, তাদের ভাষাও আছে।কিন্তু সেই ভাষার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সীমিত, আর এরা মানুষ লেভেলের ডিপ চিন্তা করতে পারে না।(বিপদ)

৫. ভূত প্রেত জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না কারণ ড্রাগের প্রভাব, মানসিক রোগ, হ্যালুসিনেশন, ইনফ্রা সাউন্ড, কেমিক্যালের প্রভাব, অক্সিজেনের অভাব, ফলস মেমোরি ইত্যাদি দিয়ে সকল ভুতুড়ে ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়।(দেবী)

হুমায়ূন আহমেদ আমার খুব প্রিয় একজন লেখক, কিন্তু ফিকশনকে ফিকশন হিসাবে নেওয়া উচিত।বাস্তবতার সাথে মেলানো উচিত না।

লজিক্যাল ফ্যালাসি

নাঈম হোসেন ফারুকী

ফ্যালাসি মানে হচ্ছে কুযুক্তি। লজিকের একটা বড় পার্ট হচ্ছে কুযুক্তি গুলো এড়িয়ে চলা।নানান জাতের ফ্যালাসি আছে।কয়েকটা নিয়ে লিখি।আমি বললাম, পাখি পাকা পেঁপে খায়।

১।আপনি বললেন, পাখি যখন পাকা আম খেয়েছে তখন আপনি কই ছিলেন? আজকে পাকা পেঁপে খাওয়ার সময় দেখতে এসেছেন কেন? এটা কুযুক্তি। কারণ, পাকা আম খাওয়ার সময় আমি কিছু বলি নি, তার মানে এই না যে পাখির এই পাকা পেঁপে খাওয়াটা ঠিক কাজ হচ্ছে। এই কুযুক্তির নাম Appeal to Hypocrisy.

২। পাখি পাকা পেঁপে খায়। মানুষ পাকা পেঁপে খায়। তাই, মানুষ হচ্ছে পাখি। চরম কুযুক্তি। পাকা পেঁপে খেলেই পাখি হবে কে বলল? এর নাম Affirming the consequent.

৩। পাখি পাকা পেঁপে খায়। বিড়াল পাখিকে খায়। তাই বিড়াল পাকা পেঁপে খায়। মানে কি?!! পেঁপে পাখির শরীরে যায়, তারপর হজম হয়ে পাখির পার্ট হয়। বিড়াল পাখিকে খেলে বিড়ালের পাকা পেঁপে খাওয়া হলো?!! এইটার নাম মনে নাই। Fallacy of composition

৪। পাখিও নাই। পেঁপেও নাই। তারমানে পাখি পেঁপে খেয়েছে। কেন ভাই, অন্য কেউ খেতে পারে না? বুঝলাম পেঁপে নাই, তাই বলে পাখিকেই খেতে হবে সেটা? এর নাম Appeal to Ignorance.

৫। পাখির মালিক বলেছে পাখি পাকা পেঁপে খায় নি। তাই পাখি পাকা পেঁপে খায় নি। কেন, পাখির মালিক মিথ্যা বলতে পারে না? এর নাম Appeal to Authority.

৬। পাখিই পাকা পেঁপে খেয়েছে। কারণ সে পাখি। এটা হচ্ছে Circular Argument. গোল করে যুক্তি দেওয়া। আসলে কোন যুক্তিই না।

৭। এতো সুন্দর একটা পাখি। কি সুন্দর ডাকে! কি সুন্দর তার চলন! তার পক্ষে পাকা পেঁপে খাওয়া সম্ভব, আপনিই বলেন? এর নাম Emotional Appeal. আপনাকে ইমোশনাল ব্ল্যাক মেইল করা হচ্ছে। সাবধান।

৮। যে পাখি এই রকম একটা পাকা পেঁপে খেতে পারে, সে মানুষ খুন করতে পারে। থামেন ভাই। আর বেশি এক্সাইটেড হবেন না। ইনাফ। যাই হোক, এর নাম Faulty Analogy. অবাস্তব তুলনা।

৯। পাখি নোয়াখাইল্লা। সে পাকা পেঁপে খাবেই। যথেষ্ট। নোয়াখাইল্লা পাখি হলেই সে পাকা পেঁপে খাবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি Hasty Generalization করছেন।

১০। বাদ দেন পেঁপের কথা। আমার পাখি কালকে কি ম্যাসেজ পাঠিয়েছে দেখেন। এর নাম Red Herring. মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে।

পাতালের দানব

হাসান-উজ-জামান

১।

দানবটা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল মাটির নিচে- কেউ তার নামনিশানা জানত না।হঠাৎ সে জেগে উঠল।আমরাই তাকে জাগালাম।

সত্তরের সময়কার কথা বলছি।বাংলাদেশের মানুষের খাওয়ার পানির উৎস ছিল পুকুর নদী খাল বিল।ওলা বিবির আছরে তখন দেশে বছরে আড়াই লাখ করে শিশু লাশ হচ্ছে।

আমাদের আন্তর্জাতিক শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরিস্থিতি এভাবে আর চলতে দিতে চাইলেন না।তাদের সমাধান ছিল একদম সহজ- আমাদের মাটির নিচে হাজার কোটি লিটার পানি মজুত হয়ে রয়েছে।পাতাল বলে সেখানে রোগজীবাণু থাকার আশঙ্কা নেই।সেই পানি একটা পাম্প জাতীয় কিছু দিয়ে তুলে নিলেই হয়।দেশের মানুষ এরপর থেকে আর নদীনালা থেকে পানি খেয়ে মরবে না, মাটির তলা থেকে বিশুদ্ধ পানি বের করে খাবে।ইউনিসেফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক টিউবওয়েল দিয়ে দেশটাকে ছেয়ে ফেলল।
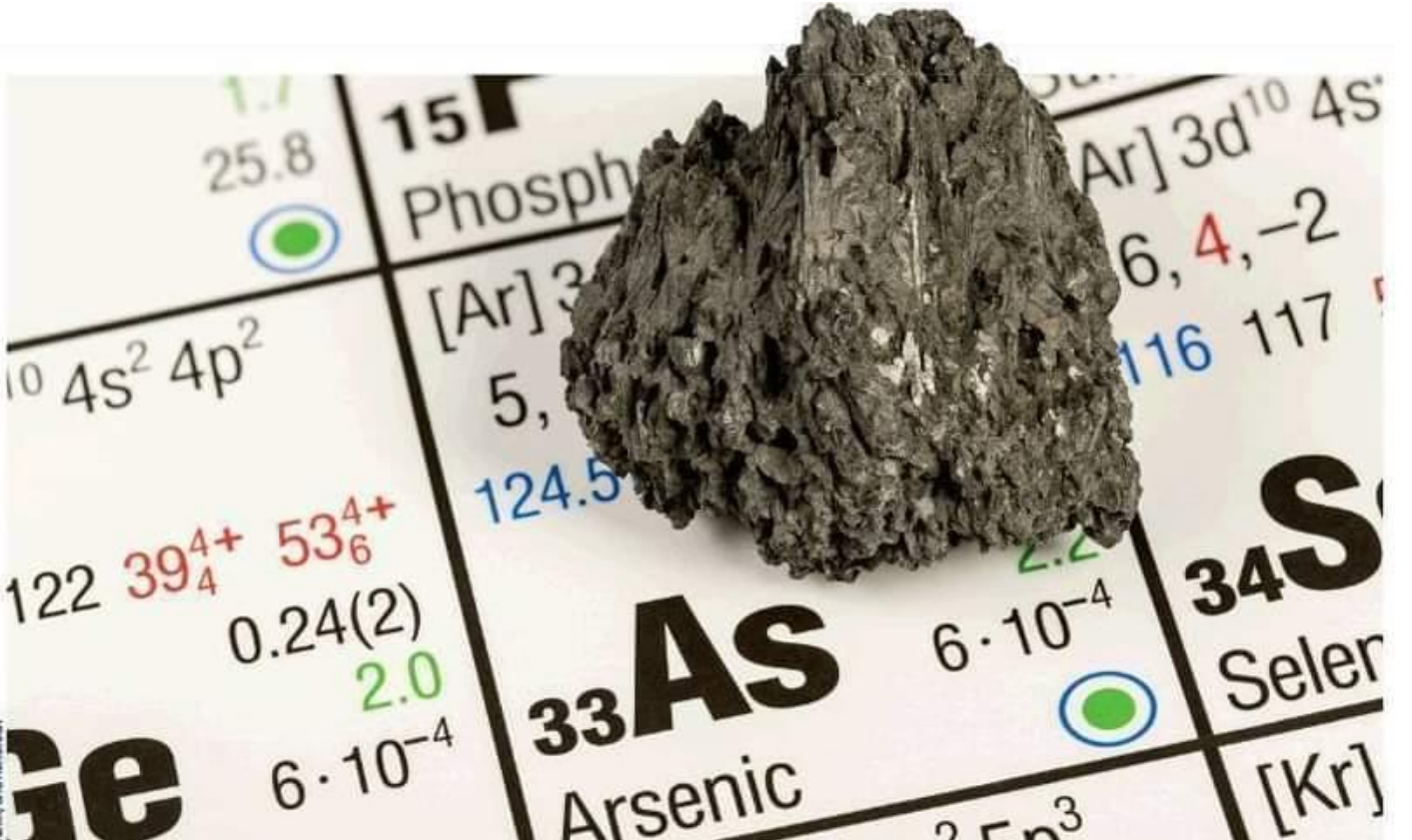
দানবটাকে আমরা চিনতে পারলাম নব্বইয়ের শুরুর দিকে, যখন কিছু বিজ্ঞানী টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া শুরু করলেন। ব্যাপারটা যে আদৌ সম্ভব, এর আগে সেটা কারো মাথাতেই আসেনি। আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের দাদারা আমাদের জানিয়েছিলেন- দেখুন, আপনাদের দেশ থেকে বর্ডার ক্রস করে যারা আসে, তাদের কিন্তু অনেকের মধ্যেই আর্সেনিকের বিষক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। আমরা সেটা আমলে নেইনি। বাংলাদেশের মত জিওলজিতে আসলে আর্সেনিক থাকার কথাও নয়। হিমালয় থেকে গঙ্গা যে কাদার সাথে আর্সেনিক দেশময় জড়ো করেছে তা বিজ্ঞানীরা জানতেন। সেটা নিয়ে তারা অত চিন্তা করেননি, কারণ সেই কাদার মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে এই নদীবাহিত কাদার স্তর এতই পুরু যে ওপরের পানির এই স্তর ভেদ করে নিচে জড়ো হতে অনেক সময় লেগে যায়।সেই সময়টাতে কাদার কোনাকাঞ্চিতে যত আর্সেনিক আছে, সব সুরসুর করে বের হয়ে পানির মধ্যে ঢোকে। ওপরের পরিষ্কার বৃষ্টির পানি নিচে গিয়ে হয়ে যায় আর্সেনিকের বিষাক্ত ঝোল।

সেই ঝোলই সত্তরের দশকে দেশের অজস্র নলকূপের উপশিরা বেয়ে পাতাল থেকে মর্ত্যে উঠে আসা শুরু করল।প্রথম প্রথম এই নলকূপ বিপ্লবের সময় গ্রামগঞ্জের অনেকে কুসংস্কার থেকে বলতেন- এই পানি শয়তানের পানি। তারা খুব ভুল বলেননি। আর্সেনিক সায়ানাইডের মত নয় যে খেলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। বছরের পর বছর আর্সেনিকঅলা পানি খেতে থাকলে তবেই সে চামড়া-ফুসফুস-যকৃত-মায় হৃদযন্ত্রে ক্যান্সারের আগুনটা ধরানো শুরু করে। শুধু তাই নয়, আর্সেনিক গর্ভবতী মায়েদের অমরার মধ্যে দিয়ে শিশুর দেহে চলে যেতে পারে- যেজন্য আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় শিশুদের মানসিক বৈকল্যের হার বেশি।

এই ধরণের "সাইলেন্ট কিলার" গোছের বিষ মানুষের জন্য আখেরে সায়ানাইডের থেকেও অনেক বেশি ক্ষতিকর- দেশজোড়া মানুষের হাতে-মুখে কালো ফুটকি সাদা হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের ব্যাপারটা বুঝে উঠতে অনেকদিন লাগল।

জনস্বাস্থ্য বা পাবলিক হেলথ সেক্টরে সরকারের সাথে বিজ্ঞানীদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে আমার চিন্তাটা এরকম। আমার দৃষ্টিতে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একটা বিশাল দশাসই হাতির মত। তাকে তার দৈনন্দিন যাত্রাপথ কাজকর্ম থেকে অন্য দিকে ফেরানো সহজ নয়। বিশেষ করে আমাদের মত গরিব দেশে এমনিতেই সে কোটি মানুষের অর্বুদ সমস্যা নিয়ে হাঁসফাঁসিয়ে মরছে। তার মনযোগ যদি আপনি অন্য কোন স্বাস্থ্যসমস্যার দিকে নিতে চান, তাহলে এই সমস্যা যে আসলেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- এই মর্মে আপনাকে অকাট্য প্রমাণ দাখিল করতে হবে, যাতে এই বিকট জগদ্দল রাষ্ট্রযন্ত্র অপ্রয়োজনীয় কিছুর দিকে খামোখা না এগোয়। বিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে এই প্রমাণগুলো দাখিল করে হাতির মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা। এই প্রেক্ষিতে আর্সেনিকের মত একটা ব্যাপার বিজ্ঞানীদের জন্য আসলেই খুব ঝামেলার। যে বিষ আজ পেটে পড়লে বিশ বছর পরে গিয়ে ক্রিয়া ঘটায়, তার কার্যকারণের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সহজ নয়। এই জন্যই তামাকের কোম্পানিরা এতদিন পর্যন্ত সিগারেটের ক্ষতিকর দিকগুলো ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পেরেছিল, কারণ এর প্রভাব পড়ে দেরিতে।

তো এই প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে যে সমস্যাটাতে বিজ্ঞানীরা পড়লেন সেটা হচ্ছে বুঝে ওঠা যে আসলে দেশময় এর প্রভাব কতখানি।দেশের আটষট্টিহাজার গ্রামের প্রত্যেকটাতেই নলকূপ, প্রত্যেকটাতেই বিষক্রিয়া হবার সম্ভাবনা। গবেষকদের এক গ্রুপের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে নলকূপের সংখ্যা এক কোটি। তার মানে বাংলাদেশে আর্সেনিকের প্রভাব জানতে হলে এই এক কোটি নলকূপের পানি পরীক্ষা করতে হবে। তুলনার জন্য বলি- বাংলাদেশে চার বছর অন্তর অন্তর দেশব্যাপী যে পানির শুমারী হয়, তার অংশ হিসেবে খুব বেশি হলে ষোল হাজারের মত নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়।সে তুলনায় এক কোটি নলকূপ নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার। এই জরিপ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েই আলাদা গল্প লেখা হয়ে যাবে।

যাই হোক, দু'হাজার সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশানের রিপোর্টে বলা হল- বাংলাদেশের সাড়ে তিন থেকে সাত দশমিক সাত কোটি মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে যাচ্ছে।

দেশের জন্য কাজ করার পূর্বশর্ত হল দেশের ট্র্যাজেডিগুলোকে চিনতে শেখা। চেরনোবিল বিস্ফোরণের কথা আমরা সবাই জানি। এই বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তার কারণে ক্যান্সারে মৃত্যুর সম্ভাবনা মোট চার হাজারের মত মানুষের। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বছরে তেতাল্লিশ হাজার।

সে তো অনেকদিন আগের কথা, এখন দেশের আর্সেনিক পরিস্থিতি কীরকম? বাংলাদেশে খাওয়ার পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্যের সবচেয়ে ভাল এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল Multiple Indicator Cluster Survey। এই জরিপ ইউনিসেফ আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নেতৃত্বে দেশের প্রত্যেক জেলায় চার বছর অন্তর অন্তর হয়। এর অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা প্রত্যেক জেলায় গিয়ে প্রচুর বসতবাড়ি থেকে পানির নমুনা নিয়ে

পরীক্ষা করেন। জরিপটির সর্বশেষ রিপোর্ট বের হয়েছে ২০১৩ সালে।এই রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশের সাড়ে বারো শতাংশ বসতবাড়ির পানিতেই আর্সেনিকের মাত্রা বিপদসীমার অধিক।

সাড়ে বারো শতাংশ মানে আট ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি আটটা ঘরের একটাতে দানবটা এখনও রয়ে গেছে।

এই সংখ্যার মধ্যেও একটা বিশাল কিন্তু থেকে যায়।আর্সেনিকের যে বিপদসীমার কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিপদসীমা নয়। বাংলাদেশ সরকার পানিতে ন্যূনতম যে পরিমাণ আর্সেনিক থাকলে সেটাকে বিপজ্জনক মনে করে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পেলেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান তাকে বিপজ্জনক বলে দেয়। আমরা এখনো আমাদের বিপদসীমা অত নিচে নামাইনি। এই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিপদসীমার কথা যদি বলেন, তাহলে বাংলাদেশের চারভাগের একভাগ বসতবাড়িই আর্সেনিক বিষক্রিয়ার শিকার।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশানের রিপোর্টটার লেখক বলেছিলেন, বাংলাদেশের এই ট্র্যাজেডির সাথে বিশ্বের আর কোন ঘটনারই তুলনা হয় না, হোক সে ভোপাল কিংবা চেরনোবিল। ভদ্রলোকের আরেকটা উক্তি- বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা হল "the largest mass poisoning of a population in history"।

এরপর থেকে বাংলাদেশে আর্সেনিক নিয়ে কখনও ভাবতে বসলে এই কথাটা কয়েকবার মনে মনে আউড়ে নেবেন। The largest mass poisoning of a population in history.

এই দানবের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া একান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার, তবে এ নিয়ে যে গবেষকরা হাত গুটিয়ে আছেন তা নয়। আজকাল আর্সেনিক পরিহারের মোটামুটি সবচেয়ে সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য উপায় হল গভীর নলকূপের পানি খাওয়া। আর্সেনিকযুক্ত পানি যে একদম পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত চলে গেছে তা কিন্তু নয়- এই পানি থাকে মোটামুটি মাটি থেকে বিশ থেকে একশ' মিটার গভীরতার মধ্যে।অর্থাৎ আপনার নলকূপ যদি তিনশ' ফুট বা তার কম গভীরতা থেকে পানি তোলে, তাহলে তাতে আর্সেনিক থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু নলটাকে যদি আরো খানিকটা গভীরে ঢুকিয়ে দিতে পারেন- তাহলে নল এমন প্রাচীন মাটিতে গিয়ে ঠেকবে, যেখানকার পানি থেকে আর্সেনিক অনেক আগেই সাফ হয়ে গেছে।কাজেই সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় আমাদের প্রধান কাজ হবে দেশটাকে গভীর নলকূপে ছেয়ে ফেলা।

জনস্বাস্থ্যের কোন সমস্যারই সহজ সমাধান নেই।গভীর নলকূপের এমনিতে বাহ্যিক কিছু সমস্যা তো আছেই- এত নিচ পর্যন্ত নল বসাতে অনেকগুলো টাকা লাগে, যে সামর্থ অনেক পরিবারেরই নেই।কিন্তু এর চেয়ে সূক্ষ্ম একটা সমস্যা আছে, যেটা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না।

যেহেতু গভীর নলকূপ বসাতে পয়সা বেশি লাগে, কাজেই প্রতি গ্রামে সাধারণত এদের সংখ্যা থাকে কম। কোন পরিবারকে গভীর নলকূপ থেকে পানি আনতে গেলে অনেক দূর হাঁটতে হয়।পনেরো-বিশ লিটারের কলসি নিয়ে এতদূর হাঁটা যথেষ্ট কষ্টের কাজ, কাজেই সাধারণত এসব পরিবার একেবারে অনেকখানি পানি এনে বাসায় জমিয়ে রাখেন। সমস্যাটা সেখানেই- পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখলে এর মধ্যে রোগজীবাণু বংশবিস্তারের সুযোগ পেয়ে যায়।এটা হচ্ছে গভীর নলকূপ ব্যবহারের একটা পরোক্ষ

সমস্যা-আর্সেনিকমুক্ত পানি দিতে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে আবার রোগজীবাণুঘটিত পানি দূষণের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে।

এটা এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বির এক গবেষণায় এই আশঙ্কাগুলো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা চাঁদপুরের প্রায় পাঁচশ পরিবারের পানির উৎস, ব্যবহার, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, রোগজীবাণুর পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখেছেন- প্রথমত, গভীর নলকূপ ব্যবহারকারী পরিবারগুলো আসলেই পানি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে জমিয়ে রাখেন। দ্বিতীয়ত, যাদের বাড়ি থেকে গভীর নলকূপ একটু দূরে, তাদের খাওয়ার পানি রোগজীবাণু দিয়ে দূষিত থাকার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের প্রায় দেড়গুণ।

মানুষের সমস্ত প্রযুক্তিতেই বোধহয় কোথাও না কোথাও একটা কিন্তু থেকেই যায়।

২।

আর্জেন্টিনার এক শহরে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বিপদসীমার প্রায় একশ' গুণ।

এত ভয়াবহ পরীক্ষা সৃষ্টিকর্তা বাংলাদেশীদের দেননি। আমাদের নদনদী খালবিলের পানিতে আর্সেনিক নেই ভূগর্ভস্থ পানির মজুদে হাত দিতে না গেলে আর্সেনিকের কথাই হয়ত আমরা জানতাম না।অন্যদিকে আর্জেন্টিনার যে শহরের কথা বলছি, সেখানকার নদীনালার পানি আর্সেনিকে ভারী হয়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এত আর্সেনিক থাকা সত্ত্বেও এতে এসব এলাকার মানুষের সেরকম কোন সমস্যা হচ্ছে না।আর্সেনিকজনিত কোন

জনস্বাস্থ্যের ক্রাইসিস এখানে হয়েছে, এমনটাও শোনা যায় না।

অথচ আর্সেনিক এখানে সবসময়ই ছিল। এখানকার মানুষ শবদেহ মমি করে রাখত। সেরকম এক সাতহাজার বছর পুরোনো মমির চুলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।কোন কোন গবেষক মনে করেন,

শবদেহ মমি করার এই সংস্কৃতিটাই আর্জেন্টিনায় এসেছে আর্সেনিক থেকে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার একটা পরিণতি হল গর্ভপাত। কোন সমাজে যদি শিশুমৃত্যুর হার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি থাকে, তাহলে এর সাথে আপোস করার জন্য সমাজ-সংস্কৃতিতে কোন না কোন একটা পরিবর্তন আনতেই হয়। সীমাহীন নিষ্ঠুরতা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।তাই এই এলাকার মানুষেরা তাদের শিশুদের দেহগুলো যত্ন করে মমি করে রাখা শুরু করল।

কিন্তু এসব সমস্যা পুরোনো।আজকের আর্জেন্টিনায় আর্সেনিক আছে ঠিকই, কিন্তু তার বিষদাঁত যেন নেই।কোন এক আশ্চর্য উপায়ে আতাকামা মরুভূমির মানুষগুলো হাজার হাজার বছর ধরে এই দানবের সাথে সহাবস্থান করে আছে।

জীববিজ্ঞান পড়ুয়া পাঠক হয়ত আঁচ করতে পারছেন এই রহস্যের সমাধান কোথায়। আর্জেন্টিনার আতাকামা মরুভূমির এই মানুষগুলোর বিবর্তন হয়েছে।

বিবর্তন শুনে আমাদের অনেকের মাথায় প্রথম যে ধারণাটা আসে সেটা হল বানর থেকে মানুষ হওয়া। আসলে বিবর্তন ব্যাপারটা আরো অনেক ব্যাপক।যেমন ধরুন দুধ খাওয়ার অভ্যাস করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের বিবর্তন হয়েছে।মানুষের পেট লোহার মেশিন নয় যে এতে যা পড়বে সবই সে হজম করে ফেলবে।কাঠ আমরা চিবিয়ে খেতে পারিনা কেন? কারণ কাঠ

ভেঙ্গেচুড়ে পরিপাক করে সেখান থেকে শক্তি বের করার কৌশল আমাদের শরীরের জানা নেই। দুধও একসময় সেরকম জিনিস ছিল।আমরা দুধ খাওয়া শুরু করেছি আজ থেকে মোটে হাজার দশেক বছর আগে, যখন আমরা পশুপালন করা শিখলাম। তার আগের আড়াই লাখ বছর আমরা বনের পশু আর গাছের ফল খেয়েই কাটিয়েছি।এই দুধ খাওয়া শুরু করার পর পৃথিবীর বেশ কিছু জায়গার মানুষের জেনেটিক্সে একটা পরিবর্তন আসল- বিশেষ করে ইউরোপ ও আফ্রিকায়- যার ফলে আমাদের শরীর জিনিসটা হজম করতে শিখে গেল।এটাই বিবর্তন। পরিবেশের সুযোগ নেওয়ার স্বার্থে প্রাণিদেহে পরিবর্তন আনা, তা যত ছোটই হোক।

উপকার করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিবর্তন ঝামেলাও লাগিয়ে দেয়।যেমন আফ্রিকায় ম্যালেরিয়ার হার অনেক বেশি।ম্যালেরিয়ার জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে আমাদের রক্তের লোহিত কণিকায়।এই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে সেখানকার অনেকের লোহিত কণিকার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেল, যাতে ম্যালেরিয়া এদের অতটা কাবু করতে না পারে। এদিকে বাঁধল নতুন ফ্যাকড়া- জেনেটিক্সে যে পরিবর্তনটার কারণে লোহিত কণিকার আকৃতি বদলায়, সেই একই কারণে মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়া বলে একটা ভয়াবহ অসুখ হয়। ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিবর্তন আফ্রিকায় এই রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে দিল। বিবর্তন অন্ধ- সে শুধু বোঝে কি করলে এখনকার পরিবেশে প্রাণীর উপকার হবে।সে উপকার করতে গিয়ে যে সে আরো বড় সমস্যা বাঁধিয়ে দিচ্ছে, সেটা সে সবসময় বোঝে না।

আর্জেন্টিনার মানুষদের বিবর্তন কীভাবে হল তা বুঝতে হলে আগে একটু জানতে হবে, আমাদের দেহে আর্সেনিক প্রবেশ করার পর কী ঘটে। মানবদেহ যখন দেখে তার রক্তে নতুন অজানা কিছু

ঢুকছে, সে কখনোই তাকে অগ্রাহ্য করে না।হোক সে রোগজীবাণু বা আর্সেনিক বা অন্যকিছু, তাকে পরাস্ত করার কোন না কোন একটা ধান্দা সে করেই।সেই ধান্দা যে সবসময় সফল হবে, তা নয়। কাজেই আমাদের দেহ যখন বুঝতে পারে রক্তে আর্সেনিক ঢুকেছে, তার প্রথম চিন্তা দাঁড়ায়- কীভাবে এই বিষটাকে নির্বিষ করে ফেলা যাবে।

তো এই বিষ ঝাড়ার জন্য সে যেটা করে- আর্সেনিক পরমাণুর গায়ে টুক করে কিছু কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের প্রলেপ দিয়ে দেয়।একবার প্রলেপটা লাগিয়ে দিতে পারলে আর ভয় নেই।প্রলেপঅলা আর্সেনিক কিছুক্ষণ দেহের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে বসে থাকে, তারপর সময়মত মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয় দেহের মধ্যে ঢোকার সময় থেকে এই প্রলেপটা লাগানোর আগ পর্যন্ত।যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রলেপ লাগানো হচ্ছে, ততক্ষণ সে বিষাক্ত।কাজেই কার দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া কীরকম হবে- সেটা নির্ভর করে এই প্রলেপটা কে কত তাড়াতাড়ি লাগাতে পারছে। গবেষকরা যেটা দেখলেন- আতাকামা মরুভূমির এই মানুষগুলোর দেহে আর্সেনিকের ওপর এই প্রলেপটা পড়ে অস্বাভাবিক দ্রুত।

আর্সেনিকে প্রলেপ লাগানোর জন্য আমাদের দেহের একটা এনজাইম দায়ী। এই এনজাইমটা সবার দেহেই থাকে- কিন্তু কারো দেহে এর কার্যকারিতা বেশি, কারো দেহে কম। এই বেশকমটা হয় আমাদের মধ্যকার জেনেটিক পার্থক্যের জন্য। আতাকামা মরুভূমির মানুষের জেনেটিক্সে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য তাদের দেহের এই প্রলেপ-লাগানো এনজাইমের কার্যকারিতা বেশি। ব্যাপারটা খুব সহজে বোঝার জন্য একটা লাইট ও তার সুইচের কথা চিন্তা করুন। সাধারণত আমাদের বসতবাড়িতে যে লাইট থাকে, সেগুলো সুইচ টিপলে জ্বলে, সুইচ টিপলে নেভে।এবার চিন্তা করুন সুইচটা আরেকটু জটিল- সুইচটাতে আপনি যত জোরে চাপ দেবেন, বাতির উজ্জ্বলতা তত বাড়বে। আমাদের দেহের ব্যাপারগুলো অনেকটা এরকম। আর্সেনিকে প্রলেপ লাগানোর এনজাইম সবার শরীরেই আছে, কিন্তু আতাকামা মরুভূমির মানুষগুলোর দেহে এই এনজাইমের সুইচে চাপটা বেশি পড়ছে।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই ব্যাপারগুলো আমরা মোটামুটি জানতাম, কিন্তু এই সুইচটা যে আসলে ঠিক কোথায়, অর্থাৎ আমাদের ডিএনএর ঠিক কোন জায়গাটাতে যে এর বসবাস- তা আমাদের জানা ছিল না। আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে সুইডেনের একটা গ্রুপ এই সমস্যার সমাধান করেছেন। একই সাথে তারা আরেকটা মজার ব্যাপার দেখিয়েছেন- এই জোরে-চাপ-খাওয়া-সুইচ যে শুধু আতাকামা মরুভূমির মানুষদের একচেটিয়া, তা কিন্তু নয়। সব জায়গাতেই এমন মানুষ পাওয়া যাবে যাদের দেহে এনজাইমটা বেশি কার্যকর। আমাদের দেশেও মানুষের ডিএনএ ঘাঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে কারো সুইচে চাপ বেশি, কারো সুইচে কম। পার্থক্যটা হল মানুষের সংখ্যায়।আতাকামা মরুভূমির অধিকাংশ মানুষই এই জোরালো সুইচ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য জায়গার মানুষের মধ্যে এরকম জোরালো সুইচ আছে বইকি, কিন্তু এরকম মানুষের সংখ্যা কম। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম- কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি আমাদের দেশেও আছে, আবার জাপানেও আছে। কিন্তু জাপানে ভূমিকম্প বেশি বলে তার সাথে খাপ খাইতে গিয়ে মানুষ কাঠের বাড়ি বেশি বানিয়েছে।একইভাবে আতাকামায় প্রয়োজন দেখে বিবর্তন অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষের দেহে জোরালো সুইচটা সংরক্ষণ করেছে।

৩।

অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন আমরা হরহামেশাই দেখি। এখন যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে শোরগোল হচ্ছে, সেটা বিবর্তন বই কিছু নয়- রোগজীবাণুগুলো নিজেদের মধ্যে বিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে পাল্লা দিতে শিখে গেছে।একইভাবে আমরা যে ধানের নতুন জাতের কথা শুনি, সেটা বিবর্তন ঘটিয়েই সম্ভব হয়, যদিও সেটার জন্য প্রকৃতির চেয়ে মানুষই বেশি দায়ী।একই কথা প্রযোজ্য পোষা প্রাণীর ব্রিডিং এর ক্ষেত্রেও।কুকুর বিড়াল ঘোড়া গরু ভেড়া ইত্যাদির মধ্যে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তন ঘটিয়ে এদেরকে তার কাজের উপযোগী করে নিয়েছে।আজ থেকে হাজার বছর আগে আরবের বেদুইন বিবর্তন শব্দটা হয়তো জানত না, কিন্তু তার প্রিয় ঘোড়ার বিবর্তন কীভাবে ঘটাতে হয় সেই ব্যবহারিক জ্ঞান সে ঠিকই রাখত।আমরা চাষবাস শুরু করার আগে ফুলকপি বাঁধাকপির চেহারা কীরকম ছিল সেটা গুগল করে দেখতে পারেন।

মানুষের মধ্যে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্বাভাবিক কারণেই এখন পর্যন্ত মোটামুটি হাতেগোনা- একে তো আমরা পৃথিবীতে এসেছি খুব বেশিদিন হয়নি, আর আমাদের তো কেউ পোষ মানায় না। দুধ খাওয়ার অভ্যাসের উদাহরণ তো আগেই দিলাম।তিব্বত আর আন্দিজের মানুষ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে বসবাস করে- তাদের মধ্যে অক্সিজেন স্বল্পতার সাথে খাপ খাওয়ার জন্য বিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রেইনফরেস্টের অধিবাসীদের উচ্চতা কম হলে তাদের বিভিন্ন সুবিধা হয়, বিশেষ করে দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। আফ্রিকার অনেক গোষ্ঠির জেনেটিক্স দেখলে বোঝা যায়, বিবর্তন ঠেলে এদেরকে কম উচ্চতার দিকে নিয়ে গেছে।

এসবের প্রেক্ষিতে আমার জানতে ইচ্ছে করে বিবর্তনের ভবিষ্যৎটা আসলে কী। ঢাকা শহরের অবস্থা আজ যেমন আছে আগামী হাজার বছরেও যদি সেরকমই থাকে, তাহলে কি আমাদের মধ্যে বাতাসে সীসার বিষক্রিয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিবর্তন হয়ে যাবে?

এর সম্ভাবনা বোধহয় কম, কারণ এত কম সময়ের মধ্যে বিবর্তনের প্রভাব মোটামুটি সীমিত। আর্সেনিকের উদাহরণটাই ধরুন।সেই জোরালো সুইচ থাকলেই যে আপনি ইচ্ছেমত আর্সেনিক খেতে পারবেন, তা কিন্তু নয়। শুধু সাধারণ মানুষের দেহে এর প্রভাব যত বেশি, আপনার দেহে তার থেকে খানিকটা কম হবে।

আরেকটা মজার উদাহরণ আমাদের দেশেই আছে। বাংলাদেশের একটা চিরাচরিত সমস্যার নাম কলেরা। সেই প্রাচীন মুনিঋষিদের যুগ থেকেই সে আমাদের সাথে আছে। আমাদের মধ্যে কী কলেরার সাথে খাপ খাওয়ার জন্য কোন বিবর্তন হয়েছে? হয়েছে। হার্ভার্ড আর আইসিডিডিআর,বির মিলিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় আসলেই কলেরার সাথে মোকাবেলার জন্য কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তাই বলে কলেরার ভয়াবহতা তো এই কারণে অতটা কমে নি। যতটা কমেছে সেটা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণে- পানির গুণাগুণ বা পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য।

এদিক থেকে দেখলে আমরা মানুষের একটা স্বতন্ত্র সংজ্ঞায়ন পাই- প্রজাতি হিসেবে আমরাই প্রকৃতির সাথে মোকাবেলার জন্য বিবর্তনের ওপর সবচেয়ে কম নির্ভরশীল। আমাদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আমরা প্রকৃতির হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেই না, নিজেরাই আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা পারার করি।

বিশ্ব উষ্ণায়ন আর সাগরময় প্লাস্টিক অবশ্য বলছে সেটা সবসময় খুব একটা কাজের কথা নয়।

পরিশিষ্ট

লেখায় সরলতার স্বার্থে আমি কিছু স্বাধীনতা ব্যবহার করেছি, যেগুলো একজন বিজ্ঞানী দেখলে বিরক্ত হতে

পারেন।সেগুলো এই বেলা পরিষ্কার করে দেই।

প্রথমত, দেহের মধ্যে আর্সেনিকের বায়োকেমিস্ট্রি এরকম- আর্সেনিক মিথাইল ট্র্যান্সফারেজ এনজাইম একে প্রথমে মনোমিথাইল আর্সোনিক অ্যাসিড বানায়, তারপর ডাইমিথাইল আর্সোনিক অ্যাসিড। মনোমিথাইল ফর্মটা ক্ষতিকর। আতাকামার মানুষের মূত্রে

ডাইমিথাইলের পরিমাণ বেশি, কাজেই তাদের মিথাইল ট্র্যান্সফারেজ আরো দ্রুত আর্সেনিককে ডাইমিথাইল গ্রুপ পরিয়ে দিতে পারছে।প্রলেপ বলতে এই ডাইমিথাইল মডিফিকেশানকেই আমি বোঝাতে চেয়েছি। বিবর্তনের জন্য পরিবর্তনটা মিথাইল ট্র্যান্সফারেজে সরাসরি আসে না, আসে এর রেগুলেটরি এলেমেন্টে।এটাই হচ্ছে সুইচ।

দ্বিতীয়ত, এ লেখায় আমি যেভাবে বিবর্তনের সংজ্ঞায়ন করেছি, সেটা দেখে অনেকেই ভ্রূ কুঁচকোবেন। পপুলেশান জেনেটিক্সের ভাষায় বিবর্তন হচ্ছে change in allele frequencies। সেভাবে দেখলে একটা পপুলেশানের জিন পুলের যত ধরণের পরিবর্তন সবই বিবর্তন বলে গণ্য হবে, মানুষের জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত। আমি আসলে এখানে যেসব ঘটনাকে বিবর্তন বলছি, সেগুলো আসলে বিবর্তন নয়, বরং প্রাকৃতিক নির্বাচন।শব্দটা একটু গালভরা বলে বিবর্তন ব্যবহার করেছি, যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তন ঘটারই একটা প্রক্রিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা জন্য ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন https://bit.ly/bcb_science

ফেসবুকের ভূত

মাহাতাব মাহদী

আচ্ছা, মাঝরাতে যদি কোন মৃত ব্যাক্তির ফেসবুক আইডি থেকে আপনাকে মেসেজ দেয়, আপনার কেমন লাগবে?

দিনটা ৩০ শে জানুয়ারি ২০১৮ -তে। সেদিন রাত্রে শান্ত ভাই তারই একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করলেন।

শান্ত ভাই ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার।রুয়েট থেকে পড়েছেন। জব করেন একটা পাওয়ার হাউজিং কোম্পানিতে।সেখানেই এই ঘটনার উৎপত্তি।

-নিহাল, তোদের একটা কাহিনী শেয়ার করব, আমার জীবনের অন্যতম প্যাথেটিক আর ভয়াবহ ঘটনা।

-জ্বি ভাই, বলে ফেলেন। আমরাও তো কত কাহিনী বললাম।মেয়েজাতীয় কথা বাদ দিয়ে যা ইচ্ছা বলেন।

-প্রিমাকে মনে আছে তোদের?

এই মুহূর্তে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম।প্রিমা হল শান্ত ভাইয়ের বান্ধবী। শুধু বান্ধবী বললেই ভুল হয়, হবু স্ত্রী বলা চলে। আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, ফ্যামিলি থেকেও সব মেনে নিয়েছিল।থাকতেন সিডনিতে।পড়ালেখা শেষ হলেই দেশে এসে বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু হটাৎ করেই একদিন মারা যান তিনি।ভাই আমাদের সঠিক কারণটা বলেন নি তখনো। আমাদের ফ্রেশ মুড ছিল তখন। তাই আমার আরেক ভাই বলল

-ভাই এসব বিষয় নিয়ে কথা না বললে হয় না?

-আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে, তোরা জানিস প্রিমার কি হয়েছিল?

-না ভাই, আপনি জানেন।ভাবিকে নিয়ে আপনি জানতেন। আমাদের কেন, চাচাকেও জানান নি এ বিষয়ে কিছু।

-কারণ ছিল। আচ্ছা শোন, এই ছবিটা দেখ

এরপর আমাদের একটা স্ক্রিনশট টা দেখালো। আমি প্রথমে কিছুই বুঝি নাই। যখন বুঝলাম, তখন অবাক হয়ে গেলাম। রিপ্লাই দেয়ার দিন তারিখ গুলো আমাকে অবাক করল।

প্রিমা আপু মারা গিয়েছিল ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে। এরপর শান্ত ভাই প্রায় পাগল হয়ে যায়। ফেসবুক ইন্টারনেট সবকিছু থেকে লিভ নিয়ে সমস্ত যোগাযোগ ডিস্কানেক্ট করে।

২০১৫ সালের দিকে তার ফেসবুক একাউন্ট আবার একটিভ করেন।

-রাত ৩ টায় একটা মেসেজ আসে প্রিমার আইডি থেকে।আমি প্রথমে মনে করেছিলাম কেউ হয়তো আইডিতে একসেস পেয়েছে, তাই জিজ্ঞাস করলাম কে আপনি, রিপ্লাই দিল না।আমার কাছে প্রিমার ইমেইল ছিল। পাসওয়ার্ড ও জানতাম।আমি আইডিতে ঢুকে আমার মোবাইল দিয়ে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে নিলাম।

-তারপর ভাই?

-পরেরদিন আবার রাত ৩ টার দিকে একই আইডি থেকে মেসেজ আসল!

-তো ভাই? এটাও তো হতে পারে হ্যাক হয়েছে।

-সেটা হবে কেন? আমি তো আগেরদিনই পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেছি। আরে ঘটনা শোন, পরেরদিন ওর ছোট বোন আমাকে ফোন করল।ফোন করে বলে ওর আইডিতেও নাকি আমার নাম দিয়ে একই মেসেজ পাঠিয়েছে।

-বলেন কি ভাই!?

-আমি আইডি চেক করলাম। আবার আইডিতে ঢুকলাম, শুধু দুইটা মেসেজ পাঠানো ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি আইডি ডিএক্টিভেট করে দিলাম।

-তাইলে কি? এইটা ঘটনা? সময় নষ্ট করলেন খালি!

-এবার আয় আমার আসল ঘটনায়।২৯ তারিখ আমার বিকাল শিফট ছিল, রাত ৯ টায় বাড়িতে ঢুকলাম। (ভাই পুরো একটা বাসা নিয়ে থাকেন)।প্রতিদিনের মত খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম,এমন সময় কারেন্ট চলে গেল!

-হ্যা কারেন্ট তো যাবেই, আমাদের ভুলভাল হরর গল্প শুনাচ্ছেন, কারেন্ট না গেলে ভয় দেখাবেন কিভাবে?

-তুই কি শুনবি?

-আপনি বলেন।

-আমি শুইতে গেলাম, আশে পাশের বাড়িতে কারেন্ট নাই,মাঝখানে মাঝখানে কিছু বাড়িতে লাইট জ্বলছে। ক্লান্ত ছিলাম, দিলাম এক ঘুম। ঘুম ভাংলো রাত ১ টার পরে।তখনো কারেন্ট

ছিল না। আমি ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কেমন একটা অসস্তি বোধ করছিলাম।ঘুম আসছিল না।একটা কেমন যেন লাগছিল। মনে হচ্ছে হরর ফ্লিমের কাহিনীতে ঢুকে গেছি।

-আমি ঘামছি, প্রচন্ড খারাপ লাগছিল। পাশের রুম থেকে কেউ হাটছিল এরকম মনে হচ্ছিল। উঠতে যাব, এমন সময় দেখি ঘরের কোনায় প্রিমা দাড়ানো! একটা ছাই কালারের শাড়ি পড়ে! আমি ততটুকুই জানি। এরপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।মনে আছে? বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলাম তো!

এই মোমেন্টে আমার ভয়াবহ ভয় লাগা শুরু করল। আমাদের মধ্যে সবচাইতে সাহসী শান্ত ভাই, তার কথাগুলো প্রায় সত্য এবং আসলেই খবর এসেছিল তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

-ভাই ভয় লাগছে, কিন্তু কন্টিনিউ করেন।

-আরে বেটা ভয়ের কি আছে? সব ব্যাখ্যা আছে।আস্তে আস্তে দিচ্ছি।

-জি ভাই বলেন।

-আমার জ্ঞান ফিরল যখন,তখন দেখি আমি আমার রুমে আছি, কাথা দিয়ে ঢাকা, দিন হয়ে গেছে।পাশ ফিরেই দেখি মামুন! (মামুন ভাইয়ের কলিগ, ভাইয়ের বাসা ছিল ৩ তালায়, মামুন ভাইয়ের ৪ তালায়)। আমি মামুনকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। মামুন আমাকে শান্ত হতে বলল।সে আমাকে জিজ্ঞাস করল, "কি হয়েছিল?" আমি সমস্ত ঘটনা বললাম।

রাতারাতি প্রচার হয়ে গেল আমার পেছনে প্রিমার আত্না লেগেছে! তোদের বলি নি যে কেন প্রিমা মারা গিয়েছিল তাই না?

-কেন ভাই? কি হয়েছিল?

-প্রিমা পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। বোটিং করতে গিয়ে ও সহ ওদের গ্রুপের ২ জন।

আমরা পুরা থ! ভাইয়ের ভয় পাওয়ার কারণ টা বুঝতে পারলাম।আমাদের

এখানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পানিতে ডুবে মারা গেলে তার আত্না ফিরে আসে।

- আরে তোরা এত ভয় পেলি কেন? সবকিছুর এক্সপ্লেইনেশন আছে রে! বলছি থাম।

- জি ভাই বলেন।

- তো পরের দিন আমি বাড়ি আসলাম, দু'দিন পরে বাড়ি ফিরলেই মামুন আমাকে ওর বাড়িতে আসতে বলল। আমি গেলাম, ও আমাকে প্রশ্ন করল, "তুই কি প্রিমাকে খুন করেছিস? তোর কারণে প্রিমা মারা গিয়েছে?"

আমি মামুনকে থাপ্পড় দিলাম।ও আমার উপর উল্টে রেগে জানাল,ও নাকি প্রিমাকে গতকাল রাতে দেখেছে!!

আমি থ! আমি ওকে বললাম দোস্ত ঘটনা বল, হয়েছে টা কি?

ও বললঃ " রাতে কারেন্ট গিয়েছে, মোমবাতি জ্বালায়ে বই পড়ছি, হটাৎ অসস্তি লাগল কি রকম যেন, মনে হল ঘরে কেউ হাটছে। আমি পেছনে তাকালাম, আর মনে হলে ঘরের কোনে একটা মেয়ে দাড়ায় আছে! "

- কি রে কিছু বুঝলি তোরা?

- ভাই গল্প বলে যান, ডিস্টার্ব করবেন না।

- আচ্ছা শোন। আমি আর মামুন একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।সেদিন কিছু হল না।পরের দিন অফিসের থেকে আসার পর আমি বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবলাম। একটু ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করলাম, অনেক কিছু জানতে পেলাম।

বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ:

- তোরা জানিস আমরা কত হার্জের শব্দ শুনতে পাই?
- ভাই, আমরা পারি, এইচএসসি পাস করা পাব্লিক।২০-২৫ হাজার হার্জ।
- গুড। আমি নেট ঘেটে এটাই মনে করেছিলাম।মোবাইলে হার্জ পরিমাপের কিছু এপ আছে, ওটা ডাউনলোড

করলাম, দেখি ঘরে সাড়ে ছয়শ হার্জ দেখায়।
- তো?
- আচ্ছা তোদের কাছে একটা প্রশ্ন, আমার আর মামুনের গল্পে কি মিল ছিল?
- আপনারা দুইজনই ছেলে ছিলেন আর আপনাদের ২ জনই ছ্যাকা খেয়েছেন!
- আর?
- আপনারা একই বিল্ডিংয়ে থাকেন, একসাথে কাজ করেন।
- আরে তুই ঘটনার মিল বল। আচ্ছা, আমার অসস্তি লাগছিল কেন বল?
- গরমে, কারেন্ট ছিল না, ঘামছিলেন তাই।
- আর মামুনের গল্পে? মামুন কেমন ফিল করছিল?
- সেম কারেন্ট ছিল না, গরম ছিল।
- এক্সএক্টলি! কারেন্ট ছিল না। আমার মাথায় প্রথমে এ জিনিসটা খেলে।আমি জানতাম আমার এলাকায় বিকাল ৫ টায় কারেন্ট যাবে। আমি তখন নিচে নেমে এলাম।একটা মাল্টিমিটার নিয়ে (শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি মাপার যন্ত্র) আসলাম। মামুনকে ডাকলাম।কারেন্ট গেল ৫.১৩ তে, আমি মেশিন অন করলাম। আমাদের বাসার আশেপাশে তখন পুরো নিস্তব্ধ।হটাৎ মিটারে রিডিং ১৮ হার্জ দেখালো। আমি আর মামুন তখন অসস্তি ফিল করতে লাগলাম।
-কেন ভাই? ১৮ হার্জে কি আছে?
-শব্দেতর তরঙ্গ গুলো আমাদের মধ্যে ভৌতিক অনুভূতি জাগায়।আমাদের

অসস্তি ফিল হয়। আমরা পরে বের করেছিলাম শব্দের উৎপত্তিস্থল।

আমাদের থেকে ৪ বাড়ি পাশের বাড়ির জেনারেটর এই শব্দের উৎস ছিল বলে ধারণা। ওদের জেনারেটর টা নতুন বসিয়েছে। আমরা ওটার শব্দ শুনেই এরকম অসস্তিতে পড়েছিলাম।
-কিন্তু ভাই আপনি বলে প্রিমাকে দেখেছেন?
-না রে! ওটাও একটা ইলিউশন। আমাদের চোখের কর্নিয়া শব্দেতর তরঙ্গে কেপে যায়।ফলে চোখের কোনে ঘোলাটে হালকা কালো হয়ে যায়।মনে আছে? আমি আর মামুন দুজনেই প্রিমাকে হালকা কালো রঙ্গের জামা পড়ে দেখেছিলাম?
-ও ভাই রে ভাই! এই অবস্থা? তাহলে ফেসবুকে মৃত মানুষের জেগে ওঠার কারণ কি?
-এখানে অনেকগুলা পসিবিলিটিস্ আছে। হয়তো ফেসবুকের কোনো বাগের কারণে এলগরিদমে সমস্যা হওয়ায় কেউ এক্সেস পেয়ে গেছে। অথবা ওর ফেসবুক অন্য কোনো ডিভাইসে লগইন ছিলো কিন্তু আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার পর সবগুলা থেকে লগআউট করিনি, সেখান থেকেই হয়তো কেউ সেখান থেকে আমার সাথে মজা করেছে।
-সেদিনের পরে নক পেয়েছিলেন?
-না। আর না ওটাই শেষ। কারণ সব ডিভাইস থেকে ওর আইডি লগআউট করে দিয়েছিলাম।
সেদিন রাত্রে শান্ত ভাই খুব কেদেছিলেন। তবে এটাই গল্প ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ।সবকিছুরই ব্যাখ্যা আছে।
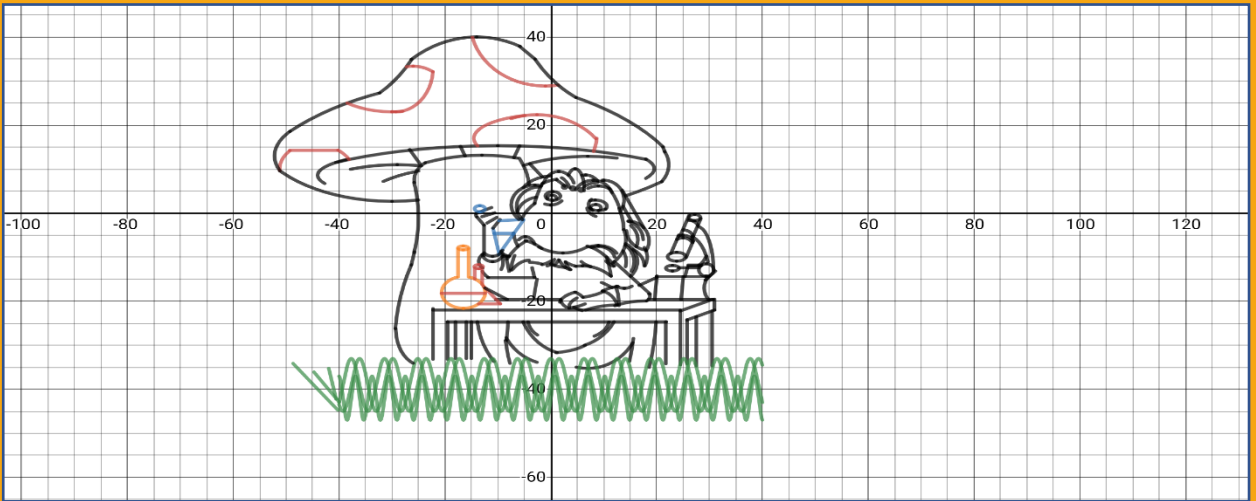
Desmos Art By Ratul Hasan

নাঈম হোসেন ফারুকী
Big-জ্ঞানে অগ-Gun
Big-জ্ঞানে, অগ-Gun

ভৌতিক কাণ্ড

মো: শিহাব আরমান

ঘটনাটি আরো ২-৩ বছরের পুরনো।

সদ্য এস.এস.সি পরীক্ষা শেষ হলো।টানা ৩ মাস ছুটির সময়। ছুটিতে কোথাও যাওয়া হয় না।সবসময় ঘরে বসেই আমার সময় কাটে।সারাদিন একা একা ঘরের দরজা আটকে কয়েলের কালো ধোঁয়াঁতে অন্ধকারে সময় কাটে।

ভূত-প্রেত,পেত্নী এসব যেনো আমার কাছে বানানো রূপকথার গল্পের মতো।গল্পই তো ! ভূতের পা থাকে না, প্রেত মানে মৃত-মানুষের আত্মা,পেত্নীরা নাকি রাতে গাছে চড়ে তাদের লম্বা লম্বা পা দিয়ে মানুষের ঘাড়ে চড়ে বসে।কি আজব তাই না?

যেহেতু আমি আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে এদের কোনোটাকেই দেখি নি তাই আমার কাছে এগুলো রূপকথার বানানো গল্পই বলা চলে।

আমি আবার Horror Movie কিংবা ভূতের নাটকের বেলায় বেশি উৎসুক।বিশেষ করে (Sony আট) এ আগে যখন আহট, যখন ভূত আসে ঐসকল অনুষ্ঠানগুলোর বেলায় কোনো কথা হবে না।

তো ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন রাতের কাহিনী।

রাতে সবাই ঘুমে ব্যাস্ত।আমি একা আমার রুমে থাকি।আম্মু-আব্বুর রুম থেকে আমার রুমের দূরত্ব বেশি না, একটা করিডোর ধরে এরপর ডাইনিং রুমটা পেরোলেই।

রাতের ৪টা কি ৪:৩০ মিনিট বাজবে তখন।ঘুম ভেঙ্গে যায় কোনো একটা দুঃস্বপ্নে।যতটুকু মনে আসে স্বপ্নে কারো লাশ সাদা কাপড় পড়েই আমার দিকে ছুটে আসে।তো সেটা দেখেই হঠাৎ একটু ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়।মোবাইলটাও আজকে পাশে নাই।চার্জে ফেলে রাখছি রুমের অপর প্রান্তে থাকা টেবিলে।ঘুমানোর চেষ্টা করতে চাইছি এদিক ওদিক ফিরে।আমার রুম মেইন দরজার সামনের দিকেই তাই বাইরে সিড়িঁতে জ্বালানো লাইটের আলোর কিছুটা অস্পষ্ট ছায়া রুমে ঢুকতে পারে।

এদিক-ওদিক ফিরে অনেক ঘুমানোর চেষ্টা করছি বাট ঘুম আসছে না।কিছুক্ষণ বাদে বাইরে কুকুর কেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুরু করে।ডাকছে না কাদঁছে বুঝা দায়।সাথে সাথে আশেপাশে কোনো এক বাচ্চার কান্নার আওয়াজ।কত হবে বয়স? আনুমানিক ৭-৮ বছরের।আমার মাথায় এবার একটু অন্যরকম চিন্তা শুরু হতে লাগলো।এতো রাতে কোনো বাচ্চা এভাবে কান্না করার তো কথা না।কি এমন প্রোব্লেম যে তার আব্বু-আম্মু তাকে শান্ত করাতে পারছে না।

দরজার দিকে চোখ পড়লো।মেইন দরজার নিচ দিয়ে সিড়িঁতে লাগানো যেই লাইটের আলো আসছে সেখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা ছায়া বারবার এদিক,ওদিক সরে যাচ্ছে।একবার-দুবার না, অনেক বার।

কিন্তু এতো রাতে কে থাকবে দরজার বাইরে?

তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম চোর আসে নি তো।.

চিন্তা করলাম যে উঠে একবার দেখি দরজা খুলে, পরবর্তীতে আবার ভয় লাগতে শুরু করল।

সচরাচর কখনো আমার এসবে ভয় করে না, এর আগেও গ্রামে গেলে অন্ধকার ঝোপ-ঝাড় দিয়ে একা আসা-যাওয়ার অভ্যাস আমার আছে।

পরিত্যাক্ত বাড়িগুলোতেও কখনো এতো গা ছমছম করে না যতটা আজ রাতে করছে।.

হঠাৎ রুমের এক পাশে রাখা পুরনো শো-কেস টার দিকে চোখ পড়লো।প্রায় ৫-৬ ফুট হবে উচ্চতা।কালো কিছু একটা সোজা হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে।সুইচবোর্ডের লাল বাতিটা যেন আরো

ছায়াটার প্রমাণ দিতে থাকে। আমি বুঝাতে পারবো না কেমন অনুভূতি ছিল তখন।

প্রথমে তাকিয়েই থাকি।জিনিসটা কি সেটা বুঝার চেষ্টা করি।কিন্তু আমার রুমে ৫-৬ ফুটের কোনো লম্বা বস্তু থাকবে সেটা তো হবার নয়।আর থাকলেও আমি জানতাম।

কিছুক্ষণ পর ছায়াটা যেনো খুবই ধীরে ধীরে একপাশে সরে আসতে চেষ্টা করে। বলা চলে আমার দিকেই। এবার প্রচন্ড ভয় করতে লাগে।আমার গলার পানি শুকিয়ে তৃষ্ণাবোধ পাচ্ছে।মাথার উপরে ফুল-পাওয়ারে ঘুরতে থাকা ফ্যান এর মাঝেও আমার মুখবেয়ে ঘাম ঝড়তে থাকে। তার উপর মনে পড়ে যে পাশের বাসার এক আঙ্কেল গত ২ দিন আগে মারা গেছেন।

ছায়াটা ততোক্ষণে খাটের এক প্রান্তে চলে এসেছে।এবার আমার দিকে সোজা চলে আসতে থাকে।

ভয়ে মুখ দিয়ে দোয়া-সূরা কিছুই বের হচ্ছে না।একপ্রকারে পুরো ফ্রিজ হয়ে গেছি।শেষ পর্যন্ত শকটা না নিতে পেরে রাতে সেন্সলেস হয়ে যাই। সকাল ৬:২০ বা এর আশেপাশে ঘুম ভাঙ্গে বা সেন্স ফিরে।নিজেকে ফ্লোরে আবিষ্কার করি।

উফ ! মাথাটা প্রচন্ড ব্যাথা করছে। মাথায় শক্ত ফ্লোরের বাড়ি খেয়েছি মনে হচ্ছে।

নিজেকে কিছুটা সামলে বিছানায় উঠি।চুপঁচাপ শান্ত মাথায় রাতের ঘটনাগুলোকে মনে করতে থাকি। নাহ, সেই ছায়াটা আসলেই...কোনো মেয়ের মতো দেখতে। চিকন শরীরে যেনো মাথাভর্তি এলোমেলো চুলগুলো তার মূখটাকে ঢেকে রেখেছিল অন্ধকারে। আম্মু-আব্বুকে আর জানাই না ঘটনাটা। যদিও আম্মু-আব্বুর রুমে আরেক নতুন ঘটনার সূচনা হয়।

সেই গল্পে আর রহস্যে না যাই।

এবার নাহয় পুরো ভূতুড়ে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ধার করা যাক?

তার আগেই বলে রাখি আমি প্রচন্ড ঘুমপ্রেমী। সেই ছুটির দিনগুলোতে আমি ২৪ ঘন্টার প্রায় ১৪-১৬ ঘন্টাই ঘুমিয়ে কাটাতাম। আর কল্পনা করতে ভালোবাসতাম। যেমন ধরো কল্পনায় নিজেকে আর আশেপাশের পরিবেশকে নিয়ে নতুন কাহিনী রচনা করতাম। এমনকি কিছু কিছু কল্পনার কাহিনীতে নিজেকে মেরে ফেলতাম ।একবারে জঘন্যতম চিন্তাভাবনা।

তো আমি আগেই বলেছি যে আমি কখনো কোনো ছুটি কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে ঘরের বাইরে যাই না। নিজের রুমে সারাদিন কয়েল জ্বালিয়ে ধোঁয়াঁটে করে রাখতাম শুধু শুধু। আর আমার রুমটাও এমন যে, প্রায় Lightproof আর Soundproof বলা চলে। তো বাইরের পরিবেশের সাথে আমার পরিবেশের অনেকটা পার্থক্য ছিল।

তো সেদিন রাতের ছায়াটা কি হতে পারে সে নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করার পর কিছুটা উপলব্ধি করলাম আসল ব্যাপারটা কি ছিল সে নিয়ে।

(১) সবার প্রথমে আসি কুকুর আর সেই বাচ্চার কান্নার আওয়াজ:-

সেদিন রাতে হয়তো কুকুরের বাচ্চা হয়েছিল, কারণ এর কিছুদিন পরেই গলিতে কিছু কুকুরের বাচ্চা পাওয়া যায় যেগুলা এখনো আছে।তো ধরে নেয়া যায় এটাই তার কারণ।

আর আমাদের বাসায় সেদিন নতুন ভাড়াটিয়া আসে, যাদের বাচ্চা সেদিন রাতে তার হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলে যার কারণে সে ভয়ঙ্কর ভাবে কান্না করে সেই রাতে।

(২) এরপর আসি দরজার বাইরে সেই চারপায়া ছায়াটার ব্যাপারে:-

আমাদের বাসার নিচে গোডাউনে অজান্তেই একটা বড়-সড় স্বাস্থ্যবান বিড়াল থাকতো।গোডাউন প্রায় ২ বছর ধরে বন্ধ পড়ে থাকায় কেউ টের পায় নি।একদিন বাসায় ঢুকার টাইমে ঐটাকে চোখে পড়ে।তারপর থেকে দেখি সকালে এটা নিচে থাকলেও রাত

১০ টার পর এটা বিল্ডিং এর উপরে চলে আসে।আর ঘরের বাইরে রাখা নরম নরম জুতার উপরে ঘুমায়।আর সেদিন রাতে এই বিড়ালটাই হয়তোবা আমার দরজার সামনে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল যার কারণে মনে হচ্ছিল যে বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আর বিড়ালের হাটাঁতে কিন্তু কোনো আওয়াজ থাকে না।তাই একে ভূতের ছায়া ভেবে ভুল করাটা বোকামি।

(৩) এবার আসি সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা সেই ভূতুড়ে মেয়েটার ছায়া নিয়ে :-

আমি আগেই বলেছি আমার Horro Movie ভালো লাগে।তো যেদিন ঘটনাটা ঘটে, ঠিক তার আগের দিন রাত জেগে প্রায় ২-৩টার দিকে Vikram Bhatt ডিরেক্টরের Zareen Khan আর Karan Kundrra এর 1921 মুভিটা দেখেছিলাম।

তো সেই মুভির হরর সিন আর সাউন্ড ট্র্যাক গুলো ব্রেইনে গেথেঁ যায়।

আর সেই মুভিতে থাকা Vashudha এর স্পিরিটের মতই দেখতে একটা ছায়া আমার ব্রেইন মেমোরিতে আটকে ফেলে যেটা আমি পরেরদিন রাতের সেই ভূতের ছায়া হিসেবে দেখতে পাই। সেটা মূলত হ্যালুসিনেশন ছিল।ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশন।মানে প্রকৃত অর্থে আমার সামনে কেউই নেই কিন্তু আমার ব্রেইন সেটাকে ইলিউশান হিসেবে আমাকে দেখাচ্ছে যে সেই ছায়াটা আমার সামনে।

এবার আসি আমার ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যায়।

হ্যালুসিনেশন কোনো সাধারণ অর্থে স্বাভাবিক কোনো মানুষের হয় না।যাদের মেনটালি ডিজঅর্ডার কিংবা স্কিজোফ্রেনিয়া আছে। তাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

কিংবা কেউ যদি নিয়মিত না ঘুমায় কিংবা এলকোহল/হ্যালুসিনোজেন ড্রাগস নেয় তাদের ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হয়ে থাকে।

আর আমি আগেই বলেছি যে আমি বাইরের পরিবেশ থেকে তখন অনেকটাই আলাদা থাকতাম।দিনের ২৪ ঘন্টায় ১৪-১৬ ঘন্টাই বিছানায় অন্ধকারে ঘুমিয়ে দিনের বাকি ৮-১০ ঘন্টা শুধু নাস্তা-খাবার আর সময়ে কিছুটা টিভি/বিনোদনে ব্যয় করতাম।

আর কল্পনার মাঝেই বাকি সময়টা পড়ে থাকতাম।মূলত ১৪-১৬ ঘন্টা বিছানায় পড়ে থাকার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কল্পনার জগৎ তৈরি।

হ্যাঁ, কল্পনার জগৎ তৈরি করে ফেলেছিলাম।একটা, দুইটা না। প্রায় ছয়-সাতটা।একেক সময় একেক জগৎ এ ফিরে যেতাম।

স্কিজোফ্রেনিয়া বলা যায় কিনা সঠিক জানি না।কারণ আমি শক থেকে জগৎ গুলো তৈরি করলেও সেগুলো আমার ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রণ করতাম এবং কল্পনার জগৎ এর গল্পগুলোকে লিখে রাখতাম।

যেহেতু আমার কল্পনাশক্তি কিছুটা ব্যাতিক্রম, আর বাইরের পরিবেশ থেকে সবসময় আলাদা থাকি।

সেক্ষেত্রে Social Isolation এর কারণেও আমার হ্যালুসিনেশন হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।কারণ আমার অতিরিক্ত ঘুমানোর ফলে হয়তো আমার ব্রেইন সেই আগের রাতের মুভিতে দেখা সেই স্পিরিট টাকেই কল্পনার জগৎ এ তৈরি করে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল।

আর এটাই ছিল আমার ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশনের মেইন পার্ট যেটার কারণে এতো কাহিনী।

তো শেষ পর্যন্ত যা বুঝতে পারলাম যে কল্পনার জগৎ গুলো একেকটা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে।আর একটার সাথে অপরটার সংমিশ্রণ নতুন জগৎ এর সৃষ্টি করতে পারে।তাই সেখানেই বন্ধ হলো আমার ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড।

আর বন্ধ হলো ডায়েরীর সেই ভূতের ছায়ার মূল রহস্যের শেষ পাতা।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আরাফাত ইমরান

বিজ্ঞানচর্চায় দেশ যাবে এগিয়ে
আমরাও কম নই দেব সেটা দেখিয়ে।
আমাদের মাঝে ছিল বিপ্লবী চেতনা
বিশ্বের দরবারে কেউ টের পেত না।
চেতনাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতে
লড়ে যাব আজীবন যদি হয় লড়তে।
আজ শুধু আমরাই আছি খুব পিছিয়ে
নিজেদের অন্যের পদতলে বিছিয়ে।
আর পিছে থাকব না, এইবার জাগব
অলসতা ত্যাগ করে কাজে আজ লাগব।
আমাদের হাত ধরে বিজ্ঞান আসবে
উন্নয়নের স্রোতে এই দেশ ভাসবে।
ঘরে ঘরে বিজ্ঞান নবসুর তুলবে
নবযুগ-প্রত্যাশা নিয়ে প্রাণ দুলবে।
বুকে বুকে বিজ্ঞান ফুল হয়ে ফুটবে
মুখে মুখে বিজ্ঞান গান হয়ে উঠবে।
বিশ কোটি অন্তরে বিজ্ঞান জ্বলবে
আমাদের পিছে এই পৃথিবীটা চলবে।
বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে এই বিশ্ব
দেখে নেবে আমরাও নই চির নিঃস্ব।
আমরাও পারি সব, বুকে আছে প্রেরণা
আগামীর প্রত্যাশা, আজ তুমি হেরো না।

পুঁথিগত বিদ্যার দিন শেষ আজকে
কথা নয়, আজ দাম দেব বেশি কাজকে।
মহাকাশ জয় করে ইতিহাস গড়ব
বিজ্ঞান বুকে নিয়ে বাঁচব ও মরব।
ইতিহাসে এঁকে দেব আমাদের চিহ্ন
গড়ে নেব আমরাও এক পথ ভিন্ন।
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান–সকলের মুখেতে
প্রদীপ্ত প্রত্যাশা সকলের বুকেতে।
জান তুমি, এ প্রদীপ হৃদয়ে কে জ্বেলেছে?
কার ছোঁয়া পেয়ে আজ মন ডানা মেলেছে?
কার ছায়া আমাদের স্নেহে ঢেকে নিয়েছে?
কার মায়া আমাদের পথ এঁকে দিয়েছে?
সে মোদের নাইস্বাই, আর তাঁর বিসিবি
দু'হাতের মুঠোভরে দিয়েছে যে পৃথিবী।
অগণিত ব্যাঙ মোরা বিসিবির ছায়াতে
একসাথে মিশে আছি প্রেমময় মায়াতে।
নেই কোনো ভেদাভেদ আমাদের মাঝেতে
সকলেই মেতে আছি অভিন্ন কাজেতে।
আমাদের সকলের একটাই লক্ষ্য
বিজ্ঞানে উজ্জ্বল হবে এই বক্ষ।
বিজ্ঞান বাঁধা নেই আর বই খাতাতে
বিজ্ঞান শোভা পায় এ ব্যাঙের ছাতাতে!

অলৌকিক তাবিজ

জাভেদ নূর

১

হুকা মিয়া টাইম মেশিন আবিষ্কার করতে গিয়ে বিফল হয়ে এখন সাংবাদিকদের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত।গ্রামের বাড়িতে চলে এসেও এসব থেকে রেহাই পাননি।

কিন্তু কিছুদিন ধরে তার মাথায় অন্য চিন্তা।এই গ্রামে এক অদ্ভুত লোক থাকে।নাম তাবিজ বাবা।সেই ব্যাপারে আজকেই প্রথম জানলেন।

সবাইকে তাবিজ দেয় আর টাকা নেয়। এই তাবিজ নাকি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন।আশেপাশে অশুভ শক্তি থাকলেই এই তাবিজ জ্বলে ওঠে,সাথে সাথেই নাকি অশুভ শক্তি পালায় যায়।

হুকা মিয়া একজন বিজ্ঞানী।এইসব সে বিশ্বাস করে না।তার কাছে এগুলো সব চিটিং।

কিন্তু ভাবনা একটাই তাবিজ হুট করে জ্বলে উঠে কিভাবে।ব্যাটারি আছে? কিন্তু ব্যাটারি তো একসময় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ব্যাটারি শেষ হলে তাবিজের বুজরুকি শেষ।কিন্তু তা হয় না কেন? কি এমন ব্যাটারি আছে?

তাছাড়াও ঝড়-বৃষ্টির সময় এই তাবিজ বারবার জ্বলে।তাবিজ কিভাবে বোঝে আজকে ঝড়-বৃষ্টি? কিভাবে বুঝলো মানুষ ঝড়-বৃষ্টিকে বিপদ মনে করে?

সন্ধ্যার সময় ভূতের উপদ্রব নাকি বেশি।সেজন্য তাবিজ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আলো দেয়।তাবিজ কিভাবে বোঝে এখন সন্ধ্যা? এপ্রিল মাসে সন্ধ্যা এক সময় আবার ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যা অন্য সময় হয়।তাবিজ ঠিক সন্ধ্যা বোঝে কিভাবে?

তাহলে কি তাবিজ বাবার সত্যি সত্যি অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে? কিন্তু বিজ্ঞান এসব অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করে না।

২

হুকা মিয়ার চিন্তা আরও বেড়ে গেছে।কিছুদিন পর কুকার গণিত অলিম্পিয়াড।সেই জন্য হুকার ছোট ভাই কুকা তাবিজ বাবার কাছ থেকে তাবিজ নিয়ে আসছে।

এই তাবিজ ব্যাবহার করলে নাকি কুকাকে আর কেউ হারাতে পারবেনা। কুকাকে যেসব অশুভ শক্তি হারানোর চেষ্টা করবে তাদের এই তাবিজ ভাগাই দেবে।তাবিজের বদলে ১৫০০০ টাকা দিতে হয়েছে।

অনেক হয়ে গেছে আর না,এইবার হুকা মিয়াকে কিছু করতেই হবে।নাহলে এই তাবিজ বাবা গ্রামের সকলকে বলদ বানিয়ে ফকির করে দেবে।

তাবিজ দিয়ে গণিত অলিম্পিয়াড জেতা যায়, এই বিশ্বাস ছোট ভাইয়ের মন থেকে বের করতেই হবে।নাহলে কুকা আর সবার কপালে বিপদ।

কি করা যায় এসব ভাবতে ভাবতে হুকার মনে হলো, একদিন তাবিজ অপারেশন করে দেখতে হবে ভেতরে কি আছে। কোন অলৌকিক মন্ত্র আছে? কিভাবে এই তাবিজ হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে? ঝড়-বৃষ্টি শনাক্ত করার সেন্সর আছে নাকি? তাবিজে কি ব্যাটারি আছে? থাকলে সেটা শেষ হয় না নাকি? এত ছোট জিনিসে এত কিছু থাকতে পারে!

৩

কুকার ঘরের টেবিলের ওপর রাখা তাবিজটা নিয়ে হুকা নিজের ঘরে চলে আসল।এবার তাবিজের ময়নাতদন্ত করতে হবে।

তাবিজের চেইন ধাতুর তৈরি। তাবিজের কিছুটা অংশ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাগানো।বাকি অংশে একটা বিশেষ পেইন্ট। ফয়েল খুলতেই একটা কাচের লকেটের মত কিছু।

ফয়েলের সাথে একটা সরু তারের এক প্রান্ত যুক্ত।অন্য প্রান্ত কাচের ভেতরে কিছুর সাথে যুক্ত।কাচের লকেট খুলতেই দেখা পেলেন কিছু রোধক, সিরামিক ক্যাপাসিটর আর বাল্ব।

হুকা মিয়ার আর বুঝতে বাকি নেই, তাবিজের আসল খেলা কই। কুকাকে ডেকে হুকা বলল কাল সন্ধ্যায় গ্রামের সবাইকে নিয়ে বড় বট গাছের নিচে আসতে।তাবিজ বাবার জারিজুরি ধরা পরছে।

৪

আজকে তাবিজ বাবার রহস্য বের হবে।গ্রামের সবাই হাজির। এবার হুকা মিয়া বলা শুরু করল,

হুকা : এই তাবিজ যে ভুয়া, সেটা আগেই ধারণা করেছিলাম। কালকে প্রমাণও পাইছি।

ভুকা : কি প্রমাণ?

হুকা : হুকা সবাইকে একটা তাবিজ খুলে সব দেখালো।তাবিজ অলৌকিক হলে ভেতরে ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম আসলো কেন? এই তাবিজ মুলত বাতাস থেকে আয়ন সংগ্রহ করে আলো দেয়।বাতাস থেকে আয়ন সংগ্রহের মূল কাজ করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। এটাই এন্টিনা হিসেবে কাজ করে।তারপর ক্যাপাসিটর এই চার্জ সংগ্রহ করতে থাকে।এরপর যখন বাল্ব জ্বালানোর মত ভোল্টেজ ক্যাপাসিটরে সংগ্রহ হয়ে যায়, তখন বাল্ব জ্বলে ওঠে।তারপর সেই আলো শোষণ করে জিঙ্ক সালফাইড পেইন্ট।যেটা তাবিজের বাকি অংশে লাগানো ছিল।এটাকে Luminous paint বলে।এই যৌগ আলো শোষণ করার পর ধীরে ধীরে বিকিরণ করা শুরু করে।

মুকা : তাহলে ঝড়বৃষ্টির দিন ঘন ঘন জ্বলা নেভা করে কেন?

হুকা : আসলে সেদিন আকাশে অনেক মেঘ থাকে।মেঘ বাতাসের সাথে সংঘর্ষ করে আয়নিত হয়,তাই ঝড়বৃষ্টির দিন বায়ুতে আয়নের মাত্রা বেশি থাকে।ফলে দ্রুত ক্যাপাসিটর চার্জ হয়,আবার সাথে সাথে বাল্ব জ্বালিয়ে ডিসচার্জ হয়ে যায়।এজন্য ঘন ঘন জ্বলা নেভা করে।

ফুকা : প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্বলে কেন? প্রতিদিন সন্ধ্যায় কি আয়ন থাকে?

হুকা : আসলো তাবিজের জিঙ্ক সালফাইড এ যখনি আলো শোষণ করে, সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিকিরণ করা শুরু করে। অধিক আলোয় এটা ধরা পরে না।সন্ধ্যায় আলো কমার সাথে সাথে জিঙ্ক সালফাইড এর আলোর বিকিরণ চোখে ধরা পরে।

টুকা : তাইতো বলি,রাতে ঘরের আলো বন্ধ করার সাথে সাথে তাবিজ আলো দেয় কেন। আমিতো মনে করতাম, আলো বন্ধ করার সাথে সাথে ঘরে ভূত ঢোকে।

হুকা : হা হা হা।ভূত বলে কিছু নাই।

সবাই বুজরুকি বুঝতে পেরে তাবিজ বাবাকে খুঁজতেছে হাতের ব্যায়াম করবার জন্য।কিন্তু তাবিজ বাবা তো আগেই হাওয়া।

ছবি: প্রিয় তালুকদার
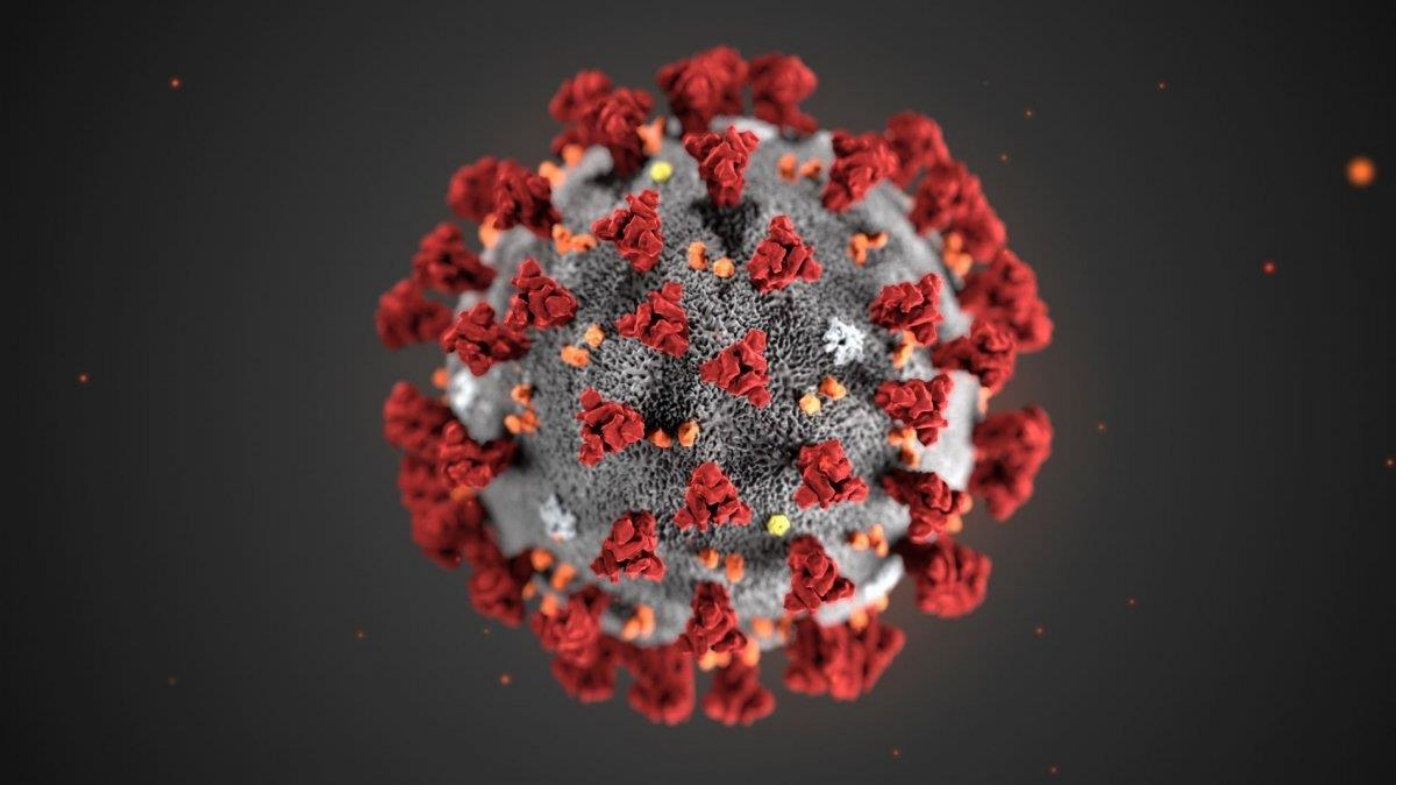
করোনভাইরাস সংক্রান্ত পরীক্ষা যেভাবে করা হয়

মার্জিয়া মেহজাবিন তন্বি

করোনাভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত করতে বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত পরীক্ষাটি “PCR টেস্ট” হিসাবে পরিচিত।PCR বলতে বোঝায় ‘polymerase chain reaction’ আর এটা মোটেও নতুন কোনো পদ্ধতি না।এ PCR টেস্ট ১৯৮০-র এর দশক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং সংক্রামক রোগ নির্ণয় সহ বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।এই পরীক্ষাটিতে কয়েক মিলিয়ন বার অল্প পরিমাণে DNA অনুলিপি করা যায় আর এতে সংক্রমিত ভাইরাস সনাক্তকরণ এবং নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে।
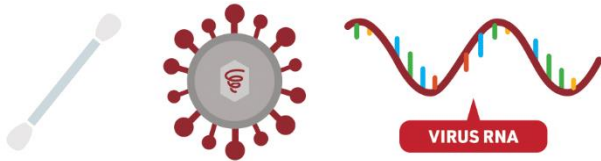
ভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রয়োজন। প্রথমে একটি সোয়াব (swab; কটন বাড জতীয়) নেওয়া হয়, সাধারণত রোগীর নাক বা গলার ভেতরের পিছনের অংশ থেকে।তারপরে সোয়াবটিকে একটি নিরাপদ কন্টেইনারে মধ্যে রাখা হয় এবং আরও বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়। নমুনা নেওয়া হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হয় নাহলে নমুনাটি নষ্ট হয়ে যায়।

ডিএনএ আমাদের জিনগত উপাদান এবং কিছু ভাইরাসও ডিএনএ থাকে। কিন্তু COVID-19 বা SARS-CoV-19 হওয়ার জন্য দায়ী ভাইরাসটিতে কোনো দ্বি সুত্রক DNA নেই, আছে শুধু এক সুত্রক RNA. যেহেতু PCR শুধু ডিএনএ অনুলিপন পরিক্ষা করতে পারে। সেহেতু আমাদেরকে প্রথমে আরএনএ কে ডিএনএ তে রুপান্তর করে নিতে হয়।

নমুনা থেকে ভাইরাসের RNA নিষ্কাশন করা হয়।তারপর এটাকে বিশুদ্ধ করা হয় মানবকোষ, এনজাইম বা এরকম কিছু থেকে, যেগুলো PCR টেস্টের সময় বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ল্যাবগুলিতে থাকা কিটগুলি এর জন্য বিশেষত ভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে।

পরিশোধিত RNA-তে reverse transcriptase (RT) নামক একটি এনজাইম মিশ্রিত করা হয়।এই এনজাইম মুলত এক সুত্রক RNA-কে দ্বি সুত্রক DNA-তে রুপান্তর করে দেয় যাতে PCR টেস্টে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তারপর সেই ভাইরাস DNA- কে একটি টেস্ট টিউব যোগ করা হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো যোগ করা হয়:

Primers: এগুলি হলো DNA -এর ছোট-ছোট ভাগ যেটা ভাইরাস DNA বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশগুলিতে আবদ্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর কারণেই ভাইরাস DNA অন্য তোনো DNA-এর সাথে যুক্ত হতে পারে না।

নিউক্লিওটাইড: এগুলি হলো DNA তৈরি করার বিল্ডিং ব্লক।

DNA polymerase: যেটা মুলত DNA-র কপি তৈরি করে।

একটি PCR মেশিন মিশ্রণটি উত্তপ্ত করে।এর ফলে দ্বি সুত্রক DNA-র সুত্রকগুলো খুলে যায় এবং যখন ঠান্ড হয় তখন primer টি DNA-র সাথে যুক্ত হতে পারে।যখন primer গুলো DNA-র সাথে বন্ড তৈরি করে ফেলে, তারপর সেটা DNA-building এনজাইমকে (DNA polymerase) একটা স্টার্ট পয়েন্ট প্রদান করে যাতে সেটা অনুলিপি করার যায়। এই প্রক্রিয়াটি বারবার গরম এবং শীতল করার মাধ্যমে অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না ডিএনএর লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি হয়।
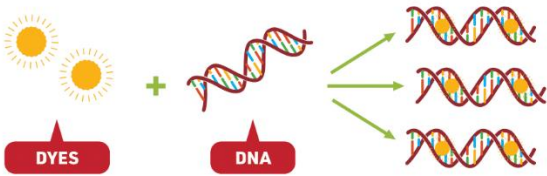
এটার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা গেল যে কীভাবে PCR ভাইরাস জেনেটিক কোডকে প্রশস্ত করে, কিন্তু কীভাবে সেটা শনাক্ত করা হয় তার প্রক্রিয়া কিন্তু বলা হয়নি। এখানেই ফ্লোরোসেন্ট (fluorescent) রঞ্জক DNA অনুলিপি তৈরি করার সময় টেস্ট টিউবে যুক্ত হয়।সেটা অনুলিপি করা DNA-তে আবদ্ধ হয় যেটা

রঞ্জকের প্রতিপ্রভাকে (fluorescence) বাড়িয়ে তোলে এবং সেটাকে আরো লক্ষণীয় করে তোলে। এটিই সেই আলো যা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
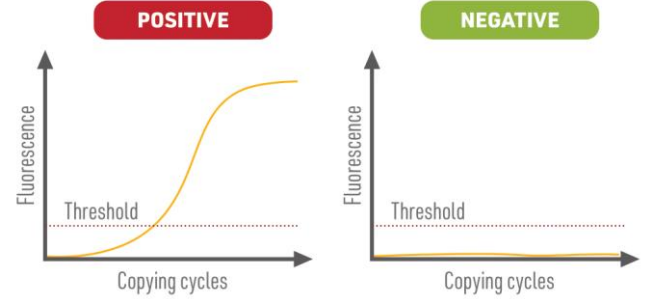
ভাইরাস DNA অনুলিপি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এই প্রতিপ্রভা (ফ্লোরোসেন্টের কারণে তৈরি আলো) বৃদ্ধি পায়।টেস্টটিকে একটা প্রত্যাশিত ব্যাকগ্রাউন্ড স্তরের উপরে সেট করা হয়। যদি এই প্রতিপ্রভা একটি নির্দিষ্ট প্রান্তকে অতিক্রম করে, তবে পরীক্ষাটি পজেটিভ, অর্থাৎ নমুনায় ভাইরাস বিদ্যমান। যদি নমুনায় ভাইরাসটি উপস্থিত না থাকে, তাহলে PCR পরীক্ষায় অনুলিপি তৈরি হত না, সুতরাং প্রতিপ্রভা নির্দিষ্ট প্রান্তকে অতিক্রম করতো না - তখন পরীক্ষাটি নেগেটিভ।

যদিও প্রক্রিয়াটি জটিল শোনাচ্ছে, কিন্তু PCR পরীক্ষা ভাইরাস সংক্রমণ রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি অসাধারণ এবং নির্ভরযোগ্য উপায়। আর এজন্যই COVID-19 নির্ণয়ে এটা এত বিস্তর পরিসরে ব্যবহার করা হচ্ছে।তবে, কিছু দেশে পরীক্ষার ক্ষমতা আর গতি বাড়াতে বেশ ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

এর একটি কারণ হচ্ছে পরীক্ষাটি করতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। একটি নমুনার ফলাফল পেতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগতে পারে, আবার ল্যাবের টেস্টিং ক্যাপাবেলিটির ওপর নির্ভর করে যে কতটা টেস্ট করতে সক্ষম।একটি ছোট গবেষণা ল্যাব প্রতিদিন প্রায় ৮০টি পরীক্ষা চালাতে সক্ষম। আর বড় বড় ল্যবগুলোতে অনেকগুলা মেশিন দিয়ে ১০০০ থেকে ২০০০ এর মত নমুনা একসাথে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাবান ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুন

ভূতশ্লেষণ

সেইগান স্ট্যান্ডার্ড আর অকাম-এর ক্ষুর দিয়ে ভূতের ঘটনার বিশ্লেষণ

জাভেদ ইকবাল

ফেইসবুকে মাঝে মাঝে কিছু পোস্ট আসেঃ চাদে মানুষ যায় নি; ৯/১১ আসলে প্লেনের আক্রমন না; পৃথিবী চালায় ভিন গ্রহের সরীসৃপ, ইত্যাদি।

তবে সবচাইতে প্রচলিত হচ্ছে জ্বীনে ধরা, ভূতে ধরা, ভূতের বাড়ি, ইত্যাদি।এই সব পোস্ট বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের হাতে কিছু পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে দুটো পদ্ধতি নিয়ে এই লেখা।

সেইগান স্ট্যান্ডার্ড

কার্ল এডওয়ার্ড সেইগান[1] (Carl Edward Sagan) ছিলেন একজন জোতির্বিদ, কসমোলজিস্ট, অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট, অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট, লেখক ও বিজ্ঞান-জনপ্রিয়কারক (যে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করে) উনি একটা খুব দামী কথা বলেছিলেন[2], যেটা প্রত্যেক বিজ্ঞানমনষ্ক মানুষের মনে রাখা উচিৎ:

অসাধারণ কিছু দাবী করলে অসাধারণ প্রমাণ দিতে হয়।
(Extraordinary claims require extraordinary evidence বা সংক্ষেপে ECREE)

কেউ যদি বলে বিশাল বা অসাধারণ কিছু সে আবিষ্কার করেছে যেটা আমাদের জানা তথ্যের সাথে যায় না, তাহলে সাধারণ প্রমাণ দিলে হবে না, আনুপাতিকভাবে বিশাল প্রমাণ দিতে হবে।

- পেট্রোল বা সিএনজির বদলে পানি দিয়ে গাড়ি চলে? গাড়ি চালিয়ে দেখালে হবে না, পুরা গাড়ি খুলে দেখানো লাগবে, কোথাও লুকানো পেট্রোলের ট্যাঙ্ক নাই।
- নিউটন ভুল? গাণিতিক বা পরীক্ষামূলক প্রমাণ লাগবে যেটা অন্যরাও করে দেখাতে পারবে। নিজের ঘরে করে ভিডিও তুলে দেখালে হবে না।

- নিমপাতা আর আদার রস খেলে ক্যান্সার ভাল হয়ে যায়? রোগীর আগে ক্যান্সার ছিল, এবং ভাল হয়ে গিয়েছে, সেটার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা লাগবে।
- অমুকের পোষা জ্বীন আছে? ঠিক আছে, জ্বীন আমার পকেটের কাগজে কী লেখা আছে, সেটা যেন পড়ে শোনায় সবাইকে।

সেইগান স্ট্যান্ডার্ডএর সমালোচনাও হয়েছে, কারন এতে করে অনেক সময় নতুন আবিষ্কার চাপা পড়ে যেতে পারে।

অকাম-এর ক্ষুর / কৃপণতার[3] নীতি

১৪শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ওকহ্যামে উইলিয়াম নামে একজন পাদ্রী/বিজ্ঞানী ছিলেন। সমস্যা সমাধানের এই নীতিটা তার আবিষ্কার বলে ধারনা করা হয়।ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এটা জানা খুব দরকার বলে মনে করি।বিজ্ঞানীদের জন্য অবশ্য এটা ব্যবহার করার আগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এটার নাম ক্ষুর, কারন এটা আবর্জনা ছেটে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।সহজ করে বললে,

যদি অনেকগুলি হাইপোথেসিস থাকে, তাহলে যেটাতে অনুমান /মেনে নেয়া সবচাইতে কম, ব্যাখ্যা সবচাইতে সহজ, সেটা দিয়ে শুরু করা উচিৎ।

(Among competing hypotheses[4], the one with the fewest assumptions should be selected)।আরো সহজ করলেঃ "যেটা সরল, সেটাই সঠিক"।

হাইপোথেসিস হচ্ছে কোন ঘটনার একটা অনুমানিত ব্যাখ্যা, অথবা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করার সূচনা।যেমন, রাতে বাসায় ফিরে যদি দেখি কোন লাইট জ্বলছে না, আমি কয়েকটা হাইপোথেসিস দাড় করাতে পারি:

- বাসায় কেউ নেই, তাই লাইট জ্বালানো হয় নাই
- কারেন্ট চলে গিয়েছে
- বাসার সব লাইট একসাথে নষ্ট হয়ে গিয়েছে
- বাসাটা একটা ব্ল্যাকহোলে পড়ে গিয়েছে তাই কোন লাইট বের হচ্ছে না
- বাসায় ভুতের আছর হয়েছে।

উপরের হাইপোথেসিস গুলির মধ্যে কোনগুলিকে অকামের ক্ষুর দিয়ে সহজেই কেটে ফেলা যায়? কোনগুলির জন্য সেইগান স্ট্যান্ডার্ডের প্রমাণ দরকার? উত্তরটা পাঠকের জন্যই রেখে দিলাম।

ছবি: প্রিয় তালুকদার

আরেকটা সত্যি ঘটনা। জনাব "স" বিশাল সরকারী আমলা। সম্প্রতি রাশিয়া সফর করে এসেছেন এবং তাদের কয়েকটা নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতেও গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কথায় কথায় বললেন, "তুমি কি জান, ওরা স্যাটেলাইট দিয়ে সেই ফ্যাসিলিটিতে যাচ্ছে, এমন সব কয়টা গাড়ির নাম্বারপ্লেটের ছবি তুলে রাখে?" নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে আমার কোন ধারনা নেই, জীবনে রাশিয়ায় যাই নাই, তবুও আমি অকামের ক্ষুর / কৃপণতার নীতি প্রয়োগ করলামঃ - আচ্ছা, গেইটে গার্ড গাড়ি চেক করে না? তখন তো সে গাড়ির নাম্বার লিখে রাখতে পারে বা কম্পিউটারে এন্টার করতে পারে - গেইটে কি আপনি সিসি ক্যামেরা দেখেছেন? তাহলে স্যাটেলাইট দিয়ে তোলার দরকার কি? - স্যাটেলাইট থাকে অনেক দূরে; গাড়ির লাইসেন্স পড়তে পারার অ্যাঙ্গেল পেতে সেটাকে আরো দূরে যেতে হবে - স্যাটেলাইট রাতে, ঝড়/বৃষ্টি/স্নো তে কাজ করবে না - কয়েকশ মিলিয়ন ডলার দামের স্যাটেলাইট এই কাজে আটকে না রেখে কয়েকশ ডলার দামের সিসি ক্যামেরাতেই তো এই কাজ করা যায়।

জনাব "স" ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "তুমি শুধু শুধু কুতর্ক কর"।

কিন্তু স্যাটেলাইট তো ভূত না। ভূতের ঘটনাগুলিকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব?

পরীক্ষার আগে অনেকের পেটে ব্যথা করে।কেন? নার্ভাস হয়ে? নাকি পরীক্ষা না দেয়ার ফন্দি? মা-বাবা যখন এটা ভাবেন, তারা কিন্তু অকাম-এর ক্ষুর প্রয়োগ করছেন।

একই ভাবে আরো কয়েকটা কথা বিশ্লেষণ করি আমরাঃ
এই বাসায় ভূত আছে।প্রতিদিন ছাদে ভূত ঢিল মারে

- সেই বাসার মালিকানা নিয়ে কি কোন গন্ডগোল আছে? তাহলে কি এমন হতে পারে যে এক পক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য ছাদে ঢিল মারে অন্য পক্ষ? আর ভুতের ঢিল মারার দরকার কি? তার কি আর কোন ক্ষমতা নেই?

পুকুরে সাতার দেয়ার সময় কে জানি পা ধরে নিচের দিকে টানছিল।

- পুকুরে কি কোন লতাপাতা আছে? উঠে আসার পরে কি পায়ে ব্যথা করছিল?

অমুককে চিনি। সে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, আর সে নাকি চারদিকে শব্দ, ফিসফিস কথা শোনে।

- এটা যে বেশ পরিচিত কয়েকটা মানসিক রোগের লক্ষন, সেটা জানেন?

ছোট একটা প্রশ্ন–এই ঘটনার কি ভূত বাদে আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে? যেহেতু ভূত বেশিরভাগ লোকই দেখে নাই, তার মানে এটা সবচাইতে সহজ ব্যাক্যা না, অর্থাৎ জনাব অকাম-এর হিসাবে এই ব্যাখ্যা পেছনে পড়ে যায়।

একটা 'সত্যি' ভূতের কাহিনী দিয়ে লেখাটা শেষ করি।
একটা ট্রাক লাশ নিয়ে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাচ্ছে।পথের মধ্যে রাত হয়ে যাওয়ার ড্রাইভার ও হেলপার একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে আবার ট্রাকে করে রওয়ানা দিল। হঠাৎ হেলপার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে, পিছনের লাশটা বসে সিগারেট টানছে। হেলপার ভয়ে ভয়ে বলল, "ওস্তাদ গাড়ি থামান।"
ওস্তাদ: কেন?
হেলপার: দেখেন ঐ লাশটা বসে সিগারেট টানতাছে॥
ওস্তাদ: দূর বেটা এইটা কেমনে হয়?
হেলপার: দেখেন না আপনি ওস্তাদ নয় আমি ভাগলাম।এবার দুইজনে (ড্রাইভার ও হেলপার) গাড়ি থেকে নামল দেখার জন্য ব্যাপারটা কি।লাশটা বললো, "ওস্তাদ, গাড়ি থামাইলেন ক্যান?"
এই শুনে ওস্তাদ আর হেল্পার খিচে দৌড় দিল, আর তার পর লাশটাও তাদের তাড়া দিল।হেল্পারের বয়স কম ছিল, তাই সে দ্রুত পালিয়ে এক বাসায় গিয়ে উঠল।পরে সূর্য ওঠার পর গ্রামের লোক সহ সে ফিরে এসে দেখল, ড্রাইভার মরে পড়ে আছে, তার ঘাড় ভাঙ্গা।দশ গ্রামে ছড়িয়ে গেল, ট্রাকের লাশের ভূত ড্রাইভারের ঘাড় মটকে দিয়েছে।

চলুন একই গল্পটা একটু বিস্তারিতভাবে আবার পড়ি।

একটা ট্রাক লাশ নিয়ে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাচ্ছে।পথের মধ্যে রাত হয়ে যাওয়ার ড্রাইভার আর হেল্পার খাওয়ার জন্য

থামলো।ড্রাইভার ও হেলপার দোকানে বসে খাচ্ছে আর কথা বলছে।এইদিকে একটা লোক পাশের টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল। সে ভাবলো, ট্রাকটা দেখে খালি মনে হচ্ছে, আর কথা শুনে বুঝতে পারছি ওরা আমার পথেই যাবে, ওদের না দেখিয়ে উঠে পড়ি। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।সে লুকিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠে পড়ল, এবং একটা লম্বা বাক্স দেখে সেটার ওপর বসে পড়ল।অতঃপর ড্রাইভার আর হেলপার খাওয়া শেষ করে আবার রওয়ানা দিল। কিছুক্ষণ পর ট্রাকের পেছনে বসা লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।
হঠাৎ হেলপার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে, পিছনের লাশটা বসে সিগারেট টানছে।হেলপার ভয়ে ভয়ে বলল, "ওস্তাদ গাড়ি থামান।'
ওস্তাদ: কেন?
হেলপার: দেখেন ঐ লাশটা বসে সিগারেট টানতাছে॥
ওস্তাদ: দূর বেটা এইটা কেমনে হয়?
হেলপার: দেখেন না আপনি ওস্তাদ নয় আমি ভাগলাম।এবার দুইজনে (ড্রাইভার ও হেলপার) গাড়ি থেকে নামল দেখার জন্য ব্যাপারটা কি। কফিনের ওপর বসে থাকা লোকটা বললো, "ওস্তাদ, গাড়ি থামাইলেন ক্যান?"
এই শুনে ওস্তাদ আর হেল্পার লোকটাকে ভূত ভেবে খিচে দৌড় দিল।আর তাদের দৌড় দেখে লোকটা ভাবলো মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে, নইলে ওরা দৌড় দিল কেন? সেও ওদের পিছনে দিল দৌড়!
হেলপার আর ড্রাইভার পিছনে তাকিয়ে দেখে "লাশটা" ওদের পিছনে দৌড়াচ্ছে!
হেলপার বলল, ওস্তাদ আজ আর রক্ষা নাইক্কা, ঐ লাশটা ও আমাদের পিছনে আইতাছে, তাড়াতাড়ি দৌড়ান।হেল্পারের বয়স কম ছিল, তাই সে দ্রুত পালিয়ে এক বাসায় গিয়ে উঠল।পরে সূর্য ওঠার পর গ্রামের লোক সহ সে ফিরে এসে দেখল, ড্রাইভার মরে পড়ে আছে। কেউ খেয়ালও করল না, লাশের দুই হাত দূরে মাটিতে পিছলে যাওয়ার দাগ, আর একটা পাথরে ড্রাইভারের রক্ত লেগে আছে, কারন সে মাটিতে পিছলে গিয়ে পড়ে গিয়ে পাথরে মাথা লেগে মারা গিয়েছে।তার ঘাড় ভাঙ্গা।দশ গ্রামে ছড়িয়ে গেল, ট্রাকের লাশের ভূত ড্রাইভারের ঘাড় মটকে দিয়েছে।

যখনি কেউ কোন বিশাল কিছুর দাবী করবে, সেটাকে অকামের ক্ষুর দিয়ে ছাটা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখা উচিৎ।ব্রেনের ভাল ব্যায়াম হবে, সময়ও বাচবে। তারপর সেটার ওপর সেইগান স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আপনি যদি এই গল্প শুনতেন, তাহলে কী আপনার মাথায় একবারও এই প্রশ্ন আসতো, ভূত কেন সিগারেট খাচ্ছে? ড্রাইভারের ঘাড় ভাঙ্গা, তার লাশে আশেপাশে কি তাকিয়ে দেখতেন, অন্য কোন আলামত পাওয়া যায় নাকি? ভাঙ্গা ঘাড়ের

আর কোন সহজতর ব্যাখ্যা কি সম্ভব? এই ধরণের চিন্তা করাই হচ্ছে অকাম এর ক্ষুর ব্যবহার করা।

তাই ভূত-প্রেতের ঘটনা শোনার পরে তার ওপর অকাম-এর ক্ষুর প্রয়োগ করে দেখুন।দেখবেন, ভূত আর বেশি বিরক্ত করবে না।

অতিরিক্ত তথ্য

1)তার নামের উচ্চারণ বাঙলায় লিখে বোঝানো একটু কঠিন।এটা 'সাগান' বা 'সেগান' না, আবার পুরাপুরি 'সেইগান'ও না যদিও ২য়টা কাছাকাছি বলে সেটা ব্যবহার করেছি।

2)সেইগানের আগেও একই রকম কথা আরো অনেকে বলেছিলেন।তারটা ছোট এবং টিভিতে বলায় তার নামেই বেশি প্রচলিত।
আমাদের জানামতে আগে বলা কথাগুলির মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন হচ্ছে অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন-এর ১৮০৮ এ বলা উক্তি: প্রতিদিন হাজার হাজার ঘটনা ঘটে যেগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।কেউ যদি সেগুলির এমন কোন ব্যাখ্যা দেয় যা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে যায় না, তাহলে সেগুলিকে বিশ্বাস করার জন্য আনুপাতিক হারে কঠিন প্রমাণ দরকার। "A thousand phenomena present themselves daily which we cannot explain, but where facts are suggested, bearing no analogy with the laws of nature as yet known to us, their verity needs proofs proportioned to their difficulty."

3)এই কৃপণতা টাকার না--এটা অযথা যুক্তি খরচ না করার কৃপণতা

4)বিজ্ঞানে হাইপোথেসিস খুব কাজের জিনিস।যখন জানা তথ্য বা তত্ব দিয়ে কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন হাইপোথেসিস দাড় করিয়ে সেটাকে ভুল বা সঠিক প্রমাণ করে বিজ্ঞানকে আগানো যায়।

মশিউর রহমান আনন্দ

আলেয়া

জয় নন্দি

ধরেন দূর সম্পর্কের এক খালা বাড়ি যাওয়ার জন্য আপনার ডাক পড়েছে।তাদের বাড়ি তো পুরাই অন্য লেভেলের গ্রামে।আপনি আজকাল কার পাব্লিক, শহরের লোক। কোনোদিন গ্রাম যাননি, দেখেনওনি।আপনাকে যেতে হলো সেই গ্রামে।পৌছাতে পৌছাতে রাত।সামনে মাঠ পড়েছে, তারপর খানিকটা জঙ্গল মতো।মাঠ টা পেরোনোর পরেই দেখলেন জঙ্গলের ভিতর কি জানি জ্বলছে।আপনি ভাবলেন দাবানল লাগলো নাকি! শেষ পর্যন্ত পুড়ে মরতে হবে? কিন্তু আরেকটু কাছে গিয়ে দেখলেন কাহীনি তো কেরোসিন! কোথাও কিছু নাই, হুদাই একটা আগুনের গোল্লা।আপনি বাপ মা আর নিজের নাম ভুলে রাম রাম করতে করতে দিলেন দৌড়!

এবার আসা যাক আসল কথায়।এই হচ্ছে আলেয়া, বিজ্ঞানের গালভরা নাম আরকি। বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নেই।গ্রামের চাচাতো ভাইবোনদের পারলে বুঝিয়ে বলবেন, অযৌক্তিক ভয় থেকে মুক্তি পাবে।এর কাহিনী নিতান্তই সহজ কিন্তু ইন্টারেস্টিং।

গ্রাম্য পরিবেশে গাছপালা পঁচে,পশুপাখির মৃতদেহ পঁচে সহজেই কিছু গ্যাস সৃষ্টি করে।মূলত ফসফিন(PH_3), ডাইফসফিন(P_2H_5) এবং মিথেন(CH_4) এর জারণ বিক্রিয়া ঘটে।ফসফিন এবং ডাইফসফিনের মিশ্রণ অক্সিজেন পেলেই জ্বলে ওঠে।তাই ওই মিশ্রণ কোনোভাবে তৈরি হলে তা দ্বারা হঠাৎ-ই মাটির কিছুটা উপরে অক্সিজেনের স্পর্শে আগুন ধরে ওঠে। স্বল্প পরিমাণ মিশ্রণও আগুন ধরানোর জন্য যথেষ্ট। আগুনের ফুলকির জন্য জঙ্গলে-মাঠে পড়ে থাকা বাঁশ, শুকনা কাঠের ঘর্ষণেই কাজ চলে যায়।এছাড়া অন্য কিছু মত আছে বৈকি! তবে এইটা আপনাদের জানালাম।

প্ল্যানচেটের ইতিবৃত্ত

সানজিদ আরমান বিশাল

আমাদের মধ্যে কমবেশী সবার মাথাতেই আত্মা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।আসলেই কি আত্মা আছে? আত্মা কোথায় থাকে? তাদের কি আলাদা কোনো জগৎ আছে? নাকি আমাদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে? আমরা কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?

এসব প্রশ্নই মাথায় এসেছিল ফ্রান্সের পয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন মানুষের।তার নাম অ্যালান কারডেক তিনি স্পিরিচুয়াল জিনিস নিয়ে গবেষণা করতে ভালোবাসতেন।এক রাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিলে এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আত্মার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন (এমনটা দাবি করেন)

আর এই 'বিশেষ পদ্ধতি' কে বলা হয় প্লানচেট (Planchette)!

প্লানচেট জিনিসটা কী?

এটা হলো দলগতভাবে আত্মার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার একটা পদ্ধতি ফরাসির তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ 'এফ এস প্ল্যাঁশেত' আত্মার সঙ্গে জীবিত মানুষের যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারে প্রচেষ্টা করেছিলেন।তাই তার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে প্ল্যানচেট।

প্ল্যানচেট শব্দটি বর্তমান রূপ। এনসিয়েন্ট যুগে এর নাম ছিল রিয়েল ডিমোনিক বা শয়তানের পূজারী।

প্লানচেটের কতগুলো ধাপ আছে যেমন:

1.Channeling (আত্মাকে খুব কাছে নিয়ে আসা)

2. Interchangeable (আত্মার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা)

3. Clairaudience (আত্মার কথা শুনতে পারা) 4. Clairgustance (আত্মার আসল স্বাদ নেয়া)

5. Clairsentience (আত্মাকে ফিল করা 6.Clairvoyance (আত্মাকে দেখতে পারা)

একটা গল্প দিয়ে 'প্লানচেট' জিনিসটাকে বোঝা যাক।

রাফি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সে ঠিক করেছে তার সদ্যপ্রয়াত চাচা মরহুম রফিক সাহেবের আত্মার সাথে সে যোগাযোগ করবে।তাই সে তার তিনজন বেষ্টফ্রেন্ডকে নিয়ে বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট মতিন মিয়ার শরণাপন্ন হলো। বলা হয় বাঘা বাঘা আত্মারা তার নির্দেশে নাকানি-চুবানি খায়!

মতিন মিয়া তাদের নিয়ে একটা বদ্ধ অন্ধকার ঘরে গেল।ঘরে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালানো। আর একটা গোল টেবিলের চারদিকে পাঁচটা চেয়ার।সবাই চেয়ারগুলোতে বসলো।টেবিলের উপর একটা বোর্ড রাখা আছে। বোর্ডটার নাম 'ওইজা বোর্ড' (Ouija Board)।ওইজা বোর্ড হলো এমন একটা বোর্ড যার উপর ইংরেজি বর্ণমালা(A-Z),ডিজিট (0-9) আর 'YES-NO' টাইপের উত্তরবিশিষ্ট কতগুলো শব্দ লেখা থাকে।(বলা হয় 'ওইজা বোর্ড' নাকি নিজেই তার নাম 'ওইজা বোর্ড' রেখেছে)

মতিন মিয়া সবাইকে ওইজা বোর্ডের উপর রাখা 'প্লানচেট' এর উপর হাত রাখতে বললো।'প্লানচেট' হলো একটা কাঠের তৈরি বস্তু যার সামনের দিকটা সরু আর পেছনের দিকটা "লাভ" শেইপের।এর গায়ে এটা ছোট ছিদ্র রয়েছে নিচে কি আছে তা দেখার জন্য।এর ছিদ্রটি বোর্ডের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেয়।

সবাই 'প্লানচেট' এর উপর হাত রাখল।এবার মতিন মিয়া সবাইকে চোখ বন্ধ করতে বললো এবং যাবতীয় সকল চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিতে বললো।সবাই তাই করল।

চারিদিক শান্ত।একটু বেশীই শান্ত।হঠাৎ রাফি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল," এই ঘরে কি কোন আত্মা আছে?"

আশ্চর্যজনকভাবে প্লানচেটের ছিদ্রটি 'YES' এর ঘরে চলে গেল!!অর্থাৎ এই ঘরে আত্মা আছে।

দেরী না করে পরের প্রশ্নটি করল রাফি।

"কী নাম তোমার?"

এবার প্লানচেটের ছিদ্রটি প্রথমে R এর ঘরে গেল।এরপর গেল O এর ঘরে।তারপর একে একে F,I এবং Q এর ঘরে গেল।অর্থাৎ ঘরে উপস্থিত আত্মার নাম ROFIQ। আরেহ!! এতো রাফির চাচা!!

রাফি প্রশ্ন করা থামালো না।তার পরের প্রশ্ন,"তুমি কীভাবে মারা গেলে?"

প্লানচেট তার জায়গা পরিবর্তন করে জবাব দিল 'FIRE'।অর্থাৎ তিনি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে আত্মাটি সব প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিতে পেরেছে।অর্থাৎ রাফিকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে যে এটাই তার মৃত চাচার আত্মা!

এবার গল্পে একটু টুইস্ট নিয়ে আসা যাক!

রাফির বন্ধু নাফি অত্যন্ত চালাক এবং BCB'র মেম্বার।সে এরকম একটা ভৌতিক আর সেনসিটিভ ইভেন্টে নিষেধ সত্ত্বেও চোখটা একটু খুলে রেখেছিল!সে দেখেছে প্লানচেটটি অর্থাৎ যেখানে রাফি এবং অন্যান্য সবাই হাত রেখেছিল সেটি কখনোই 'YES' এর ঘরে যায়নি।এমনকি সেটি ROFIQ ও নির্দেশ করেনি।FIRE ও দেখায়নি!!

তাহলে চোখ বন্ধ রেখে রাফি আত্মার সাথে কমিউনিকেট করতে পারলেও চোখ খোলা রেখে নাফি কেন তা পারল না??

এবার জানা যাক এর পেছনের সাইন্সটা কী...

এর পেছনের সাইন্সটা হলো মানব মস্তিষ্কের 'ইডিয়মোটর ইফেক্ট'।

এটা হচ্ছে সেই অবস্থা যখন 'অটোসাজেশান' ক্ষমতার প্রভাবে আমাদের অবচেতন মন বিভিন্ন নির্দেশ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং সেই কমান্ড অনুযায়ী অবচেতন মন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মুভমেন্ট করতে নির্দেশ দেয়।এই নড়াচড়া অবচেতন মনের নির্দেশে হয় তাই এটা একদমই অনৈচ্ছিক।

রাফি যখন চোখ বন্ধ রেখে তার চাচাকে প্রশ্ন করল তখন রাফির অবচেতন মনের ইচ্ছা ছিল যে সব কিছুর যেন একটা পজিটিভ উত্তর পায়। আর এক্ষেত্রে এক্সাকলি তাই ঘটেছে! এর কারণ রাফির চোখ যখন খোলা ছিল তখন সে জানত কোথায় YES কোথায় ROFIQ শব্দগুলো আছে।ফলে তার অবচেতন মন তথ্য পাঠালো সব উত্তর যেন 'হ্যাঁ বা আশানুরূপ' হয়।অর্থাৎ, রাফির অবচেতন মন চেয়েছিল সে দেখতে চায় সঠিক ফলাফল এবং হলোও তাই।অবচেতন মনের তথ্য পেয়ে রাফির মস্তিষ্কের বাম পাশের একটি অংশে যে ইফেক্ট তৈরি হলো সেটাই 'ইডিয়মোটর ইফেক্ট'।

ইডিয়মোটর ইফেক্টের ফলে রাফির শিরা ধমনি গুলো সেভাবে নড়তে লাগল যেভাবে তার মন চেয়েছিল এবং তার হাত নড়তে থাকল।

যেহেতু বেষ্টফ্রেন্ডরা তার সাথে ছিল তাই তারা সবাই তাকে বিশ্বাস করত।কিন্তু তাদের উপর এই ইফেক্ট কাজ করবে না।এটা কাজ করবে শুধু রাফির উপরে।

আর যেহেতু নাফির মস্তিষ্কে ইডিয়মোটর ইফেক্ট কাজ করেনি তাই সে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে।

(ইডিয়মোটর ইফেক্ট প্রথম ব্যাখ্যা করেন মাইকেল ফ্যারাডে।এজন্য তাকে "সাইন্টিফিক ওঝা" ডাকলেও ভুল হবে না!)

আর যদি কেউ সত্যিই চায় আত্মার অস্তিত্ব জানতে তাহলে তার উচিত এসব ধাপ্পাবাজ পথ অবলম্বন না করে হাইটেক প্রযুক্তির সাহায্যে নেয়া। কয়েকটার নাম দিচ্ছি,

¤ EVP (Electronic voice phenomenon)- রেন্ডম নয়েজ ডিটেক্ট করার জন্য।

¤ HMDC (Hi-tech Motion Detector Camera)- এটা মোশন ডিটেক্ট করার জন্য।

এছাড়াও থার্মাল ইমেজিং স্কোপস,ইনফ্রারেড থার্মাল ডিরেক্টর ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে।

(অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তি প্লানচেট করতেন।এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আব্রাহাম লিংকন উল্লেখযোগ্য। রবি ঠাকুরের প্রিয় মিডিয়াম নাকি ছিল উমাদেবী। উমাদেবীর উপর ভর করেই আত্মারা আসত তার কাছে। রবি ঠাকুর লিখে গেছেন আত্মাদের অনেক কথা।২০০৪ সালে চট্টগ্রামে 'আত্মিক অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হয়, এর প্রসিডেন্টের ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক অলক দেওয়ারী। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।)

BCB React

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

সমুদ্র জিত সাহা

জ্বীনের পাহাড়

আমির

আমার এক বন্ধু আছে নাম হাদা।আসল নাম হাদা না।আমিই শুধু হাদা বলে ডাকি।ভালো নাম তন্ময়।
কিছুদিন আগে সে এসে আমাকে বলছিল, দোস্ত, জ্বীন দেখে আসলাম
-জ্বীন দেখে আসলি মানে? কোথায়?
-টিভিতে।
-কিরকম জ্বীন?
- আরে সৌদি আরব আছে না? সেখানে মদিনা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় আছে।নাম জ্বীনের পাহাড়।
-জ্বীনের পাহাড়ের জ্বিন! তুই দেখেছিস নাকি?
-আরে নাহ।শোন পুরোটা।সেখানে গাড়ি স্টার্ট না করলেও চলে। শুধু গাড়ি না।সবই ঢাল বেয়ে নিচে না নেমে উপরের দিকে ওঠে। আরো ভয়ানক ব্যাপার হলো ঢাল বেয়ে নিচে নামতে গাড়ির ইঞ্জিন চালাতে হয়।

আমি বললাম, আরে নাহ।ওসব ভুয়া খবর।সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে টিভিতে বিষয়টা দেখালো। দেখলাম, আসলে উপস্থাপিকা এমনভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন মানুষ মেনে নিতে বাধ্য যে এটা জ্বীনের কারবার।
আমি ভাবলাম এ তো হতে পারে না।প্রকৃতির নিয়মের উল্টো ঘটা কখনো সম্ভব না।গেলাম আমাদের হাই স্কুলের এক স্যারের কাছে। স্যার বললো, নাহ।ওসব জ্বীন টীন কিছু না।ঐখানে আসলে চুম্বক অনেক বেশি।তাই টেনে নিয়ে যায়।সবই চুম্বকের কারসাজি।মনে শান্তি এলো। মনের খুশিতে চলে গেলাম। কিন্তু রাস্তায়ই মনে পড়ল, মধ্যপ্রাচ্যে কেন চুম্বক বেশি থাকবে।আর চুম্বকের কারণে হলে পানি, বোতল এসব অধাতুকে কেন টানবে?
মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে বাড়িতে না গিয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাড়ার এক বড় ভাইয়ের কাছে।তারকাছে গেলে সে বললো,
-যার খবরে মসলা বেশি তার খবর চলে বেশি।কারণ আমরা এখন আর সত্য চাই না। মসলাযুক্ত খবর চাই। যাইহোক, জ্বীনের পাহাড়ে জ্বীনটীন কিছু নেই।
-তাহলে এটা হয় কিভাবে?
-অভিকর্ষের কারণে।
-অভিকর্ষের কারণে? কিভাবে? অভিকর্ষের কারণে তো বস্তু উপর থেকে নিচে নামে।নিচ থেকে উপরে উঠবে কিভাবে?
-এক্স্যাক্টলি।যতদিন পৃথিবী আছে ততদিনই অভিকর্ষের কারণে বস্তু উপর থেকে নিচে নামবে ব্যতিক্রম ঘটবে না।তাহলে প্রশ্ন জ্বীনের পাহাড়ে অভিকর্ষের কারণে কেন বস্তু নিচ থেকে উপরে ওঠে?
-হুম।
-আসলে সেখানেও বস্তু উপর থেকে নিচেই নামে।আমরা দেখি নিচ থেকে উপরে উঠছে। এটাকে তুলনা করা যায় মরীচিকার সাথে।মরীচিকায়ও আমরা ভুল দেখি।তবে দুটোর কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।এখানেও আমাদের দেখার ভুল হয় এবং এর ইংরেজি নাম হচ্ছে অপটিক্যাল ইল্যুশন।
-ভুল দেখি কেন?
-এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা।শোন, জ্বীনের পাহাড়ের আসল রহস্য হলো গর্‍্যাভিটি হিল বা ম্যাগনেটিক হিল।
-মানে?
-মানে হলো এমন একটি জায়গা যেখানে বোঝা যায় না এটা কোন দিকে ঢালু।
-কেন বোঝা যায় না?
-ঐযে বললাম।আমাদের ত্রুটি।তবে এটা কিন্তু সবসময় হয় না। এটা তখনই হয় যখন আমরা কোনো ঢালু রাস্তার দিগন্ত দেখতে পাইনা।দিগন্ত দেখতে না পেলে আমরা বুঝতে পারিনা যে রাস্তাটি

আসলে কোনদিকে ঢালু। সার্ভেয়িং যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এটা মেপে তারপর বুঝতে পারি।
দাড়াও তোমাকে দুটো ছবি দেখাই।
১ নাম্বার ছবিতে দেখো। কি মনে হচ্ছে সাইকেল উপরের দিকে উঠছে। আর ২ নাম্বার ছবিতে?
-নিচের দিকে নামছে।
-এক্স্যাক্টলি।১ নাম্বার ছবিতেই ইল্যুশনটা ঘটছে।
-তাহলে এটা শুধু জ্বীনের পাহাড়েই হয় কেন?
-কে বলেছে শুধু জ্বীনের পাহাড়ে হয়? (এই ঘটনা ঘটে বলে মানুষ পাহাড়ের নাম দিয়েছে জ্বীনের পাহাড়)। সৌদি আরবেরই আরো কয়েক জায়গায় গর্‌্যাভিটি হিল দেখা যায়। তাছাড়া আমেরিকার টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়াসহ আরো অনেক জায়গায় গর্‌্যাভিটি হিল দেখা যায়।আর আমেরিকার মেরিল্যান্ডে যেটা আছে সেটাকে তো সবাই ভাবে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তিদের আত্মা ঘুরে বেড়ানোর কারণে এমন হয়। ব্যাপারটা বেশ মজার। এছাড়া আছে কানাডা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশে।

তাছাড়া আমাদের পাশের দেশ ভারতে লাদাখ এবং গুজরাটের রাস্তায়ও এমন ঘটনা ঘটে।
নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস মিলিয়েই সেখানে জ্বীনের পাহাড় নাম দেওয়া হয়েছে।বাংলাদেশে হলে আমরা হয়ত দিতাম ভূতের পাহাড়। সবই অদ্ভুত।বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো। যাইহোক, তুমি বিষয়টা ক্লিয়ার তো?

-জ্বি ভাইয়া। একদম ক্লিয়ার।
আর হ্যাঁ একটা বিষয় নিশ্চিত থাকো, যা হচ্ছে তার কোনোকিছুই প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করছে না।এর মাঝে অতিপ্রাকৃত কিছুও নেই।সবই আমাদের দেখার ভুল।
নাচতে নাচতে নাচতে চলে এলাম আমার বন্ধু হাদার কাছে।এবং তাকে সবটা বুঝিয়ে বললাম।ও প্রথমে না মানলেও পরে বিশ্বাস করেছে।
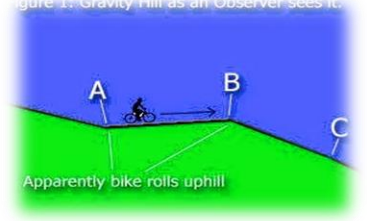
যখন ভূত তাদের আসল চাকরি হারায়

জীবপ্রযুক্তি: মানব থেকে অতিমানব

ওয়ালিন আহমেদ

বিবর্তনের পথ ধরে আজকের অবস্থানে আসতে মানুষের কোটি কোটি বছর লেগেছে।প্রকৃতির খামখেয়ালিপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ বিবর্তিত হয়েছে।ফলে কাঙ্খিত- অনাকাঙ্খিত অনেক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে এসে গেছে। তাই প্রাণঘাতী ক্যান্সার থেকে শুরু করে অবিকশিত মস্তিষ্ক, সবই যেন প্রকৃতির দৈবখেলা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন মানুষের সামনে অগ্রগতির নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। জীববিজ্ঞানে অসাধারণ অবদানের ফলে আজ জীবন প্রযুক্তির মতই নির্মাণ ও উন্নয়নে সক্ষম। তাহলে কেমন হতে চলেছে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবপ্রযুক্তির হাত ধরে?

মানুষের বিবর্তন এখনও হচ্ছে।কিন্তু ক্ষুদ্র সময়সীমায় এটি লক্ষ করার মতো না।তবে যতটুকু ধারণা করা হয়, মানুষের শরীরে পরবর্তী লক্ষণীয় পরিবর্তনটি যতটা না জৈবিক তার চেয়ে বেশি প্রযুক্তিগত হবে।এই পরিবর্তন আমাদের পরিচিত জীববিজ্ঞানের সাথে একেবারেই খাপ খাবে না।মানুষ পরিণত হবে অতিমানবে। এই প্রক্রিয়াটি ৩ ভাবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Biological Engineering বা জৈবপ্রযুক্তি: মানুষ সভ্যতার শুরু থেকেই জেনে - না জেনে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে ফসলের কলম করে, পশুপাখি প্রক্রিয়াজাত করে।কিন্তু মানুষের উন্নোয়নে এটি অচিন্তনীয় সম্ভাবনা এনেছে এই শতকে। জৈবপ্রযুক্তির অভিসম্ভাবি যেই প্রক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। CRISPR এর মতো জিন এডিটিং প্রক্রিয়া দিয়ে সহজেই মানুষ যেকোনো আক্রান্ত বা বংশগত রোগ নিরাময় করতে পারবে। এই পদ্ধতিতে DNA এর মধ্যকার জিনকে পরিবর্তন- প্রয়োজনে অপসারনও করা যায়। জিনগত প্রাণঘাতী রোগ ক্যান্সার, এইডস, ফ্লু এমনকি চলমান করোনাভাইরাসও এই পদ্ধতিতে নিরাময় সম্ভব।কিন্তু এটি এখনও শৈশবে রয়েছে যা ভবিষ্যতে জৈবপ্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটাবে তাহলে মানুষ কি শুধু রোগ নিরাময়ের জন্যই এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে? না।জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে মানুষের ফটোশপের সাথে কল্পনা করতে পারেন।নিজের ইচ্ছেমত মানুষকে ডিজাইন

করবেন এটি দিয়ে।ইতিমধ্যেই CRISPR প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুর মধ্যে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা গেছে।CRISPR দিয়ে মানুষ উন্নত শিশু জন্ম দিতে পারবে যার বুদ্ধিমত্তা এবং দৈহিক শক্তি অন্যদের চেয়ে বেশি ও উন্নত হবে।শুধু এখানেই না, বার্ধক্যজনিত মৃত্যুকেও বুড়ো আংগুল দেখানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছে জৈবপ্রযুক্তি।একজনের দেহের জৈবিক কোনো ত্রুটি সারিয়ে দিয়ে তাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা যাবে [4]।তাই মানুষের হাতে যখন মানুষকে প্রোগ্রাম করার কোড(DNA) এডিট করার সুযোগ এসে গেছে, এর মাধ্যমে জেনেটিকালি মডিফাইড মানুষ বানানো এখন শুধু সময় ও আইনের দাবি।

Cyborg Engineering বা যন্ত্রমানব: সাইন্সফিকশনে Cyborg খুবই কৌতূহল উদ্দীপক চরিত্র।মানুষ যন্ত্রের সাথে এক হয়ে পরিণত হয় অতিমানবে।কিন্তু এই প্রযুক্তি বর্তমানে মানুষের হাতের নাগালে এসে গেছে আর অনেকেই এর ব্যবহার করছে। ৫,০০০$ থেকে ৫০,০০০$ এ আপনিও একটি যান্ত্রিক হাত- পা লাগিয়ে নিতে পারবেন। প্রস্থেটিক (Prosthetic) বা বায়োনিক(Bionic) এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে অনেক পঙ্গু মানুষ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে।রোবটিক কঙ্কাল, কৃত্রিম হৃদপিণ্ড, স্মার্টফোন নিয়ন্ত্রিত হাত- পা, মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত পা ইত্যাদি যান্ত্রিক অঙ্গ এখন বাজারে পাওয়া যায়।এগুলো হয়ত আপনাকে সত্যিকার অঙ্গ সঞ্চালনের অনুভূতি দিবে না, কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়ন থেমে নেই।এরই মধ্যে এমন যান্ত্রিক হাত বানানো হয়েছে যা আপনাকে স্পর্শের অনুভূতি দিবে।তাহলে এই প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ কী? একদিন হয়তো আপনি ঢাকায় বসে আপনার মালয়শিয়াতে থাকা হাত নিয়ন্ত্রণ করবেন।আমেরিকার ডক্টর আফ্রিকায় বসে ইন্ডিয়াতে অপারেশন চালাবেন।অথবা কোনো যান্ত্রিক পর্টে হাত সংযুক্ত করে সম্পূর্ণ মানসিকভাবে নিজের অঙ্গের মতই একটি যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবেন।আর হাত- পা শুধু দুইটাই কেন, আরো কয়েকটা লাগিয়ে নিতে পারবেন।কোনো জন্মগত অঙ্গ পছন্দ হয় না? বাজার থেকে আরো উন্নত একটা মস্তিষ্ক বা চোখ কিনে এনে লাগিয়ে নিবেন।আপনার রক্তের জীবাণু-যোদ্ধা শ্বেতকনিকার পরিবর্তে কাজ করবে ক্ষুদে ন্যানো রোবট।এইদিকে বিবেচনা করলে সত্যিই মানুষের জীববিজ্ঞান যন্ত্রবিজ্ঞানের সাথে মিশে গিয়ে অতিমানবের জন্ম দিবে।

Engineering of Non Organic life বা অজৈব জীবন: গুগলের কাছে জীবনের সংজ্ঞা জানতে চাইলে গুগল বলবে:

“The condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death.”

কিন্তু এখন এমন এক সময় এসেছে যে আমাদেরকে হয়তো জীবনের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা লাগবে।বদলাতে হবে জীবের পরিচিত বৈশিষ্ট্যও। কেননা জীবন আজ জৈবিক উপাদানকে ছাড়িয়েও জড়বস্তুর মাঝে বিস্তৃতি লাভ করছে। অতিউন্নত কম্পিউটার প্রযুক্তি এখন শুধু মানুষের হাতেগোনা নির্দেশনার অপেক্ষাতেই বসে থাকে না, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নিজের মতো কাজ সম্পাদন করে।এমনকি মানুষের বুদ্ধিকে টেক্কা দিতে পারার মতো কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেছে।গুগলের Deep Mind, আইবিএম এর Watson এবং Deep Blue মানুষকে বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে।এতকাল মানুষের নিজেদের "সচেতনতা" নিয়ে দম্ভ ছিল। এই "সচেতনতা" মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে উপরে রাখতো।কিন্তু এখন এমন রোবটও তৈরি করা হয়েছে যে নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখে ও নিজের চারপাশকে উপলব্ধি করতে পারে।স্যামসাং কোম্পানির উদ্ভাবিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ভার্চুয়াল মানুষ 'NEON'-কে আপনি আসল মানুষ থেকে আলাদাই করতে পারবেন না।তাহলে এখন কল্পনা করুন এই প্রোগ্রামগুলিকে সমন্বিত করে একটি রোবটের ভিতর পুরে দিলে সেটি কতটা বুদ্ধিমান ও "সচেতন" হবে? বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনার চেয়ে বেশি আপনার পছন্দ সম্পর্কে অবগত।গুগলে সার্চ থেকে শুরু করে ফেসবুকের অ্যাড, এসবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আপনার সামনে আপনার পছন্দমত আনা হয়। এমন উন্নত প্রোগ্রামগুলো আত্মসচেতন একটি রোবটের মস্তিষ্ক হয়ে উঠলে রোবটটি কি নিজেকে মানুষের মতই স্বতন্ত্র সত্তা মনে করবে না? তখন কি উঠে আসবে রোবটের অধিকারের কথা? জীবন কি তাহলে সত্যিই জৈবিক নিয়ম ছাড়িয়ে যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করতে শুরু করবে? আমরা জানি না।আমরা এখনো এই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত নয়। তবে আমাদের সামনে বিজ্ঞান যে অনেক অভূতপূর্ব সম্ভাবনা নিয়ে আসতে যাচ্ছে তা বোঝার অবকাশ রাখে না।

সবশেষে এটি পরিষ্কার যে মানুষ একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।সামনের দশকের পরিবর্তনগুলো শিল্পবিপ্লবের চেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর এবং প্রকৃতির চেয়েও বেশি সচরাচর হবে।তবে এই নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনও অনেক অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন আনবে।কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কখনো থেমে থাকবে না।এর হাত ধরে আসবে উন্নয়ন- মানুষের জীবনে ও জীবের মৌল ভিত্তিতে।পরিবর্তিত হবে সমাজব্যবস্থা।এসবই নির্ভর করবে মানুষের উদ্দেশ্যের উপর।

৪৭/২ তেজতুরি পাড়ার ভূতুড়ে বাড়ি

নাঈম হোসেন ফারুকী

আমি অতিপ্রাকৃত জিনিসকে অপ্রমাণিত মনে করি। তার পরও এসবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি।কোনোদিন নিজ চোখে ভূত দেখার সৌভাগ্য হয় নি।ব্যাপারটা ভালো হলো না।এত বড় হয়ে গেলাম, একটা ভূতও দেখলাম না, এটা ঠিক না।

একটু আগে বললাম অতিপ্রাকৃত জিনিস প্রমাণিত না।তাহলে ভূত দেখা কীভাবে সম্ভব?
অনেকভাবে।
১. পুরোনো অনেক বাড়িতে ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড থাকে, সেটা যেভাবেই হোক না কেন। সেই জিনিস সরাসরি কর্টেক্সে ভয়ের অনুভূতি জাগায়।
২. ইনফ্রাসনিক শব্দ। অনেক উৎস থেকে বিশ হার্জের কম কম্পাঙ্কের শব্দ বের হয়।মানুষের মনে ভয়, অস্বস্তি, পরে তীব্র আতঙ্ক যোগায়।
৩. বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মানুষ হ্যালুসিনেট করে। ভুলভাল দেখে।
৪. উপরের পয়েন্টগুলো আসলে ভুল।ওই বাড়িতে আসলেই কিছু আছে।

দুই দিন আগে ভরা জ্যোৎস্না রাতে উল্কা বৃষ্টি দেখতে যেয়ে আমার ভাইয়ের মাথায় ভূত দেখার ভূত চাপে।আমিও রাজি হয়ে যাই। শুরু হয়ে যায় নেটে খোঁজাখুঁজি।ঢাকা শহরের ইট কাঠ পাথরের নিষ্প্রান জঙ্গলের মধ্যেও কিছু কিছু বিলুপ্তপ্রায় ভূত ঠিকই আস্তানা গেড়েছে দুই চারটা হাতে গোনা ভূতুড়ে বাড়িতে - শুনে স্বস্তি পেলাম।বিরল প্রজাতির এই প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত।

যাই হোক, ঘাটাঘাটি করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো পশ্চিম তেজতুরী পাড়ার ৪৭/২ নম্বর বাড়ি।ঠিক হওয়ার কারণ (নেটে প্রাপ্ত ভিডিও অনুযায়ী):
১. এই বাড়ি পরিত্যক্ত।ঢুকা যায়।
২. ১৯৭১ সালে এখানে নরহত্যা ঘটেছিল বলে ভিডিওতে আছে।
৩. ১৯৭৫ সালে এখানে কেউ সুইসাইড করেছিল।
৪. বাড়িতে পাখ পাখালির মৃতদেহ নাকি পড়ে থাকে।অনেকের ধারণা এখানে প্রেত সাধনা হয়েছিল কখনো। পাখি জবাই করে শয়তানের পূজা।
৫. তেলাপোকা ছাড়া আর কোন পোকা বাড়িতে থাকে না।
৬. ছবিতে ভূত ধরা পরেছে।দুই জায়গায়।

সবকিছু শুনে আমি আর আমার ভাই রওনা দিলাম।খুব বেশি প্ল্যান প্রোগ্রাম নাই। amazon.com এ নানান ধরনের ভূত ধরার যন্ত্র পাওয়া যায়। আশেপাশের তাপমাত্রা, বিকীরন এসব মেপে সেগুলো কটকট করে উঠে ভূতের উপস্থিতি জানান দেয়। সেই জিনিস আনতে পারলে জোস হতো, প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটর ভাব চলে আসত, কিন্তু অতো ধৈর্য্য ধরলো না। দুইশো টাকার একটা টর্চকে সঙ্গী করে, সাহসে ভর করে রওনা দিলাম। রাত নয়টার দিকে নির্জন বাড়িতে ভূতকে যত না ভয়, তার চেয়ে বড় ভয় কিন্তু গাঞ্জাখোড় আর মাস্তানদের।

যাই হোক, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তেজতুরী পাড়ার সেই বাড়িতে পৌঁছলাম।বাড়িটা আসলেই আছে।অনেকদিন আগের।জায়গাটা ঠিক নির্জন না, উল্টা পাশেই মানুষের বাসা। বাড়ির বাইরে দুই তিনটা জানালা। একটা রুমের জানালা ইট দিয়ে বন্ধ। একটা খোলা, ভেতরে দেখা যায়।কিন্তু সেটা অন্য রুমের।ভেতরে ঢোকার দুইটা পথ, একটাতে তালা দেওয়া, আরেকটাতে জং ধরা পাল্লা শক্ত করে লেগে আছে।হতাশ অবস্থা।

ফিরে আসবো, এই সময় আমার ভাই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে,

অন্য মানুষের বসবাসের জায়গার ভেতর দিয়ে মেইন বাড়িতে ঢুকার পথ বের করল। (রাইট, নিচতলায় মানুষ রান্নাঘর বসিয়েছে)।এক গাদা ময়লা আবর্জনা পেরিয়ে, প্যাঁচপ্যাচে ভাঙ্গা কাঠের মরমরানি সহ্য করে ছোট একটা খোড়ল দিয়ে সিড়ির গোড়ায় পৌঁছলাম। এই বাসাটা কিন্তু পুরাপুরি অন্ধকার, লাইট বলতে ওই দুইশো টাকার টর্চ।

সমস্ত বাসা অসম্ভব নোংরা।ইট কাঠ পাথর স্তুপ করে আছে এখানে ওখানে।তুলা, তোষক আরও অনেক কিছু আছে।এখানে ওখানে গাছপালা, শিকড়।তেলাপোকা দেখি নি, তবে অনেক মাকড়সার জাল আছে।কোথাও কোন মরা পাখি নেই।পুরনো বাথটাবে ছড়িয়ে আছে তুলা, ইট, পাথর।প্রচুর ছেঁড়া কাপড় এখানে ওখানে ছড়ানো।

ছাদে গেলাম। কাটাগাছের জন্য ছাদে যাওয়া যায় না। পুরো সিড়িতেই গাছ হয়েছে নানান জাতের। নিচতলায় যে রুমের জানালাটা ইট দিয়ে বন্ধ সেই রুমে ঢুকার পথ পাই নি। কোন কারণে হয় সবগুলো পথই ইট দিয়ে বন্ধ, অথবা পথ থাকলেও আমরা খুঁজে পাই নি।

বাসাটা বেশি বড় না।যতক্ষণ ছিলাম কোন অস্বস্তি বোধ হয় নি। তবে প্রচণ্ড নোংরায় বিরক্ত লাগছিল। নেটওয়ার্ক ভালো ছিল, সমুদ্রের সাথে কয়েকবার ভিডিও কল করেছি।আমার ভাই ভিডিও রেকর্ড করেছে, পরে ইউটিউবে দিলে শেয়ার দিবো। আপাতত ছবিগুলোই দেই।

এই বাসা বেশিদিন টিকবে না।বড় বিল্ডিং এর পোস্টার ঝুলছে এর গায়ে।ভেঙ্গে ফেলবে।কোনোদিন কি এই বাসায় আসলেই কিছু হয়েছিল? জানি না। সত্যি বলতে কি, পরিত্যক্ত একটা ভূতুড়ে বাসাকে ঘিরে নানান জাত বেজাতের ভূতুড়ে গল্প ছড়ানো খুবই সহজ।

শুভ সালাউদ্দীন

বই: অলৌকিক নয় লৌকিক (প্রথম খন্ড)
লেখক: প্রবীর ঘোষ

Personal Rating: 9/10

প্রবীর ঘোষ এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম।ভারতীয় উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন রকমের অলৌকিক বিষয়ের উপর ছিল প্রবল আগ্রহ। ছোট থাকতেই বিভিন্ন বাবাজি, সাধুর জাদু কৌশল শিখে ফেলে বন্ধুদের চমক দেখিয়েছেন। ১৯৮৫ সালে তার সমমনাদের নিয়ে গড়ে তোলেন "ভারতীয় বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী সমিতি"।

কুসংস্কার শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই দারুণভাবে বিরাজমান। সাধারণ কৃষক থেকে তথাকথিত শিক্ষিত লোকও এটার শিকার।কোটি কোটি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতার বড়ই অভাব। কেমিস্ট্রিতে অনার্স করা লোকের হাতে তাবিজ দেখা যায়, ফিজিক্সের মাস্টার্স করা ছাত্র বিশ্বাস করে থানকুনি পাতা খেলে করোনা চলে যাবে। "লালসালু" উপন্যাস ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত, এখান থেকে এমসিকিউ আসলে ঝটপট উত্তর দিয়ে দেয় কিন্তু এটাকে উপলব্ধি করেনা।

বইটিতে লেখক বিভিন্ন সময়ে, নানাধরনের আধাত্মিক গুরুর দাবি করা অলৌকিক কাহিনীর কৌশল ফাঁস করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে । প্রয়োজনে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে গিয়েছেন সত্যের সন্ধানে। ব্রহ্মচারী বাবা, সাঁই বাবা, অতিন্দ্রিয় ক্ষমতার তান্ত্রিক, ফকির বাবা, ফুঁ বাবা, ডাব বাবা সহ আরও বিভিন্ন বাবা যে মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন লেখক।তার ছেলেবেলায় পাশের এলাকায় একবাড়িতে এক তান্ত্রিক ভূত তাড়ানোর জন্য এসেছে এবং তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন-কাঠ,পাটকাঠি, বেলপাতা,ঘিয়ের টিন আরও দ্রব্যসামগ্রী তার সামনে রাখা।বাটির উপর রাখা পাটকাঠির উপর হাত নাড়িয়ে "মা, মা " বলতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। আসলে এখানে কান্ড হয়েছিল যে তান্ত্রিকের বাটিতে কিছুট পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট($KMnO_4$) ছিল আর হাতের আঙ্গুলের খাঁজে ছিল গ্লিসারিনের ড্রপার। হাত নাড়ানোর ভান করে গ্লাসারিন ছিটাতেই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংঘটিত হয়। অক্সিডাইজিং বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জৈব যৌগ গ্লিসারিনের সংস্পর্শে আসলে তাপউৎপাদী বিক্রিয়ায় আগুন জ্বলে ওঠে।এরকম সাধারণ কিছু বিষয়ের মাধ্যমে লোক ঠকানোর প্রচুর ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

তারপরে পথে ঘাটে, রাস্তায়, অলিতে-গলিতে যে অষ্টধাতুর আংটি বিক্রি করতে দেখা যায় সেটা আসলে ভাঁওতাবাজি কিন্তু অনেকেই তো প্রচার করে এতে কাজ হয় এর কারণ কি? মূল বিষয় হলো ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনের কোনো কাজ হয় না কিন্তু ১ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাক্তারের ঔষধ খেয়ে কাজ করেছে কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের কারণে মনে করে আংটি কাজে দিয়েছে আর সেটাই প্রচার করতে থাকে।মজার বিষয় হলো মানুষ বিশ্বাসও করে নেই। ব্যবসা রমরমা।

টেলিপ্যাথি, টেলিকাইনেটিকস, হ্যালুসিনেশন, ডিলিউসন, প্যারানয়া,থট রিডিং,পূর্বজন্ম, প্লানচেটসহ আরও অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন আর তার সাথে ছিল মজার মজার সব অভিজ্ঞতা।তিনি চ্যালেন্জ করেছিলেন কোনো ব্যক্তি তার জীবিত অবস্থায় অলৌকিকতার প্রমাণ দিতে পারলে বিশাল অংকের(বর্তমানে ২.৩ মিলিয়ন রুপি) ভারতীয় মুদ্রা পুরস্কৃত করা হবে এবং যুক্তিবাদী সমিতির সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে।১৯৮৫ সাল থেকে এখনও কেউ চ্যালেন্জ নিতে রাজি হয়নি। এখন পর্যন্ত বইটার পাঁচ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এটা হলো প্রথম খন্ড।আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে বইটা পড়ে বোর হবেন না।

"যারা কুসংস্কার দূরীকরণের কথা উঠলেই বলে,"আগে চাই শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষাই কুসংস্কার দূর করবে" তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, শিক্ষা বিস্তারের অর্থ শুধু বইয়ের পড়া মুখস্থ করা নয়, কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারের অঙ্গ।অশিক্ষা দূরীকরণের চেয়ে বড় শিক্ষা কি আর হতে পারে?"

-প্রবীর ঘোষ

মাইন্ড ওভার ম্যাটার অর মাইন্ড ইজ ম্যাটার?

টেলিপ্যাথি ও ইএসপি

মনিফ শাহ্ চৌধুরী

১.

আধো আলো আধো অন্ধকার একটা ঘর। আসবাব বলতে শুধু একখানা টেবিল আর একটা চেয়ার।চেয়ারে যিনি বসা তার দু হাত টেবিলে রাখা, চোখ বাধা, উপরন্তু চোখে অর্ধডিম্বাকৃতির দুটো অস্বচ্ছ প্লাস্টিক দেয়া যাতে লোকটা কিছু দেখতে না পারে।মাথার ওপর একটা লাল আলো, আর সাউন্ডবক্সে হোয়াইট নয়েজ। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ।

লোকটা অপহৃত না।তার হাত বাধা না।তবে তিনি একটা পরীক্ষার অংশ। তার সামনে টেবিলে পচিশটা কার্ড আছে। তাকে এই কার্ডগুলো থেকে পাচটা কার্ড নিজের ইচ্ছেমত বেছে নিতে হবে। তবে এখনই নয়।পাচ মিনিট পর।

অপর ঘরে তারই মত আরেকজন ব্যক্তি বসে আছেন যার কাজ হল উনি কোন কার্ডগুলো বেছে নিয়েছেন সেটা অনুমান করা।তবে এখানে ছোট্ট একটা টুইস্ট হল, অপর ঘরের ব্যক্তিটি আগেই অনুমান করবেন যে এই ব্যক্তি কোন কার্ডগুলো বেছে নেবেন। ওনার অনুমান শেষ হলে এই ব্যক্তি কার্ডগুলো পছন্দ করবেন। উক্ত সময়ে কেউ কারো সাথে কোনো ধরণের যোগাযোগ করবেন না।

দ্বিতীয় ঘরে যে আছেন তিনি একজন স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ।তিনি দাবী করেন তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বা Extrasensory perception আছে।সেটা পরীক্ষা করার জন্যেই প্রফেসর জন এনেট এসব ব্যবস্থা করেছেন।

২.

এই ইএসপি কী? একে ভাল্ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে বলা যায়, এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন হল এমন অনুভূতি বা কার্যসম্পাদন যার জন্য পঞ্চইন্দ্রিয়র বদলে শুধু মন বা মানসিক শক্তি ব্যবহার হয়।ESP-কে সহজে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

Clairvoyance: এখানে দুটি ফ্রেঞ্চ শব্দ আছে। Clair অর্থ clear বা পরিষ্কার, আর voyant অর্থ দেখা।এই ক্ষমতাবলে মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার না করেই কোনো নির্দিষ্ট জিনিস বা জায়গা সম্পর্কে তথ্য জানতে পারে।

Psychokinesis: টেলিকাইনেসিস এটার অংশ। মুভিতে অনেক দেখে থাকবেন মনের "শক্তি" ব্যবহার করে কোন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা।

Precognition: সহজার্থে ভবিষ্যৎ বলতে বা দেখতে বা সঠিকভাবে অনুমান করতে পারা।হাত দেখা, রাশিচক্র, কার্ড দেখে ভাগ্য নির্ণয় সবাই এই ক্ষমতার দাবী প্রত্যক্ষ কীংবা পরোক্ষভাবে রেখে থাকেন।

Telepathy: সবচেয়ে বহুল পরিচিত এবং ভুল ধারণাকৃত শাখা মনে হয় এটা।মনের কথা পড়তে পারার ক্ষমতা।অনেকে মনে করেন এটার সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে এবং এটা বিজ্ঞানস্বীকৃত।

এবার বিস্তারিত কথা বলা যাক।কোনো দাবী বিজ্ঞানে স্বীকৃত হতে হলে সেটাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মেনে এমন একটা নির্ভরযোগ্য ফলাফল দিতে হবে যেটা পরীক্ষাটা পুনরাবৃত্তি করলেও প্রায় একই ফল পাওয়া যাবে।

শুরুতে যেই পরীক্ষার কথা বলেছিলাম সেটা precognition প্রমাণ করার জন্য।একই পরীক্ষা clairvoyance এর জন্যেও করা সম্ভব।এমনই এক পরীক্ষা করেছিলেন JB Rhine ১৯৩০ এর দিকে Duke University তে।তার এই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট যদিও মিশ্রিত ছিল এবং পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক কোনো প্রক্রিয়া মেনে করা হয়নি তবুও সেটা তার নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

একই পরীক্ষা ১৯৩৬ সালে Princeton University তে WS Cox করেন।তার ১৩২ জন সাবজেক্ট এর মধ্যে ২৫,০৬৪ টা কার্ড পরীক্ষা করা হয়।পরীক্ষায় কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য

পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে E.T. Adam, J.C. Crumbaugh, C.P. Heinlein ও R.R. Willoughby আলাদা আলাদাভাবে এক্সপেরিমেন্টটি পুনরায় করেন এবং সকলেই কক্সের সাথে এবিষয়ে একমত হন যে অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার পক্ষে কোনোই প্রমাণ পাওয়া যায়নি। J.B. Rhine এর এক্সপেরিমেন্টের ফল সেরকম আসার একমাত্র কারণ হল রাইন অনেক ফ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ করেননি এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মেনে তার এক্সপেরিমেন্ট সাজাননি।

৩.
বৃদ্ধ পিয়ার্স তার ছেলে জনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বলে দিলেন যে তিনি জনের অহেতুক রিসার্চের জন্য ব্যবসা থেকে আর অর্থ খরচ করতে দেবেন না।জনের উচিৎ এসব ফালতু ব্যাপারে পয়সা নষ্ট না করে কোন সত্য বিজ্ঞানভিত্তিক কাজে মন দেয়া আর নয়তো শুধু ডাক্তারি চেম্বার খুলে সকাল বিকাল রোগী দেখা।
মাথা নিচু করে বাবার আবেগহীন ব্যাঙ্গাত্বক কথাগুলো শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রফেসর সার্জন জন এনেট। তার মনে কী কোনো ক্ষোভ তৈরী হচ্ছে? নাকি হতাশা? সে প্রমাণ করেই ছাড়বে অতীন্দ্রীয় ক্ষমতা আসল এবং মানবকল্যাণস্বার্থে এটার পেছনে বিজ্ঞানের অবশ্যই সময় দেয়া উচিৎ।বিংশ শতাব্দীর মত আবার সবার মনোযোগ এদিকে ফেরাতেই হবে!

৪.
সন ১৯৮০
জেমস হাইড্রিক। পুরো বিশ্ব তাকে এক নামে চেনে। কী অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষটার।শুধুমাত্র নিজের মনের শক্তি দিয়েই সে নষ্ট ঘড়ি ঠিক করতে পারে, চামচ বাকা করতে পারে।বই না ছুয়েও বইয়ের পাতা ওল্টাতে পারে।আজ ইনি এক সুপরিচিত টেলিভিশন শো তে আমন্ত্রিত।
শোয়ের নাম "দ্যাট'স মাই লাইন"।জেমস র‍্যান্ডি- যিনি এসবে বিশ্বাস করতেন না- বইয়ের পাতার ওপর ছোট ছোট ফোমের টুকরো রেখে দিলেন।উদ্দেশ্য? হাইড্রিক যদি কোনো চাতুরি করে ফু দিয়ে পাতা ওল্টানোর চেষ্টা করেন তাহলে সবার আগে পাতা ওল্টানোর বদলে ফোমের টুকরোগুলো সরে যাবে। প্রমাণ হয়ে যাবে হাইড্রিক একজন ফ্রড।

হাইড্রিককে সব জানানো হল।বলা হল এখন মনকে ব্যবহার করে পাতাখানা ওল্টাও দেখি।হ্যাড্রিক বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হতে লাগল, উপস্থাপক, দর্শক, সবাই আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন আর হাইড্রিক একেবারে জবুথুবু হয়ে বসে থাকলেন।এরপর বললেন আজ কেন জানি তার ক্ষমতা ঠিক কাজ করছে না।অন্যদিন চেষ্টা করবেন।

পরে অবশ্য হাইড্রিক স্বীকার করেছিলেন যে তার কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি নেই।তিনি একজন ধোঁকাবাজ।

চামচ কীভাবে বাকিয়ে ফেলতেন? চামচের সবচেয়ে দুর্বল অংশে ঘষে ঘষে অল্প তাপ আর অল্প আঙুলের বল ব্যবহার করে একটু একটু করে বাকানো হয়।এসময় ম্যাজিশিয়ান কথা বলতে থাকেন আর দর্শকদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখেন। যখন যথেষ্ট বাকা হয়ে যায় ম্যাজিশিয়ান সেটা এমন এঙ্গেলে ধরেন যে মাধ্যাকর্ষণই যথেষ্ট হয় সেটাকে বাকা করে ফেলতে।

অনেক ম্যাজিশিয়ান গ্যালিয়ামের তৈরী চামচ ব্যবহার করতেন। গ্যালিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট শরীরের তাপমাত্রার কাছাকাছি।

এখানে নোট করা জরুরি যে সব ম্যাজিশিয়ানেরই মুলতন্ত্র হচ্ছে দর্শকের মনোযোগ অন্যত্রে সরিয়ে রাখা।

৫.
অনেক বছর পর।
প্রখ্যাত প্রফেসর এবং সার্জন জন এনেট এক লাইভ টেলিভিশন টক শো তে আমন্ত্রিত।টকশো তে আরো আছেন নিউরোস্পেশালিস্ট হ্যারি মজুমদার এবং প্রখ্যাত ডিবাঙ্কার পায়াম গোলশামি।

উপস্থাপক শুরু করলেন জনকে দিয়েই।কীভাবে জন কয়েক বছর আগে তার পারিবারিক ব্যবসার একাংশ বিক্রি করে নিজের ব্যক্তিগত রিসার্চ ইউনিটে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে রিসার্চ করতেন, এবং কীভাবে তিনি এখনও এ বিষয়ে যথাযত কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি।
জন খুবই ধৈর্যের সাথে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সে জানত আজ তাকে এখানে নানান কথা শুনতে হবে।তবে পৃথিবীর সবার কাছে পৌছানোর এই প্ল্যাটফর্ম সে খুব কমই পাবে।

-"প্রফেসর, আপনি গত কয়েক বছর ধরে দাবী করে আসছেন যে আপনার Precognition বা ভবিষ্যত দেখতে পারার ক্ষমতা আছে।এবং আপনার বেশ কিছু অনুমান সঠিকও হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অভিনেতা উইকের সেই মর্মান্তিক এক্সিডেন্ট, বা রাজনীতিবিদ খানের ইলেকশনের হার।এমনকি কৃষক আর্থারের

খামারে দামী কিছু থাকা।এ ব্যাপারে কিছু আমাদের জানাবেন কী?"

-"আসলে, আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। ব্যাপারটা স্বপ্নের মত।আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।আমি হঠাৎ কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যৎ দেখতে পারি এবং তখন তা তাকে জানিয়ে দিই। আমার আলাদা কোনোই কৃতিত্ব নেই আসলে। ব্যাপারটা পারিবারিক হতে পারে।আপনারা জানের বিখ্যাত লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের দ্বিতীয়া স্ত্রী, লেডি জিন এনেটের ঘরের বংশধর আমি।আর কে না জানে লেডি জিনের মৃতের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা ছিল।'

-'আর সেজন্যেই আপনি আপনার পিতাপ্রদত্ত পদবি বদলে নিজের নামের শেষে এনেট রেখেছেন?"

-"জ্বী, অবশ্যই।তার সম্মানার্থে।'

-"মাফ করবেন প্রফেসর।' পায়াম গোলশামি তার মাথার সেলাই করা অংশে হাত বুলাতে বুলাতে শুরু করলেন।"লেডি জিনের সম্মানার্থেই বলছি, উনি যে ছলচাতুরি করতেন, বিভিন্ন তার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহার করে সবাইকে ধোকা দিতেন এটা অনেক আগেই প্রমাণিত।এমনকি তিনি হ্যারি হুডিনিকেও বোকা বানাতে পারেননি।'

-"আপনি এভাবে বলতে পারেন না।তার দ্বারা অনেক দু;খী মানুষ তাদের মৃত আত্নীয়দের সাথে কথা বলেছেন। দ্যাট ইজ আ হিস্টোরিকাল ফ্যাক্ট!" জন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

-'আর আপনার কথাই বলি।অভিনেতা উইক যে মদ্যপ হয়ে প্রায়ই গাড়ি চালাতেন এটা কে না জানে? ওনার এক্সিডেন্ট করার কথা না তো কার? আর রাজনীতিবিদ খানের ব্যাপারটা।পরিসংখ্যানের ডাটা ঘেটে একটু প্যাটার্ন দেখলেই হয় যে ওনার জনপ্রিয়তা বিগত বছরগুলোতে কীভাবে কমেছে। একটা বাচ্চাও বলতে পারত এবারের ইলেকশন উনি হারবেন।আপনি হাসালেন প্রফেসর! জোকারের মত!"

জনের মাথায় আগুন ধরে গেল। রাগে কাপতে লাগলো। রক্তিমবর্ণের চোখের দিকে তাকালে যে কেউ ভয় পেয়ে যেত। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। এরপর প্রফেসর জন ভারী কন্ঠে বললেন,-
"পায়াম, আমি আপনার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।আপনার ঘাড়ের ওপর মাথা নেই।চারিদিকে রক্ত আর রক্ত।'

হো হো করে হেসে উঠলেন পায়াম গোলশামি এবং হ্যারি মজুমদার। উপস্থাপক একটু বিব্রত হলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জনকে শান্ত হতে বললেন।হঠাৎই জন টেবিলে জোরে ঘুষি মারল।আর অমনি আশে পাশের লাইটগুলো বিস্ফোরিত হল।

সবাই চুপ।সবার দৃষ্টি জনের দিকে।জন তার হাত ধীরে ধীরে উঠালো। দর্শকদের সিটের সামনে রাখা ড্রামের দিকে হাত প্রসারিত করল।হাতের মুঠি আস্তে আস্তে বন্ধ করতে লাগল।এবং হটাৎই একমুহুর্তের ভেতর হাত বন্ধ করে ফেলল।

অমনি ড্রাম দুমড়ে মুচড়ে গেল! যেন কোনো বিশাল শক্তিশালী দানোর হাত ড্রামটা ধরে ভেঙে দিয়েছে।

এবার সবাই ভয় পেয়ে গেল।পায়াম গোলশামিই একমাত্র যে অপ্রস্তুত হল না।"আরেহ বাহ প্রফেসর! বিনা টিকিটে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন দেখি!"

জন শান্ত অথচ ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে পায়ামের দিকে তাকাল। প্রসারিত হাতের মুষ্টি পায়ামের দিকে করে মুষ্টি খুলে ফেলল আর শুধু উচ্চারণ করল একটা মাত্র শব্দ।

"মর।'

পায়ামের মাথা বিস্ফোরিত হল।পুরো স্টেজে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। শরীরটা সিটেই বসে রইল আর গলার ওপরের ফাকা মুন্ডুহীন জায়গা থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে লাগল।

সহসাই শব্দে মশগুল হল পিনপতন নীরবতায় ডুবে গেল।

৬.
টেলিপ্যাথি কী সম্ভব?

আগে বুঝে নেই টেলিপ্যাথি কী।মনের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অন্যের মনের কথা পড়তে বা বুঝতে পারার নামই হল টেলিপ্যাথি। অনেকে এটাকে বৈজ্ঞানিক সাজ দিতে চান।তারা বলেন, এটা এমন এক ক্ষমতা যার ফলে অন্যের মস্তিষ্কের তরঙ্গ নিজের মস্তিষ্কে রিসিভ করা যায়।উদাহরণ হিসেবে বলেন মা যেমন সন্তানের মনের কথা বুঝতে পারেন, বা প্রিয় কাউকে খুব মিস করলে দেখা যায় সে ফোন দিয়েছে, এসবই টেলিপ্যাথি।
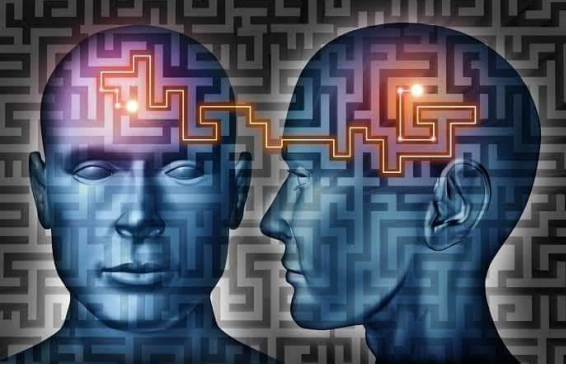
আসলেই কী তাই?

একটা বাচ্চার কখন কী প্রয়োজন এটা জানার জন্য টেলিপ্যাথির প্রয়োজন নেই।আপনি একটা বিড়াল পালা শুরু করুন ঠিক সেটার প্রয়োজন বুঝে যাবেন।কারণ আপনি তাকে বেশি বেশি দেখবেন, তার বিভিন্ন এক্টিভিটি, মুখায়ব ইত্যাদি আপনার অবতেচন মন খেয়াল করবে এবং একটা অনুবাদ দাড় করাবে। কাউকে মিস করলেই তার ফোন আসাটা স্রেফ কাকতালীয়।আপনি কখনোই একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এক্সপেরিমেন্ট করলে বিশ্বাসযোগ্য ফল পাবেন না।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে একটা অভিনব পদ্ধতিতে ইএসপির পরীক্ষা চালানো হয়।তারা ভলান্টিয়ারদের মস্তিষ্কের স্ক্যান নেন এবং দেখেন ইএসপি "ব্যবহারের" সময় তাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন কোনো পরিবর্তন আসে কী না।

তাদের নিকট আত্মীয়, মেয়েবন্ধু, এমনকি যমজ ভাইদের অন্য একটা ঘরে রাখা হয়েছিল। শুরুতে সাধারণ অবস্থায় তাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন নেয়া হয়। এরপর তাদের আত্মীয়, যারা অন্য ঘরে আছে, তাদের একটা ছবি দেখানো হয় আর ভলান্টিয়ারকে বলা হয় তার ক্ষমতা ব্যবহার করে দেখার চেষ্টা করতে যে অন্যঘরে তার আত্মীয়দের কী ছবি দেখানো হচ্ছে।
এখন যদি সত্যিই এমন কোনো ক্ষমতা থাকে তাদের তাহলে অবশ্যই তাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নে পরিবর্তন আসবে।তবে এমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

মেন্টালিস্ট বা কন আর্টিস্টরা যে বুঝাতে চায় যে তারা আপনার মনের কথা পড়তে পারে বা মনের কোনো চিন্তা বুঝতে পারে সেটা আসলে একটা এডুকেটেড গেস ছাড়া কিছুই নয়। তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক ভাল, এবং তারা অনেক সময় আপনার ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রাখে।আর এমনকি কথা বলার সময় আপনার মুখায়ব দেখেও তাদের উত্তর পরিবর্তন করতে থাকে।এটাকে ফ্রড না বলে আমার মনে হয় দক্ষতা বলা উচিৎ।

৭.
জন এবেট টকশো থেকে পালিয়ে এল।সিকিউরিটি যদিও তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল, সে হাত উচিয়ে তাদের ভয় পাইয়ে দেয়।বাইরে বের হয়েই নিজের গাড়ি নিয়ে ফুল স্পীডে রাস্তায় নেমে পরে।

নিজের রিসার্চ ইউনিটে আসে সে।সবকিছু পুড়িয়ে দেয়।এরপর একটা ভিডিও রেকর্ড করে নিজের।অতঃপর লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে নিজের মাথায় ধরে এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ট্রিগারে টান দেয় সে।

"পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য স্রেফ ইচ্ছা ব্যাতীত কিছুই না"

৮.
কারা বিশ্বাস করে ইএসপিতে? অন্তত আমেরিকার অর্ধেক জনসংখ্যা টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে এমন হাজারো মানুষের মাঝে অনেক শিক্ষিত, গণমান্য ব্যক্তি এসবে বিশ্বাস করে, কিন্তু কেন?
এটা নিয়েও গবেষণা হয়েছে।সাধারণত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, পরিবেশ, মৃতদের হারানোর বেদনা থেকে এমন জিনিসের প্রতি বিশ্বাস জন্ম নেয়।মৃত্যুর বা মৃত্যুভয়ের সাথে ইএসপিতে বিশ্বাসের যোগসূত্র প্রবল। পুরো এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল দেখার জন্য লিংক ২ এ দেখুন।

৯.
কন্সটেবল ফিদা ঘরে ঢুকেই বলল, " স্যার, আপনি দেখছি কোনো আগ্রহই প্রকাশ করছেন না প্রফেসর জন এনেটের আত্মহত্যা কেসে?"

ডিটেক্টিভ হুডিনি চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। তিনি ভিডিওটা দেখছিলেন যেটা জন মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেই রেকর্ড করেছিল।জন সেখানে বলেছে সে অনেক দেরিতে তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা জানতে পারে এবং এটা নিয়ে গবেষণা করা শুরু করে।তার অনেক ক্ষমতার মাঝে সাইকোকাইনেসিস সে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না তাই তার দ্বারা পায়াম গোলশামির মৃত্যু হয়।সে অনুতপ্ত এবং তার দ্বারা যাতে আর কারো ক্ষতি না হয় তাই সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

-"আমি কেসটা সলভ করে ফেলেছি।ব্যাটা একটা ফ্রড।'
-"কী বলেন স্যার! আপনি এখানে বসে বসে সলভ করে ফেললেন আর আমরা ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছি!"

-"কোনোটাই প্রমাণ করতে পারব না।তবে সম্পুর্ন ঘটনাগুলোকে একে অপরের সাথে সাজাতে পারব।বেশ ক'বছর ধরেই জন নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারার ক্ষমতা আছে বলে প্রচার করতে থাকে।সে নানা ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করেছে।অন্য ফ্রডদের সাথে জনের পার্থক্য হল যে তার কোনো অনুমান ভুল হয়নি কখনোই, তবে সেটা কখনোই বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।অভিনেতা উইকের এক্সিডেন্ট যে ট্রাক দ্বারা হয় তার চালক এক ভাড়াটে সন্ত্রাস।যদিও প্রমাণ করার উপায় নেই কিন্তু আমি ধারণা করছি জন তার ভবিষ্যৎবাণী করার পর ওই সন্ত্রাসকে টাকা দিয়ে এক্সিডেন্ট করতে বলে।

রাজনীতিবিদ খানের বিষয়টার ব্যাপারে আমি পায়াম গোলশারির সাথে একমত।পরিসংখ্যান রেকর্ড দেখেই বলে দেয়া যায়।আর কৃষকের ব্যাপারে যদি বলি আমি বলব জন নিজেই কৃষকের খামারে তার বংশানুক্রমে পাওয়া উনিশ শতকের সার্জিকাল জিনিসপত্র রেখে দিয়ে কৃষককে হালকা হিন্ট দেয় কোথায় খুজতে হবে।কৃষক পেয়ে যায় আর এভাবেই তার ভবিষ্যৎবাণী মিলে যায়।'

--"সেগুলো ঠিক আছে স্যার।তবে সেদিনের টকশোর ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখা করবেন?"

--"সেটারও উত্তর আছে আমার কাছে।ড্রামের ভেতর অল্প গরম পানি ছিল।আর বাইরে গায়ের সাথে লাগানো পকেটে ছিল লিকুইড নাইট্রোজেন, প্রেসারাইজড করা।পকেটে কোনো সুইচ চেপে সে প্রেসার চেম্বার খুলে দেয়।ঠান্ডা নাইট্রোজেন ড্রামের গায়ে ছড়িয়ে গেলে ভেতরের বাষ্প সংকুচিত হলে ড্রামটা মুচড়ে যায়। সেদিনের ভিডিওতে দেখোনি কেমন সাদা ধোয়াও বের হয়েছিল? উপস্থাপকের সাথে কথা বলে জেনেছি জন টকশোর আগের রাতে স্টেজে এসেছিল তবে কী কারণে সেটা বলতে পারে না।আমার ধারণা ড্রামটা তখনই সেখানে রেখে দেয়।এরপর সবকিছু স্রেফ টাইমিং আর চমৎকার অভিনয়ের ব্যাপার।'

--"আর মাথা উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটা?"

--"ফরেনসিক রিপোর্ট দেখেছ তুমি?"

--"না স্যার।আমি মাত্র আসলাম বাইরে থেকে।'

--"রিপোর্টে বলা হয়েছে মাথার ভেতরে কোনো বিস্ফোরকের মাধ্যমে মৃত্যু হয়েছে।আর ধারণা করতে পারো ঠিক কোন কেমিক্যাল পাওয়া গেছে মস্তিষ্কে?"

--"না।'

--"পটাশিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরেট, এমোনিয়াম ডাইনাইট্রামাইট।'

--"মাই গড! বোম?!"

--"ঠিক।মাইক্রো এক্সপ্লোসিভ।এতটাই ছোট যে মস্তিষ্কে লাগানো সম্ভব এবং অন্তত দুইসপ্তাহ পর থেকে পয়জনিং এর লক্ষণ বোঝা যায়।টকশোতে আসার বারোদিন আগে পায়াম গোলশারির ব্রেইন টিউমার অপারেশন হয়।আর সেদিন অপারেশনে ছিলেন জন এনেট নিজেই।আমার মনে হয় পায়াম অপারেশনের জন্য এপয়েন্টমেন্ট নেয়ার দিন থেকেই জন এসব প্ল্যান তৈরি করে। পায়ামের মাথায় ছোট্ট একটা আরসি বোম ফিট করে আর টকশোর দিনে ডেটোনেট করে।'

--"ওর উদ্দেশ্য কী ছিল?"

--"জনের মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই জন মনমরা হয়ে যায়।সে প্রাণপণে তার মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করতে চায়।তবে বিজ্ঞান এটাকে কখনোই সাপোর্ট করে না।সে নিজের পারিবারিক ইতিহাস ঘেটে লেডি জিনের ব্যাপারে জানতে পারে।সে মনে করে এসব আসলেই সম্ভব আর তাই এসবের পেছনে রিসার্চ করতে শুরু করে।বছরের পর বছর কোনো প্রত্যাশিত ফলাফল না পেয়ে মুষড়ে পরে সে।তবে সে মনে করত সমগ্র বিশ্বে সবার উচিৎ এগুলো নিয়ে গবেষণা করা তাতে কোনো না কোনো দিন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিজ্ঞান জানবে।কিন্তু বিজ্ঞানের এসব বিষয়ে থোড়াই কেয়ার দেখে সে ঠিক করে সে এমন কিছু করবে যাতে বিশ্ববাসী ইএসপিতে আবার মনোযোগ দেয়।যাতে সে বিংশ শতাব্দীর মত আবার এসব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়।একদিক দিয়ে সে হয়তো সফল।'

--"কী অবস্থা! সত্যিই, অস্কার উইল্ডির একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, 'a thing is not necessarily true..'

-"Because a man dies for it." ডিকেক্টিভ হুডিনি কথাটা শেষ করলেন।

লাশ না পঁচার কারণ

রূপক হিমকর

অনেক সময় খবরের কাগজে শিরোনাম হয় অক্ষত লাশ কবর থেকে পাওয়া গেছে।আর এই ধরনের খবরকে কেন্দ্র করে প্রায় ধর্ম ব্যাবসায়ী, কবিরাজ,ধান্ধাবাজরা ফায়দা লোটার চেষ্টা করে, কুসংস্কার ছড়ায়। কিন্তু এমন লাশ পাওয়াটা একদম সাদামাটা বিজ্ঞান দিয়েই কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়।

লাশ পঁচার জন্য পরিবেশ বহুত বড় ভুমিকা পালন করে।যেমন অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম পরিবেশ লাশ পঁচায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।কারণ অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা লাশ পঁচাতে দায়ী মথ, পোকা, অনুজীব মেরে ফেলে, অনেক সময় এরা বাইরে বের হতে চায় না।অনুকুল তাপমাত্রা না হলে লাশ সহজে পচে না।তবে অতিরিক্ত ঠান্ডা কেটে গেলে আবারও শরীর স্বাভাবিকভাবে পচতে শুরু করে কিন্তু গরমে একবার শরীর হাইড্রেট হয়ে গেলে তা মমি হয়ে যায়।

কেউ বর্ষাকালে মারা গেলে তার দেহ কিভাবে পঁচবে, দেহ ফুলে ফেঁপে উঠবে, কত গন্ধ হবে এ নিয়ে কথাবার্তা হয়।কিন্তু অনেক সময় বর্ষার পানি বা জলাভূমি বা পানি পূর্ন জায়গায় মৃত দেহ পঁচার ভিলেন হয়ে ওঠে। কারণ অতিরিক্ত পানিতে ওইসব মথ, ম্যাগেট, ব্যক্টেরিয়াগুলো জন্মাতে পারে না।পানি মাঝেমধ্যে মৃতদেহ মমি করে ফেলে। এজন্য নদীর কাছে কবর দেওয়া তাজা লাশ পাবার রেকর্ড বেশি।
মৃতদেহ পঁচাতে ম্যাগট বা ওইসব অনুজীবগুলোর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে।তাই অক্সিজেনের অভাবেও অনেক সময় লাশ পচে না।

লাশের পঁচার হার মাটির উপরও অনেকটা নির্ভর করে। যেমন মাটি লবনাক্ত হলে, বেশি পরিমাণে আর্সেনিক থাকলে মৃতদেহ প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়।মাটিতে পচনে সহায়তাকারী অনুজীব থাকার অনুকূল পরিবেশও দরকার পড়ে।এজন্য কবরস্থানে অক্ষত লাশ পাওয়া যায় না।

একজন চ্যাঙড়া বালক আর একজন ভুড়িওয়ালার মৃতদেহর ভিতর কোনটা আগে পঁচবে? ওই ভুড়িওয়ালা। কারণ যার দেহে যতবেশি অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল থাকবে সে তত তাড়াতাড়ি পচবে।সেই হিসেবে মমি হবার চান্স ওই চ্যাংড়া ছেলেটারই বেশি।এজন্য ছোট বাচ্চাদের মমি হবার চান্স বেশি।

অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই মৃতদেহ সৎকারের জন্য কাপড় বা কিছু দিয়ে দেহ মুড়ে দেওয়া হয়।এরজন্য পোকামাকড়, ব্যাক্টেরিয়া এগুলো লাশে ঢুকতে পারে না। আবার অনেকক্ষেত্রে মৃতদেহকে সাজানো হয় বিভিন্ন ক্রিম দিয়ে। এগুলোও পোকামাকড়, ব্যাক্টেরিয়াদের দূরে রাখে।এটাও একটা কারণ দেহ না পঁচার বা দেরিতে পঁচার।

মমি বা অক্ষত দেহ সাধারণত মরুভূমি, গ্লেসিয়ার, সমুদ্রে(যদি না কোন প্রাণী খেয়ে ফেলে) এমন জায়গায় বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরও প্রাকৃতিকভাবে একটা দেহ অক্ষত থাকার হার খুব কম।

পোকামানবের গল্প

মশিউর রহমান আনন্দ

পোকা খুবই ভয়ানক! যখন ডানা ঝাপটিয়ে একটা আপনার উপর এসে পরে তখন ভয় কি চিজ তা বুঝা যায়।আর বড় সাইজের পোকার তো আলাদা কাহিনী।শোনা যায় তারা বেশ সাহসী পুরুষদের গলা থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের চিৎকার বের করেছে।আর এই পোকা যখন মানব আকৃতির হয় তখন তো সবার হাত-পা কাঁপবেই।

১৯৬৬ সালে ইউএসএ এর পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে প্রথম দেখা মিলে এই পোকামানবের।এর নামটা এসেছে বেটম্যান থেকে কারণ এই প্রানীটি নাকি দেখতে "ব্যাটম্যান এর মতো" ।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এটা মানব আকৃতির, রাতে চলাচল করে, পেছনের দুপায়ে হাটতে পারে এবং খুবই টকটকে লাল রঙের চোখ।এই চোখের রঙ এক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে ' এমন লাল যে লাল তুমি কখনো দেখনি '।এর গায়ের রং কারোর মতে ছাই বর্ণের এবং কারো মতে বাদামি।এর উচ্চতা ৬-৮ ফুট!!! মানে ক্রিস গেইল থেকেও লম্বা!! আর এর পাখার দৈর্ঘ্য ৮-১৫ ফুট (ক্রিস গেইল এর ডাবল)!!

পোকামানবের একটি ছাই রঙের এবং লাল চোখের মূর্তি ঐ শহরের মধ্যে অবস্থিত যেন মানুষ বুঝতে পারে পোকামানব দেখতে কেমন।মজার ব্যাপার হলো এই মূর্তিটির সিক্স প্যাক আছে।বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের পোকামানব হরলিক্স খেয়ে বড় হয়েছে ।হরলিক্স আসলেই তোমাকে করে টলার,স্ট্রোংগার, শার্পার!!!

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পয়েন্ট প্লিজেন্টে পোকামানবকে প্রথম দেখা যায়।এর অরিজিন স্টোরিটা অন্যান্য স্টোরি থেকে এটলিস্ট আমার মতে ভালো। পয়েন্ট প্লিজেন্টের কছে এক জায়গায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা ৮,০০০ একর বড় কনক্রিট ইগলুতে টিএনটি সহ বিভিন্ন ক্যামিকেল ও বোমার হাবিজাবি জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল!!!! বিশ্বযুদ্ধের পর এটি পরিত্যাগ করা হয় এবং স্থানটি বন্য প্রাণী সংরক্ষণ অঞ্চলে পরিণত করা হয়। তখন কোনো এক পাখি/পোকা এই ক্যামিকেল এবং তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসে অক্কা পাওয়ার বদলে পোকামানবে উন্নীত হয়। যদিও এমন হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য না!!!!

মানবমন্ডলীর একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি একদল মানুষের সামনে একটা ভালো এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটাতে পারলে দেখবেন সেটা নিয়ে মানুষ একটা আলাদা উৎসব, আলাদা সংস্কৃতি তৈরি করেছে।পোকামানবের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ইউএসএ এর পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে (যেখানে প্রথম পোকামানব দেখা যায়) মথমেনিয়া নামক একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।প্রথমত সেখানে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে 'মথম্যান

ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া আছে মথম্যান গেঞ্জি, টুপি, কাপ, শার্ট, চেইন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।মজার ব্যাপার হলো এগুলো সারা বছর জুড়ে পাওয়া যায়! পোকামানবের মূর্তির পাশেই আছে 'কফি গ্রিন্ডার' যেখান পাওয়া যায় 'চকলেট মথম্যান ড্রপিংস, মথম্যান কফি, মজাদার লাল চোখা(চেরি) 'মথম্যান কুকি' সহ অনেক কিছু।'ভিলেজ পিজা' নামক রেস্তোরা তে পাবেন বিখ্যাত মথম্যান পিজা! পিজা টা পুরো পোকামানবের মতোই তৈরি করা হয়।বেসিক্যালি এই জায়াগায় 'মথম্যান' এর সাথে যা যুক্ত করবেন তাই পাবেন।পুরা বিসনেস চলছে এই পোকামানবের উপর!

এবার আসি পোকামানবের সাথে জড়িত কাহিনী গুলিতে।১৯৬৬ সালের ১৫ই নভেম্বর স্টিভ, ম্যারি, রজার এবং লিন্ডা নামক চারজন ব্যক্তি যাচ্ছি ঐ পয়েন্ট প্লিজেন্ট দিয়ে রাতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা কনক্রিট ইগলু, যেখানে টিএনটি বা বোমাবারূদ এর ক্যামিকেল গুলি রাখা হয়েছিল সেখানে একটা মানুষের মতো আকার দেখতে পায়।ঐ আকার টা হাটছিল ফলে তারা স্পষ্টই দেখতে পায় ঐ আকারটা মানুষের মতো হলেও তার কোনো হাত এমনকি মাথাও ছিলনা।এর পিঠে অনেক বড় ভাজ করা ডানা ছিল এবং ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের চোখ।তারা যখন গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তারা দেখে ঐ প্রানী টা তাদের পেছন উড় আসছে এবং তাদের সমান গতিতে উড়ে।অর্থাৎ এর গতি ছিল ঘন্টায় ১৬০ কি.মি.!!!!

মজার ব্যাপার হলো তখন নাকি এই পোকামানব ইদুরের মতো চুঁই চুঁই আওয়াজ করছিল! চিন্তা করুন এরকম ভয়ানক একটা প্রানী আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এমন আওয়াজ করছে ।তারপর তারা এই কাহিনী পুলিশকে জানায়।পুলিশ তাদের চিনতেন তাই বিশ্বাসও করলেন।পুলিশ তাদের বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে এবং আবিষ্কার করে তারা সত্য বলছে। তারা পোকামানব যেখানে দেখাগিয়েছিল সেখানে তদন্ত করে পোকামানবের পায়ের ছাপও পান।পরবর্তীতে জানা যায় লিন্ডা নাকি প্রায়ই ভৌতিক ফোন-কল পেত।সে এটাও দাবি করে তাকে নাকি 'ম্যান ইন ব্ল্যাক' রা দেখতে আসে!!!

এই ঘটনাটি পরবর্তীতে সংবাদপত্রে আসে এবং অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারপর অনেকেই দাবি করেন তারা পোকামানব দেখেছেন এবং যারা দেখেন তাদের সাথে অনেক গুলো ভৌতিক কর্মকান্ড ঘটে! যেমন হঠাৎ দরজা খুলে যাওয়া, গ্লাস ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি।

"Remember, Anything Can Be Explained Away" 'অর্থাৎ হয়তো আমরা ভূত, এলিয়েন ইত্যাদি বিশ্বাস

করতে চাচ্ছিনা তাই সব কিছুরই কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দাঁড়া করছি।

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে তারা যা দেখে এবং শোনে তা নিয়ে গল্প বানানো। আমরা যখন কোনো কিছু দেখে চট করে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে না পারি তখনই আমরা ভূত, প্রেত, কোইনসিডেন্স, এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল, ম্যাজিক এর সাহায্য নিয়ে থাকি। অনেকেই আবার যা সম্পূর্ণরূপে জানি না সেসব বিষয় নিয়েও খুব বড় বড় কথা বলে ফেলি।এসব থেকে শুরু হয় একটা চমৎকার গল্প।(চমৎকার কেননা 'Ignorance is a bliss')। আর এই গল্প থেকে জন্ম নেয় পোকামানবসহ ভূত-প্রেত সম্পর্কিত বেশিরভাগ কাহিনী।

যারা পোকামানবকে সত্য মনে করেন তারা এই আর্টিকেল না পড়লেই ভালো।না, আপনাদের ছোট করে দেখছি না।শুধু এই আনন্দময়ী রহস্য টা যেন আপনাদের সারা জীবন আনন্দ দিতে পারে তাই বলেছি।এবার শুরু করি...

পোকামানব জিনিসটা আসলে অনেকখানি অযৌক্তিক। পোকামানবের আবির্ভাবের বিষয়টি আগে বলি।

১। পোকামানব মিউটেশনের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়। এটা কি যৌক্তিক নয়?

পোকামানবের আবির্ভাবের সবচেয়ে যৌক্তিক ধারণা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার কারণে কোনো পোকা বা পাখির ডিএনএ পরিবর্তন হয়ে বা পোকা/পাখিটির মিউটেশনের মাধ্যমে এই অবস্থা হয়েছে। পোকা থেকে ৬-৮ ফুট লম্বা হওয়া আর ৮-১৫ ফুট লম্বা পাখা গজানো যে কতটা অযৌক্তিক এবং হাস্যকর!! এটা বাদই থাক। ধরি পোকামানব একটা পাখি থেকে এসেছে।সাধারণ ভাবে বলতে গেলে একটা পাখি থেকে এত বড় একটা জায়ান্টে পরিণত হতে অনেক অনেক সময় দরকার।কেননা ঐ পাখির ডিএনএ বদলে

এত বড় সাথে সাথে হতে পারবে না।অনেক খাবার আর পানির দরকার।এত বড় দেহ চালাতে একটা মস্ত বড় হার্ট, দ্রুত ঊড়ার জন্য শক্তিশালী হাড় এর দরকার।বায়ুথলি, শক্তিশালী ফুসফুসও দরকার।যা একটা পাখির পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।আর যদি প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাখিটার বাচ্চা বড় হতে হতে পোকামানবে পরিণত হয় তাহলে অনেকগুলো পোকামানব হতো।আর সময় লাগত অনেক! বিজ্ঞানীরা ততক্ষণে তা ধরেও ফেলত।তাছাড়া রেডিয়েশনের কারণে এরকম সুপার ডুপার জিনিস হয় না, হয় ক্যান্সার! রেডিয়েশনের কারণে কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রোটিন অণু সমূহের কাজ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রোমোজোম ডেমেজ হয়।ফলে নিয়ন্ত্রণহীন কোষ বিভাজন শুরু হয় এবং জন্ম দেয় ক্যান্সারের।

আসলে রেডিয়েশন আপনাকে সুপার পাওয়ার দেয় না।দেয় ৩টা জিনিস-

i. কিছুই না।
ii. টিস্যু ডেমেজ
iii. ক্রোমোজোম ডেমেজ

২।যে চারজন পোকামানবকে দেখেছিল তারা কি মিথ্যা বলছে?

*যে চারজন ঐ পোকামানবকে দেখেছিল তারা গভীর রাতে একটা নির্জন বন্য এলাকায় আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল।আপনার কি মনে হয় ওরা এত রাতে দৃশ্য দেখার জন্য গিয়েছিল এমন বন্য এলাকায়? আমার মনে হয় তারা নেশা করে গাড়ি চালাচ্ছিল যার কারণে তারা পোকামানবের মতো অবাস্তব জিনিস দেখতে পায়।

* যদি তারা নেশা না করেও থাকে, মানলাম তারা কিছু একটা দেখেছে, তারপরও কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করা যায়।যেমন লাল চোখ দুটি।একটা পেঁচার চোখে যদি আমরা আলো ফেলি তাহলে দেখব যে তার চোখ লাল! আর ঐ চারজন যারা প্রথম পোকামানবকে দেখে তারা বলেছিল যে চোখ লাল তখন হতো যখন তারা ওটার উপর টর্চের আলো ফেলত ।তাছাড়া পয়েন্ট প্লিজেন্ট ছিল একটা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা।আর সেখানে তখন ছিল হালকা কুয়াশা।তাই হতে পারে একটা বড় পেচা ডালে বসে ছিল, কুয়াশা পেঁচার নিচে ঘনীভূত হয়ে তৈরি করে শরীর। ফলে ঐ চারজন ভয় পায়।আর যখন আমরা ভীত হই তখন আমাদের সেন্স লজিকাল চিন্তা করতে পারে না।ফলে ঐ চারজন যখন আলো ফেলে তখন তার লাল চোখ দেখে আর কিছু লক্ষ্য করার সময় পায়নি।তারা আতঙ্কে পুলিশের কাছে যায়।

* হতে পারে এই সম্পূর্ণটাই তাদের অভিনয় ছিল।মানে, তারা সবাই ইয়াং ছিল তো হতে পারে মজা করে এইসব করেছিল।মজা করার থিওরি সঠিক হলে এটা পোকামানবের পায়ের ছাপ, গাড়ির সাথে ১৬০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায় ঊড়া টাও ব্যাখ্যা করবে।

৩। যারা পোকামানব দেখে তাদের সাথে নাকি অনেক ধরনের ভৌতিক ঘটনা ঘটে- এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে একবার যখন কেউ ভৌতিক কোনো কিছুর সম্মুখীন হয় তখন তারা তাদের সাথে ঘটা যেকোনো কিছু ঐ ভৌতিক ঘটনার সাথে জুড়ে দেয়।গ্লাস ভাঙা কোনো পোকা বা বাতাসের কারণে, দরজা বন্ধ হওয়াও বাতাসের কারণে হতে পারে।মানুষের প্যাটার্ন চিহ্নিত করার ক্ষমতা মাঝে মাঝে একটু বেশিই হয়ে পরে তাই না?

৪।এতগুলো মানুষ কি তাহলে মিথ্যা বলছে?

না! আসলে যখন আপনি জানবেন যে আপনার এলাকায় পোকামানব আছে আর ঐ দিন রাতে যখন আপনি ছাদে থাকা কাপড়ের ছায়া কিছুটা মানব আকৃতির দেখবেন তখন আপনি ঠিকই "পোকামানব পোকামানব " বলে দৌড় দেবেন।জিনিসটা আর ভালো করে লক্ষ্য করবেন না।

৫।পোকামানবের ছবিও আছে গুগলে! এটা নিয়ে কি বলবেন?

পোকামানবে ছবি বের হতে শুরু করে ২০১৬ সাল থেকে।তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ফোটোশপড।তাছাড়া এমন কিছু আসলে থাকলে মানুষ এতক্ষণে ধরে চিড়িয়াখানা তে ভরে দিত।এটার প্রচুর খাবারও দরকার তাই বিভিন্ন জায়গায় পাখি বা পশুর মৃতদেহ (যদি মাংসাশী হয়) অথবা পাতাহীন অনেক গাছ (যদি তৃণভোজী হয়) দেখা যেত।এমন অস্বাভাবিক কিছুই দেখা যায়নি পয়েন্ট প্লিজেন্টে।

পোকামানবের পায়ের ছাপ, গাড়ির সাথে ১৬০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায় ঊড়া এই দুটি জিনিসের ব্যাখ্যা আমি করতে পারিনি।তারা মজা করার থিওরি বাদে পায়ের ছাপ আর গাড়ির সাথে ঊড়ার ব্যাপারটাকে হ্যালুসিনেশন ছাড়া আর কিছু বলতে পারছি না (যদিও হ্যালুসিনেশনের চান্স নেই বললেই চলে কেননা তারা চারজন একই জিনিস দেখেছেন)।

দেখুন বিশ্বাস করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার উপর।যদি বিশ্বাস করেন কেউ হাসবেও না কাঁদবেও না।আর বিশ্বাস না করলেও কেউ হাসবেও না কাঁদবেও না।কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলব "বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, দোষ কি তাতে?"

ছাদের উপরের ভূত

আবদুল্লাহ বিন আফতাব

আমরা দু'তলায় থাকি।আমাদের বাসার ছাদে প্রায়শই কারোর হেঁটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই।অনেক জোরে জোরে, যেনো পায়ের গোড়ালি দিয়ে ছাদে লাথি মেরে মেরে হাঁটে! তবে পরিষ্কার বোঝা যায়, কেউ থাকলে ওখানে মাত্র একজনই আছে।মানুষ নয়, এটা নিশ্চিত। কারণ শব্দটা যে রাত ১১.০০ টার পর শোনা যায়! মা-বাবা এই ব্যাপারে অনেক আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে উপরে ভৌতিক কিছু দৌড়াদৌড়ি করে, আমরাও জানি, আমাদের এলাকায় এসব ঘটনা অনেক ই আছে।তাই ভাই-বোনেরা নিঃশব্দে ঘরে বসে বসে হাঁটার আওয়াজ শুনি!

“ধুম-ধুম-ধুম---ধুম-ধুম”

কয়েক সেকেন্ড পরপর।এক বছর পর ঐ ছাদে এক কক্ষের একটি রুম বানানো হলো।সেখানে যিনি থাকতেন উনি রাত্রে বাসায় ফিরতেন, সন্ধ্যার পরেই, নাম- রফিক।আমি আর আমার ছোট ভাগ্নে চলে যেতাম ওনার রুমে ল্যাপটপে কার্টুন দেখতে। ভাগ্নেটা প্রচণ্ড দুষ্টু;এলাকা বলেন আর স্কুল- সবাই চিনে ওকে! তো রাত ১০ টা পর্যন্ত কার্টুন দেখতাম।এক বছরের বেশি এভাবেই চলল, তবে ছাদের শব্দটা আমরা এখনও শুনতে পাই। কিন্তু রফিক সাহেবকে জানালে বললেন, তিনি কোনো শব্দ শুনতে পান না, ছোটোখাটো কিছু শুনলেও ওসব খেয়াল করেন নি! একদিন রফিক সাহেব এসে দেখেন, ওনার দরজা খোলা, ভিতরে ঢুকে দেখলেন সবই ঠিক আছে শুধু ল্যাপটপটা খোলা, তবে অন করা নয়। উনি তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ফোন দিলেন আর উপরে আসতে বললেন। আমারও অবাক! তবে সন্দেহের কথা হলো ঐ রুমের একটা চাবি আমাদের ঘরেও আছে! তবে অন্য আরেকজনের তালাবদ্ধ রুমে ঢোকার মতো মানসিকতার কেউ আমাদের ঘরে নেই।চাবিটা তো আমাদের দরজার পাশে এখনও ঝোলানো আছে! তাহলে কে ঢুকলো?

টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র কিছুই হারায় নি জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই ঘরে ফিরলো.... আবার আরেক শীতের রাত্রের ঘটনা- আমরা ওনার ঘরে কার্টুন দেখতে যাই! কিছুক্ষণ পর ভাগ্নেটা বাইরে চলে যায় ;আমরা টের পাই নি! ছাদটা অনেক বড়.... হঠাৎ বাইরে থেকে চিৎকার দিয়ে ওঠে ভাগ্নে! তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি ও একটা পিলারের সাথে জড়িয়ে ধরে আছে... ওকে ঘরে নিয়ে আসি।রাত ১০.০০ টা ; তখন বাইরে হালকা শীতল হাওয়া বইছিলো! ও বলল, ছাদে সে কাউকে দেখেছে, সাদা জামা পড়া! ওটা নাকি উড়াল দিয়ে চলে গেছে! পরদিন ওর প্রচণ্ড জ্বর এসেছিলো! আর আমরাও আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলাম যে ছাদে নিশ্চয়ই কিছু আছে। এখনও আমাদের বলা হয় ছাদে কিছু আছে!

ব্যাখ্যা:

ধুম-ধুম শব্দ- আমাদের বাসার সাথে পাশের বাসার ছাদ একসাথে মিল করা! মানে পাশের দু'তলা বাসার ছাদটা আমাদের বাসার দু'তলার ছাদের সাথে সংযুক্ত।তবে আর কোথাও কোনো সংযোগ নেই, মাঝে রাস্তা।তো পাশের বাসার গৃহকর্মী আনেক রাত করে মসলা বাটতেন, জানি না কেনো! সম্ভবত স্টার জলসা আর জি বাংলার সিরিয়ালগুলো দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে যেতো, না হয় ঐ রুটিনে অভ্যস্ত! ওরা নিচতলায় থাকতো।ফ্লোরে ঘুটনি দিয়ে ঘুট ঘুট করে মসলা বাটতেন।শব্দটা যেহেতু আমাদের ছাদের সাথে একটা কঠিন মাধ্যমে আসার সহজ পথ পেয়েছে, তাই আমরা ছাদ দিয়েই ধুম ধুম শব্দ শুনতে পাই! বিষয়টা অনেকদিন পরে আমরা ধরতে পারি।আর রফিক সাহেবের শব্দ না শুনার ব্যাপারটা হলো এই- আমাদের যে ছাদে শব্দ শুনা যেতো, ঐ ছাদটাই রফিক সাহেবের কাছে মেঝে! কারণ তিনি তো আমাদের উপরের তলায় থাকতেন।তাই তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতো নিচ থেকে শব্দ আসছে! রফিক সাহেবের দরজা খোলা থাকা- এই বিষয়টা অনেকেই হয়ত বুঝে ফেলেছেন! কারণটা

আমার ভাগ্নে! ও কোনোভাবে বুঝে ফেলে ল্যাপটপের ঘরের চাবি আমাদের ঘরেও আছে! তাই সে চাবিটা নিয়ে দরজা খুলে ফেলে! কিন্তু ল্যাপটপ চালানো তখনও না জানায় বেশি কিছু করতে পারে নি! ভুল করে দরজা খোলা রেখেই ঘরে চলে আসে!

সাদা জামা- ভাগ্নের সাদা জামা পড়া কিছু দেখার বিষয়টা একটু অন্যরকম! শীতের রাত ছিলো আর সাথে ছিলো হালকা হাওয়া ভাগ্নে যেখানে সাদা কিছু দেখেছিলো, ঠিক সেখানেই আমরা ধোয়া কাপড় শুকানোর জন্য মেলে দিতাম।সেদিন হয়তো কাপড় ঘরে আনা হয় নি! তাই সে আসলে একটা সাদা টিস্যু ওড়নার পড়ে যাওয়ার দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে! বিষয়টা বুঝতে পারি সকালে!কারণ ওড়নাটা নিচেই পড়েছিলো...

MEME WALL

নাজকা লাইন্স

সানজিদ আহমেদ বিশাল

"নাজকা লাইনস-দ্য মিস্ট্রি অব এনসিয়েন্ট এলিয়েনস"

1927 সাল।সবেমাত্র পেরুর মরুভূমি নাজকার উপর দিয়ে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে।পেরুর আর্কিওলোজিস্ট তোরিবিও মেহিয়া একদিন বিমানে পেরুর ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন।হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে নাজকা মরুভূমির উপর।তিনি দেখলেন মরুভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিশাল আকৃতির কিছু জিওগ্লিফ মানে ভূ-রেখাচিত্র।তিনি অবাক হন।বিষয়টা জানাজানি হলে অনেক আর্কিওলোজিস্ট সেখানে উপস্থিত হতে থাকে।শুরু হয় এক নতুন মিস্ট্রির!

পেরুর রাজধানী লিমা থেকে প্রায় 400 কি.মি দক্ষিণে নাজকা মরুভূমি।বালি নেই।শুধু বাদামী রংয়ের ধূসর নুড়ি পাথর।আর এই ধূসর বিস্তীর্ণ মরুভূমি প্রায় 500 কি.মি এলাকা জুড়ে অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত আছে বিশাল আকৃতির প্রায় দশ হাজার রেখাচিত্র। মূলত দুই ধরনের রেখাচিত্র পাওয়া যায় সেখানে। জিওগ্লিফস আর বায়োমর্ফস। জিওগ্লিফস জ্যামিতিক আকৃতির বিভিন্ন নকশা;যেমন ত্রিভুজ,সরলরেখা ইত্যাদি।আর বায়োমর্ফস হচ্ছে জীবজগৎ; যেমন হনুমান,মাকড়সা,মানুষের প্রতিকৃতি,হামিং বার্ড ইত্যাদি। গবেষকদের মতে এগুলোর বয়স আনুমানিক 3000 বছর! সবচেয়ে বেশী আয়তনের গ্লিফটির আয়তন প্রায় 300 m. দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে লম্বা গ্লিফটি 9 মাইলের। রেখাগুলো এতোটাই বড় যে সামনে থেকে দেখলে মামুলি রেখা ছাড়া কিছুই মনে হবেনা।কিন্তু ভূমি থেকে কয়েকশো ফুট উপরে উঠলে বোঝা যায় রেখাগুলোর প্রকৃত শেইপ আর আয়তন। চিত্রগুলো এতোই সুন্দর যে মনে হবে কোন এক প্রাচীন শিল্পীর চমৎকার শিল্পকর্ম!

এগুলো দেখে প্রায় সবারই মনে প্রশ্ন জাগে, 3000 বছর আগে এতকিছু কীভাবে সম্ভব? নেই কোন প্রযুক্তি, আশেপাশে নেই কোন পাহাড়! তাহলে উপর থেকে না দেখে কীভাবে এতো সূক্ষ্মভাবে এগুলো তৈরী করা হলো? আর এতদিন পরেও এগুলো অক্ষত আছে কীভাবে?

প্রচলিত কিছু মিথ:

1. পল কোসকের মতে গোটা এলাকাটা একটা অ্যাস্ট্রোনমি বই! তিনি দাবি করেন নাজকা লাইনের সাথে জ্যোতির্বিদ্যার সম্পর্ক রয়েছে।তার মতে আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থানের সাথে এসব চিত্রের অনেক মিল।

2. এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় মিথ।সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেন 1964 সালে তার বই "চ্যারিয়টস অফ গড"-এ লিখেছেন প্রাচীনকালে ভিন গ্রহের প্রাণীরা নাকি পৃথিবীতে আসতো।আর এই রেখাগুলো ছিল তাদের নভোযান ল্যান্ডিংয়ের রানওয়ে!
(বর্তমানে ইউটিউবে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় বর্ণনা নাজকা লাইনসের)

এগুলো তৈরী করার পেছনের সাম্ভব্য ব্যাখ্যা:

1. বিশেষজ্ঞদের মতে এসব লাইন প্যারাকাস আর নাজকা সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে।হয়তো এসব চিত্র অংকন করা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল!

2. ডিসকোভারি চ্যানেলে একটা অনুষ্ঠান হতো।নাম Solving History with Olly Steeds. সেখানে নাজকা লাইন নিয়ে একটা ডকুমেন্টারী দেখিয়েছিল।সেখানে বলা হয় নাজকা ছিল একটি ধর্মীয় তীর্থস্থান।সেখানে অনেক মানুষ জড়ো হতো আর এসব নকশা তৈরী করতো।ডকুমেন্টারীর লিংক নিচে।

3. তখন মরুভূমিতে পানির প্রচন্ড অভাব ছিল।নাজকার মানুষ কৃষি করতে পারত না।তাই তারা ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এসব তৈরী করেছিল!

4. পানি পাওয়া যায় এমন স্থানগুলোকে সংযুক্ত করতে এসব চিত্র আঁকা হতে পারে।হয়তো এককে প্রজন্ম এককে জায়গায় পানির সন্ধান পায় আর জায়গাগুলোকে চিত্র একে সংযুক্ত করতে থাকে।

ওগুলো কিভাবে তৈরী করেছে?

মরুভূমির লালচে বাদামী আয়রন অক্সাইড আবৃত ছোট ছোট নুড়ি পাথর সরিয়ে এসব চিত্র তৈরী করা যায়। এসব পাথর অক্সিডাইজড হয়ে যাওয়ার পর ধূসর হয়ে যায়। তখন পাথর সরালে উজ্জ্বল সাদা বালুকণা দেখা যায়।কাঠের একটা হাতল দিয়ে জোরে ঘষা দিলেই পাথর সরে যায় আর বালু বের হয়ে আসে।

এতদিন টিকে আছে কেন?

নাজকা মরুভূমি উষ্ণ,বৃষ্টি কম হয়, একটানা অনেকদিন রোদ হয়। তাপমাত্রা প্রায় 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে।বলা হয় প্রত্যেক বছর গড়ে 15 মিনিট বৃষ্টি হয়।একটা লেয়ার বহুদিন ধরে রয়ে গেলে কঠিন আকার ধারণ করে।আর অনেকদিন টিকে থাকে।হতে পারে আরও অনেক রেখা ছিল।আবহাওয়ার কারণে মুছে গেছে।

Solving History with Olly steeds

ভূতের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ

সৈয়দ ইমাদ উদ্দীন শুভ

১.
আমাদের চোখে ও কানে ফিল্টার লাগানো আছে।আমরা কানে 20 হার্জ থেকে 20 হাজার হার্জ পর্যন্ত শুনতে পারি। বাচ্চাদের শব্দ শোনার পরিসর আরো বড় হয়। আপনার পোষা কুকুর প্রায় 45 হাজার হার্জ ও পোষা বিড়াল প্রায় 78 হাজার হার্জ পর্যন্ত শুনতে পারে। আমাদের চোখেও কিন্তু ফিল্টার লাগানো। আমরা 380nm থেকে 740nm পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর আলো দেখতে পারি। এককে আলো এককে রঙের অনুভূতি তৈরি করে। Mantis Shrimp নামের একটা পোকা যে range এ দেখতে পারে তা এতই বেশি যে আমরা সেসকল রঙ কল্পনাও করতে পারবো না।নাইট ভিশন ক্যামেরা IR বা UV রশ্মির মাধ্যমে রাতের বেলায় পর্যন্ত ছবি তুলতে পারে।

আচ্ছা এমন কেউ যদি থাকে যার শরীর দৃশ্যমান আলোর জন্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য কোন আলোর জন্য প্রতিফলন ঘটায়? কিংবা তারা এমন ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলে যে আমরা তা শুনতেই পাই না।কী হবে তখন?

আপনার পাশে বসা বিড়াল বা কুকুরটি হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠলো।আপনি কিছুই শুনলেন না। তবে কি এমন কিছু তারা শুনেছে যে আপনি তা শুনেন নি? ভয় পাবার কিছু নেই।বিড়াল বা কুকুরের শ্রাব্যসীমা অনেক বড় হলেও তাদের চোখ খুব বেশি রঙ দেখতে পারে না। সর্বোচ্চ আপনার মতোই।তাই আপনি যা দেখেন নি, তা আপনার কুকুর পর্যন্ত দেখবে না।

তবে হ্যাঁ, আপনার ক্যামেরা হয়তো ঠিকই এমন কাউকে ধরে ফেলবে।

২.

আমরা ত্রিমাত্রিক। মাত্রা কী জিনিস? একটা সরলরেখা একমাত্রিক। একটা একমাত্রিক প্রাণী যদি x অক্ষের ওপর থাকে, সে বুঝতেই পারবে না y অক্ষ কী জিনিস।

আবার একটা দ্বিমাত্রিক প্রাণী xy তলে আছে।আপনি ঐ তলের ওপর দাঁড়ানো। দ্বিমাত্রিক প্রাণী আপনার উচ্চতা বুঝতেই পারবেনা।তবে সে আপনার xy তলের ওপর ছায়া ঠিকই দেখতে পারবে।সম্পূর্ণ আপনাকে দেখা তার জন্য সম্ভব না।

এখন দ্বিমাত্রিক প্রাণীটি x অক্ষে মুলবিন্দু থেকে (1,1) বিন্দুতে যাচ্ছে। আপনি করলেন কি, কাগজটা ভাঁজ করে (1,1) বিন্দুকে মুলবিন্দু এর কাছে এনে ফেললেন। দ্বিমাত্রিক প্রাণীটি বেশ ভয় পেয়ে গেল। তার কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা নেই, কারণ তার পক্ষে z অক্ষ অনুভব করা বা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

আচ্ছা কোন চতুর্মাত্রিক বা আরো উচ্চতর মাত্রার প্রাণী থাকলে কী হবে? ধরুন আপনি একটা বাক্সে কিছু একটা বন্ধ করে রেখেছেন।অন্য কেউ তা দেখছে না। একটা চতুর্মাত্রিক প্রাণী হুট করে তা নিয়ে গেলো।আপনি বাক্স খুলে দেখলেন সেটা উধাও। আপনি কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলেন না।

আচ্ছা সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেই চতুর্মাত্রিক প্রাণীটিকে কখনোই দেখতে পারবেন না। তার ত্রিমাত্রিক অভিক্ষেপ দেখবেন শুধু। একটা কিউবের যেমন ছয়টা দ্বিমাত্রিক ফেস থাকে, একটা টেসারেক্ট (চতুর্মাত্রিক ঘনক) এ এরকম আটটা সেল থাকে। কাজেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা চতুর্মাত্রিক প্রাণীর একাধিক থ্রিডি প্রজেকশন দেখবেন। মানে একটা প্রাণীই একাধিক ফর্মে চলে আসবে।

কিন্তু হ্যাঁ, এইক্ষেত্রে আপনি সেই চতুর্মাত্রিক প্রাণীর কাছে কিন্তু অসহায়।আপনি যত যাই করুন, তার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।

৩.

পৃথিবীর সব পার্টিকেলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।এদের যথাক্রমে ফার্মিয়ন আর বোসন বলা হয়।উদাহরণস্বরূপ, ইলেক্ট্রন ফার্মিয়ন, ফোটন বোসন।ফার্মিয়ন দিয়ে মূলত সকল পদার্থ তৈরি।এদের স্পিন ½ এর বিজোড় গুনিতক।এরা পাওলির বর্জন নীতি মানে, অর্থাৎ দুটো ফার্মিয়নের কোয়ান্টাম স্টেট কখনো এক হবে না।অন্যদিকে বোসন মূলত বলবাহী কণা (বোসন এর নাম আমাদের সত্যেন বোস স্যারের নামে।বোসনের স্ট্যাটিস্টিক্স এর একজন আবিস্কারক তিনি।উনার প্রতি অজস্র সম্মান) ½ এর জোড় গুণিতক। এরা পাওলির বর্জন নীতি মানে না।

আচ্ছা, কোন পদার্থ কি বোসনের তৈরি হতে পারে? বা ফোটনের তৈরি কোন প্রাণী কি থাকতে পারে?

উত্তর হলো: না। কেননা প্রতিটি পার্টিকেল এর স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের জানা। পরম শূন্য তাপমাত্রায় বোসন কণার গ্যাস কন্ডেনসেট হয়, সাধারণ তাপমাত্রায় তা হবে তো নাই, আর কোন প্রাণী তৈরি তো অন্য কথা।এমনকি যদি থাকেও, তবে এরা আপনার শরীর পেনিট্রেট করে চলে যাবে কিংবা আপনাকে হয়তো রেডিয়েশন এ ভোগাবে।আপনার শরীর ভারী মনে হওয়া বা উদ্ভট আচরণ করাতে পারবে না। আপনি কি জানেন, এই মুহূর্তে কতগুলো নিউট্রিনো আপনার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে অথচ আপনি টেরই পাচ্ছেন না?

৪.

ভূত-প্রেত-অশরীরী মোটামুটি সব সংস্কৃতিতে আছে, একেক নামে, একেকরকম ব্যাখ্যায়। তাদের নিয়ে প্রচলিত কল্পকাহিনীগুলোকে একত্র করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন,

তারা নাকি উড়তে পারে।আচ্ছা সেক্ষেত্রে কিন্তু বাতাস না থাকলে উড়তে পারবে না।কারণ বাতাস না থাকলে যতই ডানা থাকুক, কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না।কাজেই উড়তেও পারবে না।যদি চতুর্মাত্রিক হয় তবে সেটা উড়ে বলে মনে হতে পারে অবশ্য।

অনেকে নাকি ভূত পেত্নী বিয়ে করে।কিন্তু ত্রিমাত্রিক প্রাণীর সাথে চতুর্মাত্রিক প্রাণীর বিয়ে, যৌনসম্পর্ক কি আদৌ সম্ভব? একটা কাগজের ওপর ছবি এঁকে ভেবে দেখতে পারেন 😉 আর হ্যাঁ, এক্ষেত্রে কেউ ভূত পালে বললে সেটাও সম্ভব নয়।কেননা চতুর্মাত্রিক প্রাণী আপনার চেয়ে ক্ষমতায় সুপিরিয়র।কাজেই যত বড় ওঝা হোন না কেন, চতুর্মাত্রিক ভূত তাড়ানো সম্ভব নয়।

আর যেই ভূতই হোক না কেন, তাদের চোখে না দেখলেও ক্যামেরা ঠিকই দেখবে।রিমোট কন্ট্রোলের লাইট কিন্তু খালি চোখে দেখবেন না, তবে ফোনের ক্যামেরায় সেন্সর থাকলেই দেখবেন। আবার আল্ট্রাসনিক সাউন্ড টেস্টিং মেশিনে কথা ঠিকই ধরা পড়বে। দুটোই একসাথে লাগবে।যদি ক্যামেরায় এমন কাউকে দেখেন যা খালি চোখে নেই আর ঐ সোর্স থেকে শব্দ পান তবে ঠিকই সেখানে কেউ আছেন।

এখানেও একটা কিন্তু চলে আসে, এমন কেউ ধরা পড়লে কি সে একটা মানুষের সাথে যৌনসম্পর্ক করতে পারে (যেমন, পরী)? বা একটা মানুষের গলা টিপে ধরতে পারে? যদি

পারে তবে সে কি কিন্তু অন্য যেকোন পদার্থের মত তারও জায়গা দখল করার কথা ও মানুষের পক্ষে তাকে ভেদ করে যাওয়া সম্ভব নয়।

আচ্ছা, ভূত নাকি গোবর ও হাড় খায়। সেক্ষেত্রে তারা একটা আস্ত জিনিস হজম করে যেখানে শক্তি বলতে তেমন কিছু নেই, যদি নিউক্লিয়ার শক্তি হজম না করে থাকে।

৫.
আচ্ছা আমরা সবাই যদি সিম্যুলেটেড হই, তবে ভূত কি ব্যাখ্যা করা যায়?

৬.
কেউ কি নিজে ভূত দেখেছে ও ছুঁয়েছে? নাকি সব শোনা? আচ্ছা, কাউকে ছোটবেলায় ভূতের ভয় না দেখিয়ে ভাত খাওয়ালে বা ঘুম পাড়িয়ে দিলে সে কি পরে ভূতে ভয় পায়?

৭.
এই লেখা পড়ার পর আপনার কি মনে হচ্ছে যে ভূত যদি থেকে থাকে তবে আমরা যাদের ভূত ভেবে ভয় পাই তারাই আসল ভূত?

ভূত যখন ব্যাঙাচি প্রকাশের আগে টিম ব্যাঙাচি-র কাছে আসে

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের জন্য আমার চাকরিটা চলে গেল

MEME WALL

স্কিজোফ্রেনিয়া

গোপাল কুণ্ডু

স্কিজোফ্রেনিয়া এক ধরনের গুরুতর মানসিক রোগ, কিশোর কিশোরী, নারী-পুরুষ সবাই আক্রান্ত হতে পারে তবে ১৫-২৫ বয়সে বেশি হয়।রোগীরা বুঝতে পারে না কি তার সমস্যা, কেন ওষুধ খাচ্ছে, কেন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে।১৮৮৭ সালে জার্মান মনোবিদ এমিল ক্রেপলিন প্রথম এই রোগের সন্ধান পান।এই রোগ মূলত চেতনাকে আক্রান্ত করে বলে ধারণা করা হয়।এটি একই সাথে আচরণ এবং আবেগগত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে। ১৯১১ সালে ইউগেন ব্লুলেয়ার প্রথম স্কিজোফ্রেনিয়া শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্রধান লক্ষণ হলো :

১. চিন্তার মধ্যে গণ্ডগোল।
২. আচরণের সমস্যা।
৩. অনুভূতির সমস্যা।

চিন্তার মধ্যে হরেক রকম অসংলগ্নতা দেখা দিতে পারে।যেমন:

১) অহেতুক সন্দেহ করা : রাস্তা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে মনে হচ্ছে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তাকে দেখে হাসছে, সমালোচনা করছে।
২) ভ্রান্ত বিশ্বাস করা : এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রকাশভঙ্গি বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এটা রোগীর বয়স, ধর্মীয় চেতনাবোধ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করছে।যেমন- আশপাশের লোকজন তার ক্ষতি করছে, খাবারে ও পানিতে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।
৩) রোগীর মনের গোপন কথা না বললেও আশেপাশের লোকজন জেনে যায়- কেউ কেউ তারের মাধ্যমে, ফোনের মাধ্যমে, টেলিস্কোপের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো অজানা যন্ত্রের মাধ্যমে জেনে যায়।
৪) রোগীর কাজকর্ম, চিন্তাচেতনা এগুলো তার নিজের না, বাইরে থেকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে।
৫) মঙ্গলগ্রহ থেকে কেউ যেন তার সঙ্গে কথা বলছে।
৬) সে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে উপর থেকে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করছে আর তাকে নির্দেশ দিয়েছে মানুষের সেবা করার জন্য।
৭) তার নিজের বিশেষ ক্ষমতা আছে, কারণ সে অমুক ফেরেস্তা কিন্তু রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন ঐ রকম নয়।
৮) অনেকে বলে আমার সঙ্গে পরীর যোগাযোগ আছে।
৯) এমনও দেখা গেছে নিজের বাবার নাম পরিবর্তন করে অন্য একজনের নাম বলে কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর আবার নিজের বাবার নাম ঠিক বলছে।

আচরণের সমস্যা :

১. এই হাসছে আবার কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদছে।
২. হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, মারতে উদ্যত হওয়া।
৩. বকাবকি ও গালিগালাজ করা।
৪. বাথরুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা।
৫. মানুষের সঙ্গে মিশতে না চাওয়া।
৬. একা ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনযাপন করা।
৭. হঠাৎ করে কাপড় বা অন্য কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেয়া।
৮. বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো (দিনের পর দিন) অথচ আগে এমন আচরণ ছিল না ।
৯. হারিয়ে যাওয়া যেমন ব্রিজের নিচে, মাজারে, গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকা।
১০. আত্মহত্যার চেষ্টা করা।
১১. উল্টাপাল্টা আচরণ করা ও কথা বলা।

১২. গায়ের কাপড়-চোপড় সবার সামনে খুলে ফেলা।
১৩. নিজের পায়খানা-প্রস্রাব মুখে দেয়া ও দেয়ালে লাগানো ।
১৪. নিজের খাওয়া দাওয়া ঘুম ও শরীরের প্রতি খেয়াল না রাখা।

অনুভূতির সমস্যা :

১. গায়েবি আওয়াজ শোনা : আশপাশে কোনো লোকজন নেই, অথচ রোগীরা কথা শুনতে পায় : কেউ কেউ একদম স্পষ্ট কথা শুনতে পায় ২/৩ জন লোক রোগীর উদ্দেশ্য করে কথা বলছে।
২. আবার কখন ফিসফিস আওয়াজ পাখির ডাকের মতো শব্দ শুনতে পায়।এই কথা শোনার কারণে অনেকে কানে তুলে বা আঙুল দিয়ে বসে থাকে।
৩. নাকে বিশেষ কিছুর গন্ধ পাওয়া।
৪. চামড়ার নিচে কি যেন হাঁটছে, এরকম অনুভূতি লাগা।

মনোবিজ্ঞানী বলেন, স্কিজোফ্রেনিয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।তবে বিভিন্ন কারণে স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে।একেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেক কারণ বেশি কাজ করতে পারে।আবার কতগুলো কারণ একসাথেও কাজ করতে পারে। বংশে কারো থাকলে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি।বাবা মা দুজনের মধ্যে একজনের থাকলে সন্তানের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা ১৭ শতাংশ।যদি উভয়েরই থাকে তবে সন্তানের হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৪৬ শতাংশ।গবেষণায় দেখা যায়, মস্তিষ্কে এক ধরনের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণে ত্রুটি এবং নিউরোকেমিক্যাল উপাদান ভারসাম্যহীন হলে এ রোগ হয়। জন্মকালীন কোনো জটিলতা থাকলেও এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
বঞ্চিত পরিবারে স্কিজোফ্রেনিয়া বেশি দেখা যায়।গর্ভকালীন মা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা রুবেলা আক্রান্ত হলে শিশুর পরবর্তী জীবনে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত অনেকের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়।অন্যকে শারীরিকভাবে আঘাত করার প্রবণতা তৈরি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানিয়েছেন, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটি একক কোনো রোগ নয়।বরং আটটি ভিন্ন ধরনের সমস্যার সমন্বিত রূপ।তাঁদের মতে, এই নতুন ধরনের ব্যাখ্যায় রোগটি ব্যাখ্যার নতুন দুয়ার খুলে গেছে।ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড্রাগান সভ্রাকিক বলেন, জিনগুলো আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।বরং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে মস্তিষ্কে বিঘ্ন ঘটায়।ফলে স্কিজোফ্রেনিয়া হয়।

এ রোগ কীভাবে নির্ণয় করা হয় এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তির আচরণ ও অতীত কর্মকাণ্ড পযর্বেক্ষণের মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়, ৫০ ভাগ ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।বাকি ২৫ ভাগ কখনোই ভালো হয় না।এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া।কারণ নিয়মিত ওষুধ ও কতগুলো মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ এবং উপদেশ মেনে চললে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

স্কিজোফ্রেনিয়ায় দুই ধরনের চিকিৎসা রয়েছে : ওষুধ প্রয়োগ ও সাইকোথেরাপি।এক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপির মধ্যে রয়েছে হ্যালুসিনেশন নিয়ন্ত্রণ, ফ্যামিলি থেরাপি, যোগাযোগের প্রশিক্ষণ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ইত্যাদি।অনেক সময় ভালো হয়ে যাওয়ার পর ওষুধ বন্ধ করে দিলে পুনরায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।এ জন্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি।

স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়েও একজন রোগী ভালোভাবে বাঁচতে পারে, যদি ঠিকমতো চিকিৎসা করা যায়।এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন।

এক্সপ্লোডিং হেড সিন্ড্রোম

নাঈম হোসেন ফারুকী

রাত গভীর।

আটত্রিশ বছর বয়সের ম্যারি রেমন্ড বরাবরের মতই জেগে উঠলেন।আজকে আবার কেউ তাঁর নাম ধরে ডেকে তুলেছে।তাঁর হাত কাঁপছে।বুক ধুকধুক করছে।যে কণ্ঠ্যস্বর তাঁর নাম ধরে ডাকে সেটা স্পষ্ট, জোরালো আর ক্লিয়ার।হিম হিম শীতল গলাটা ম্যারি রেমন্ডের কানে বাজে ঝিম ঝিম করে।

ম্যারি রেমন্ড উঠে বসলেন।একটু পানি খেয়ে নিজেকে ধাতস্থ করলেন।তারপর ছিটকিনিটা আস্তে খুলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।কি দেখবেন তিনি জানতেন।তার পরও আকর্ষণ এড়াতে পারেন না।

দরজার ওপাশে আগের মতই ঘন ঘোর অন্ধকার।কেউ দাঁড়িয়ে নেই তাঁর জন্য।দরজার ওপাশে তাঁর অপেক্ষায় দাড়িয়ে নেই কোন অতৃপ্ত আত্মা।

এই ঘটনার নাম হচ্ছে এক্সপ্লোডিং হেড সিন্ড্রোম।ব্রেইনের ভেতর কর্টেক্সে এলোমেলো সিগ্ন্যালের জন্য হয়।ম্যারি রেমন্ড কখনো শুনতে পান তীব্র স্বরে কেউ তাঁর নাম ধরে ডাকছে।কখনো ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পরে বাসন পত্র। কখনও অনুভূতি হয় তীব্র আলোকচ্ছটার।কখনও জানালার উপর আছড়ে পরে ঢিল, কিন্তু জেগে উঠলে দেখা যায় ওপাশে কেউ নেই।

অনুভূতিটা ভয়ানক হলেও, এটা সাধারণত ক্ষতিকর নয়।

ডি আই ডি: টুকরো টুকরো আত্মার গল্প

নাঈম হোসেন ফারুকী

"প্রথমে তোমার আত্মাটাকে টুকরা করতে হবে, তারপর ওই টুকরাটাকে লুকাতে হবে শরীরের বাইরে, কোন একটা জিনিসের ভিতর।এরপর যদি তুমি মারাও যাও, আত্মার ওই টুকরাটা বেঁচে থাকবে ... "
প্রফেসর স্লাগহর্ন, হ্যারি পটার

১।
প্যাট্রিসিয়ার বয়স ৫০ এর কাছাকাছি। হাসিখুশি, অমায়িক মহিলা।তার ১৪ বছর বয়সের একটা মেয়ে আছে।বাসায় অনেকগুলো পোষা কুকুর আছে।খুব সুন্দর একটা সাজানো বাসা আছে।

প্যাট্রিসিয়া মেয়ের মা।তার যে একটা মেয়ে আছে সে অনেকদিন জানত না।কিম আর অন্যান্যরা ব্যাপারটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।কখন সে প্রেগন্যান্ট হলো, কখন মেয়ের জন্ম হলো তার কিছু মনে নেই।

প্যাট্রিসিয়া সাধারণ মানুষ নয়।

আপনার আমার মতো স্বাভাবিকভাবে প্যাট্রিসিয়ার জন্ম হয় নি।তার জন্ম হয়ে কিম নবেলের শরীরে।কিমের বয়স যখন ত্রিশের কাছাকাছি তখন প্যাট্রিসিয়ার জন্ম।

প্যাট্রিসিয়ার কোন শৈশব নেই।শৈশবটা কিমের।শৈশবের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নগুলো প্যাট্রিসিয়াকে মনে রাখতে হয় নি।

শিশুর জন্মের সময় তাকে গর্ভে ধরেছিল ডন।মেয়ের জন্মের পরপরই ডন চলে যায়। অ্যামির বাবা শিশুকন্যাকে অস্বীকার করা শুরু করে।সেই সময় কোর্টে লড়েছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী হেইলি আর ড্যাশিং টিশটাশ বনি।তখনও প্যাট্রিসিয়ার খুব একটা প্রয়োজন পরে নি।

২।
কিমের বয়স তখন বিশ।পেশায় ভ্যান ড্রাইভার।নেশায় আর্টিস্ট।একদিন ভ্যান চালানোর সময় হঠাত করেই জুলির জন্ম হয়।জুলি হতভম্ব হয়ে দেখতে পায় সে একটা ভ্যানে, কিভাবে কোথা থেকে আসলো তার কিচ্ছু মনে নেই।
জুলি ধাক্কা লাগায় অনেকগুলো গাড়ির সাথে।

৩।
রেবেকার জীবনটা অর্থহীন।সে নিজেকে মেরে ফেলতে চায়।মারতে চায় কিমকে।নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।অ্যাসিডে মুখ ঝলসে দিতে চেয়েছিল। কিম ঠিক সময়ে জেগে উঠে কোনরকমে বাঁচতে পেরেছিল।

হেইলির মনটা নোংরা।সে জড়িয়ে পরে শিশুকামিদের দলে।কিম টের পেয়ে যায়।পুলিশে খবর দিতে যায়।শুরু হয় তার উপর হুমকি ধামকি, থ্রেট লেটার।

প্যাট্রিসিয়া ভালোই আছে।আগুনের স্মৃতি, অ্যাসিডের স্মৃতি কিছুই তার মনে নেই।সে সুখি মানুষ।

৪।
কিম একটা শরীর।একটা ব্রেইন।সেখানে অনেকগুলো মানুষ বাস করে।তারা সকালে বিকালে আসে, যায়।কিমের জীবনটা অনেকগুলো স্মৃতিহীনতার একটা চোরাবালি মাত্র।

এই সিন্ড্রোমের নাম ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজর্ডার।D.I.D. শৈশবে ভয়াবহ অত্যাচার যারা সহ্য করে, তাদের ব্রেইন নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনেকগুলো পার্সনালিটিতে টুকরা হয়ে যায়।কেউ হয়তো ছেলে, কেউ মেয়ে।কারো মনে আছে ওই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা, কারো মনে নেই।কেউ খুব ভালমানুষ, কেউ নরপিশাচ, শৈশবের ভয়াবহ স্মৃতিগুলো তার বিবেককে ধ্বংস করেছে।একেকজন হয়তো একেক বয়সে আটকে আছে।

কেউ ১৬ বছর বয়সী টম রিডেল, কেউ সত্তরের লর্ড ভল্ডিমর্ট।
হরক্রাক্সের মতো।

এক দেহ, অনেক আত্মা।

ডি আই ডি এগেইন

রাইয়ান খালিদ

যাকে আমরা ভূতে ধরা বলে থাকি।ডিসোসিয়েটিভ আডেন্টিটি ডিজঅর্ডার বা ডিআইডি হলো কোন মানুষের মাঝে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্বের বর্হিঃপ্রকাশ।ডিআইডি এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যাক্তি নিজেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় থেকে আলাদা মনে করে এবং তার মাঝে নতুন সত্ত্বা আবির্ভাব হয় ।সাধারণত মানসিক বিভিন্ন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত।ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে ৬ গুন বেশি হওয়ার প্রবনতা রয়েছে।২০ শতকের পর থেকে রোগী শনাক্তের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক সত্ত্বার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।বিচ্ছিন্ন সত্ত্বার প্রভাবে ব্যক্তির প্রাথমিক পরিচয় যা তার নামের সত্ত্বা- নিষ্ক্রিয়, পরনির্ভরশীল, হতাশ থাকে। DID আক্রান্ত অনেক রোগীর মাঝেই অতীতে Bipolar disorder ইতিহাস লক্ষ করা যায়।

প্যারিসের স্যালপেট্রীয়ার হসপিটালের প্রধান চিকিৎসক ড. জিন মার্টিন চারকট রোগটি প্রথম আবিষ্কার করে। হিস্ট্রেরিয়া ও এপিলেপ্সীর সাথে মিল থাকার কারণে তিনি নাম দেন হিস্ট্রি-এপিলেপ্সী।

লক্ষন :

ডিআইডি আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণ সমূহ অনেকটা অস্বাভাবিক। প্রথমদিকে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ২-৪ টি সত্ত্বার উপস্থিতি শনাক্ত করা গেলেও আক্রান্ত ব্যাক্তি ১০০ টি পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করতে পারে।

১. ব্যাক্তির মধ্যে অনেকগুলো সত্ত্বার উপস্থিতি। রোগীর উপর সত্ত্বাগুলোর আধিপত্য দেখা যায় অনেকে একে ভূত/ জ্বিনে ধরা বলে থাকে।রোগী বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে কথা বলা। পুরোপুরি ভিন্ন সত্ত্বার ও আবির্ভাব হতে পারে সেটা হতে পারে যেকোন জাতি, ধর্মের, লিঙ্গের।

২. রোগী সর্বদা অস্থিরতা অনুভব, বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা প্রভাব বিস্তার করে।

৩.স্মৃতি জনিত সমস্যা রোগী এক সত্ত্বা আরেক সত্ত্বার কোন কিছু মনে রাখতে পারে না।

৪. এক সত্ত্বা থেকে আরেক সত্ত্বার সব কিছু রোগীর কাছে পৃথক অনুভব হয়।

৫. বিভিন্ন ফোবিয়া হতে পারে বেশিরভাগ সময় ভয়ের মধ্যে থাকা।

৬. ঘুমের মধ্যে সমস্যা : ঘুমের মধ্যে হাঁটা চলা, ভয় পাওয়া, ঘুম না হওয়া।

৭. রোগীর মাঝে ড্রাগ নেওয়া, নিজের উপর শারীরিক কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

৮. এই ধরনের রোগীদের অনেকেই আত্মহত্যা করার মতো ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এই রোগ কেন হয় :

অনেকরাতে, মধ্য দুপুরে বিভন্ন বন জঙ্গলে মাঠে ঘাটে ঘুরাঘুরি করলে এটা হতে পারে।না ভাই এসব কোন কারণ না।এই রোগ হওয়ার যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম করন হিসেবে বিবেচনা করা হয় শৈশব বয়সের বড় কোন ট্রমা।প্রায় ৯০ শতাংশ কেইস এ শৈশবে কোন না কোন ট্রমা সাথে সম্পর্কিত (যদিও তেমন কোন গবেষণা হয়নি) , নাহলে কোন যুদ্ধ কিংবা স্বাস্থ্যগত সমস্যার সাথে সংযোগ রয়েছে।ছোট বেলায় অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বিশেষত যৌন হয়রানী, প্রিয়জন হারানোর মতো আকস্মিক কোন দূর্ঘটনা ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বংশগত কারণ বিরাট ভূমিকা রাখে। তবে gresbretch এর মতে অতীত মানসিক আঘাত সম্পর্কিত কোন গবেষণা হয় নি বরং ব্যক্তির নিউরোসাইকোলজিকাল ফাংশনিংয়ের সমস্যা যা সামাজিক বিভিন্ন আবেগ এবং প্রসঙ্গের বিপরীতে আচরণের সমস্যাকে দায়ী করেছেন।বিশেষ

পরিস্থিতিতে মানসিক আঘাত স্মৃতি র সাথে সম্পর্কিত নিউরাল মেকানিজমে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে।DID রোগীদের মনোযোগ

এবং স্মৃতি সম্পর্কিত চেতনার ঘাটতি দেখা যায় যা তাদের স্মৃতির অংশগুলোকে বিভক্ত করে।এছাড়াও রোগীরা অনেক সময় বিকল্প নিউরোএনাটমি প্রদর্শন করে। ।বিভিন্ন স্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রেইনে উপস্থিত উদ্দীপনায় সহায়ক অনুঘটক সমূহের প্রতি এসব ট্রমা আক্রান্ত ব্যাক্তিরা অধিক সংবেদনশীল হয় যা তাদের DID এর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।সুতরাং DID অতীত মানসিক আঘাত এবং নিউরাল মেকানিজমের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বলা যায়।

চিকিৎসা :

এ রোগ পুরোপুরি নিরাময়ের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতি নেই।তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের থেরাপি ব্যবহার করা হয় যেমন: CBT, DBT,EMDR। কিছু নির্দিষ্ট লক্ষন নিরাময়ের মেডিকেশনের ব্যবহার রয়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ ছাড়াও এ রোগের চিকিৎসায় অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। Inernational society for the study of truama and dissociation তিনটি পর্যায়ে চিকিৎসার পরামর্শ করেছে।যার প্রথম পর্যায়ে লক্ষন ও মানসিক বিপর্যস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রান।এছাড়াও রোগীকে নিরাপদে রাখার ব্যাবস্থা।রোগীর সাথে পরিবারের সদস্যদের ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং প্রাত্যহিক জীবনের কার্যক্রমে রোগীর অংশগ্রহন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা সমূহ দূর করে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সহ একটি সত্ত্বার কার্যক্রমে আনা।তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য কাউন্সিলিং।
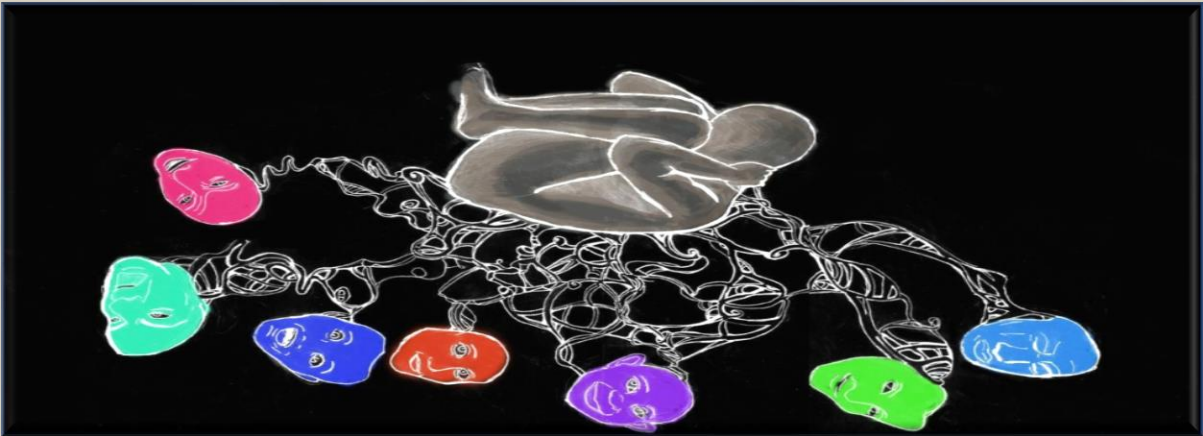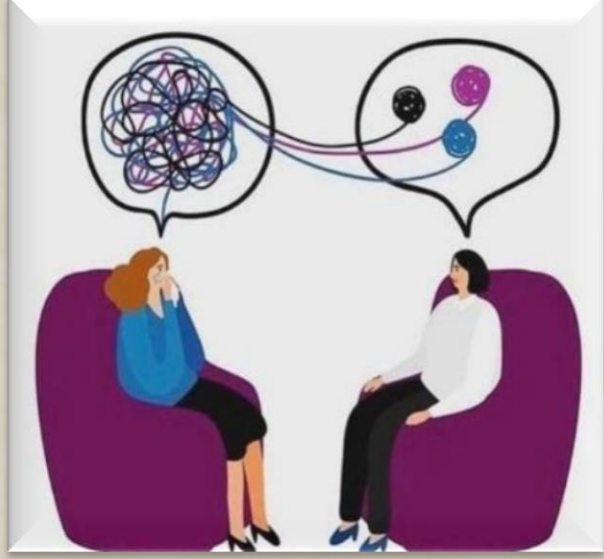
মহিষমতি সমীকরণ

১।

বিজ্ঞানী সুশীল শান্তি পঁচিশ বছর নিরলস গবেষণা করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মাথার চুল সাদা করে অবশেষে তাঁর স্বপ্নের সমীকরণটা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সমীকরণ ব্যবহার করলে ডায়রেক্টলি ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার অ্যানিহিলেশানকে ব্যবহার করে শক্তি পাওয়া যাবে।রকেটের বেগ খুব সহজে আলোর ৯০% এ উঠবে। মানবজাতির নক্ষত্র ভ্রমণের স্বপ্ন অবশেষে সফল হবে। সুশীল শান্তি কাঁপাকাঁপা হাতে সাবমিট বাটন প্রেস করলেন। পেপারটা বিজ্ঞান কাউন্সিলে চলে গেলো। এবার শুধুই অপেক্ষার পালা। পেপার অ্যাক্সেপ্ট করলেই শুরু হয়ে যাবে তাঁর স্বপ্নের রকেটের কাজ।

এদিকে সুশীল শান্তি টের পান নি, কিন্তু গত একশ বছরে দেশ অনেক উন্নত হয়েছে। সকল স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুশীল শান্তির সূত্র তাই সর্বস্তরের জনগণের মতামতামতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।

আলুর ব্যবসায়ী ইব্রাহীম খাঁ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি। তাঁর মতামতের বিশাল দাম আছে। তিনি সমীকরণটি দেখলেন। সমীকরণের মাঝখানের কিছু জায়গায় তিনি সংশোধনী প্রস্তাব করলেন। ভ্যারিয়েবল s এর জায়গায় তিনি i লেখার প্রস্তাব করলেন। s মানে শান্তি, তার বদলে i মানে হচ্ছে ইব্রাহীম।শান্তি সমীকরণে তাই কাল্পনিক সংখ্যা যোগ হলো।

মাননীয় মন্ত্রী নরেশ চন্দ্র অনেক বিজ্ঞ মানুষ। যদিও তিনি অষ্টম শ্রেণী পাশ, কিন্তু তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।দ্বীন দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর অনেক জ্ঞান। তিনি সমীকরণটির কয়েক জায়গায় যোগ চিহ্নের বদলে গুন চিহ্ন বসালেন।যোগ করলে একটা জিনিস আস্তে আস্তে বাড়ে।গুন করলে তরতর করে বাড়বে। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, যোগের চেয়ে গুন অনেক বেশি পাওয়ারফুল।

জ্যোতিষী মহাশয় সমীকরণ নিয়ে বসলেন। সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি একটা নাম করা জ্যোতি-বিশ্ববিদ্যলয়ে নিউমেরোলজি পড়ান।

তিনি সমীকরণ থেকে সকল ৫, ৮ এই সংখ্যাগুলো সরিয়ে ১৪ আর ২১ ঢুকালেন। এগুলো নিউমেরলজিক্যালি খুব পাওয়ারফুল সংখ্যা। শনির পাশ দিয়ে রকেট যখন মারাত্মক বেগে যাবে, এই সংখ্যাগুলো তাঁকে রক্ষা করবে।
বাবা শিন ঝু অনেক ঝানু পুরোহিত, ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন।এ ধরণের একটা সমীকরণ যে হবে, সেটা যে ধর্মগ্রন্থে বহু আগে থেকেই আছে, সেটা তিনি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করলেন। তিনিও সমীকরণের কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করলেন।কয়েক জায়গায় আলোর বেগ c এর বদলে বাবার ল্যাম্বর্গিনি গাড়ির বেগ vl বসানো হলো।বাবা যুক্তি দিলেন, বিজ্ঞান আজ এক কথা বলে কাল আরেক, কিন্তু এই vl বেগটা গ্রন্থের সাথে মিলে, একসময় না একসময় বিজ্ঞান নিজেকে শুধরে নেবেই, আজ হলে ক্ষতি কি? বাবা শিন ঝু খুব যুক্তিবাদী মানুষ, তাঁর নামের সাথে যুক্তিবাদী কথাটা আছে।
সব শেষে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আকমল হোসেন শেষ একটা সংশোধনী দিলেন। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ মহিষমতি রায়বাহাদুর।তাঁর নামের বদলে সুশীল শান্তির মতো পাতি বিজ্ঞানীর নাম সমীকরণের সাথে একবারেই যায় না। সমীকরণের তাই নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো মহিষমতি সমীকরণ।
অবশেষে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা পেলো মহিষমতি সমীকরণ। রাস্তার বিলবোর্ডগুলো বড় বড় করে ছেয়ে গেলো সমীকরণ আর মহিষমতির ছবি দিয়ে। টিভির বিজ্ঞাপনে সুন্দরিরা সুউজ্জল হাসি দিয়ে দন্ত বিকশিত করে সমীকরণের গুণগান বর্ণনা করতে লাগলেন।
সুশীল শান্তি তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।দুইদিন পর তার লাশ পাওয়া গেলো। দৈনিক দ্বিতীয় আলো পত্রিকার তৃতীয় পাতায় খুব ছোট করে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে।তাঁর পুত্র অশীল অশান্তি ২০০টাকা খরচ করে বাবার মৃত্যুর খবরটা জানানোর একটা ব্যবস্থা করলেন।

২।

এক বছর পরের কথা।

আদালতে বিচারকার্জ চলছে।
জনগণের রায়ে প্রাপ্ত মহিষমতি সমীকরণ রকেট মানে নি। উপরে উঠে বুমেরাংএর মতো নিচে নেমে এসেছে। তার নাক থ্যাবড়া হয়ে গেছে।
এতো বড় ধৃষ্টতা কেউ মেনে নিতে পারছে না। আদালত ভর্তি মানুষ রাগে অপমানে কাঁপছে। বিচারক রায় দিতে গিয়ে কাঁপছেন।তাঁর হাতে আইনের বই থরথর করে কাঁপছে।
বিচারক রায় ঘোষণা করলেন।রকেটকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো।
জনগণ আনন্দে উল্লাস করে উঠলো। খুশির দমকে তাদের সাড়া শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলো।

নিষ্প্রাণ রকেট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। এতটুকু কাঁপল না।
তাকে কাঁপানোর মতো বায়ুপ্রবাহ ঘরে ছিল না।

MEME TV

The True Story Behind The Aokigahara Forest, Japan

আবু রায়হান

ফুজি পাহাড়ের পাদদেশে “আওকিগাহারা” বন।
প্রায় ৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই জঙ্গলটিকেও অনেকেই পছন্দ করেন।তবে একটু অন্য কারণে। এই জঙ্গলটি প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০০ জন তাঁদের আত্মহত্যার জায়গা হিসেবে বেছে নেন। বিভিন্ন গাছে ঝুলে থাকতে দেখা যায় নাম না জানা কত যে লাশ!!
এটি বিশ্বের ২য় জনপ্রিয় সুইসাইড স্কোয়ার (১ নম্বরে আছে সানফ্রানসিসকোর গোল্ডেন গেইট ব্রিজ)। তবে কি তাহলে সত্যিই এখানে অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব আছে যা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনা?

এক কথায় 'না'। সম্পূর্ন ঘটনাটাই বিজ্ঞানভিত্তিক।

আগ্নেয়গিরির দেশ জাপান। আগ্নেয়গিরিও ঘিরে রাখা হয় ‘আত্মহত্যাপ্রেমীদের উপদ্রপে। যেমন -ল্যাব থেকে কয়েক গ্রাম আর্সেনিক হারিয়ে গেছে। "এতো বিষ যদি কেউ খেয়ে আত্মহত্যা করে? কি করে এমন গাফিলতি হলো? "ভেবে প্রফেসর আত্মহত্যা করে বসবে।

বাবার সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি , বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিল্ডিং এর নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়ে।বাবা দৌড়ে এসে এই দৃশ্য দেখে নিজেও দিবে ঝাঁপ!

ওরা কিছুটা এরকমই খুব অভিমানী আর তীব্র আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি।ওদের এই আত্মহত্যার প্রবণতার পেছনের কারণও সেই ইতিহাস আর জিন ।যুদ্ধে পরাজয় বা ভুল ত্রূটির জন্য।

হারাকিরি/হারিকিরি” (হারা =পেট , কিরি = কাটা) প্রথা আর “কামিকাজে” যোদ্ধা (আত্মঘাতি যুদ্ধবিমান চালক) তো গোটা বিশ্বের কাছেই আলোচিত।জাপানের সামুরাই যোদ্ধাদের আত্মহত্যা, যাকে 'সেপ্পুকু' বলা হতো অথবা ১৯৪৫ সালে তরুণ 'কামিকাজে' বিমানচালকদের আত্মহত্যার ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ওরা যতই উন্নত জাতি হোক না কেন ওরা ত আর ওদের বংশগতির ধারাকে,জিনের প্রভাব কে চাইলেই রোধ করতে পারবে না। তাছাড়া ওদের সমাজ ব্যবস্থা এবং রীতিনীতি আত্মহত্যাকে রোধ ত দূরের কথা বরং আরো এর প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে।জাপানে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ(প্রায় ৭লাখ) থাকে যারা জিনগত কারণে টিনেইজার থেকে শুরু করে মধ্য ত্রিশ পর্যন্ত! একটি বিশেষ প্রবণতা , নাম- “হিক্কিমোরি” অর্থাৎ “ প্রত্যাহার” বা “অব্যাহতি”তে আক্রান্ত থাকে।নিজেকে রুমের ভেতর আবদ্ধ করে রাখে প্রায় ৬ মাস। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখেনা, এমনকি ঘরের মানুষের সাথেও না।এক রুমেই থাকে।

মা বাবা ভাবেন ওকে কিছুদিন সময় দিলে এ থেকে বের হয়ে আসবে আর সুস্থ্য হয়ে যাবে।কিন্তু বেরিয়ে আসার পর সাধারণত সেই শহরে থাকে না, পাছে লোকে জেনে কিছু ভাবে যে সে এই রোগে আক্রান্ত ছিল।তাই নিজেকে সবার কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে ডিপ্রেশনের জগতে চলে যায় অজান্তে। আর ডিপ্রেশন হলো আত্মহত্যার প্রধান কারণ তা ত সবাই ই জানি।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর মূল শেকড় গাঁথা আছে জাপানের ইতিহাসেই। ১৮৬৮ তে সম্রাট মেইজি ক্ষমতায় বসার আগ পর্যন্ত তারা বহির্বিশ্বের সাথে ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বংশগতির ধারায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা এভাবেই তারা ধারণ করছে।প্রাইমারি স্কুলে নিয়ম করে শেখানো হয় "তোমার মনের ৩০% কেবল প্রকাশ করবে।বাকি ৭০% থাকবে অপ্রকাশ্য"।মন খুলে কথা বলার কোন অবকাশই নাই।এর ভালটা বাইরে থেকে যা দেখি তা হলো বিনয়ের অবতার এই জাতি। কিন্তু খারাপটা "হিক্কোমোরি " ছাড়াও সবচেয়ে আলোচিত হলো আত্মহত্যায় শীর্ষস্থান।বিগত তিন বছরের এর হার অনেক কমে এলেও বছরে ৩০,০০০ লোক আত্মহত্যা করে জাপানে।দিনে গড়ে ৭০ জন।এর মধ্যে সর্বাধিক ২০-৪৪ বছরের পুরুষ ।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে তবে তাহলে আওকিগাহারা বন কেন তাদের আত্মহত্যা করতে আকর্ষিত করে??
উত্তরটা বিস্তারিত দিচ্ছি।
আসলে আওকিগাহারা বনে এসে কারো মনের ভেতর নতুন করে আত্মহত্যার প্রেরণা জাগে না। বরং যারা এসব সামাজিক,মানসিক সমস্যায় জর্জরিত তারাই আত্মহত্যার পূর্বের প্রেরণা থেকেই আত্মহত্যার স্থান হিসেবে একে বেছে নেয়।অর্থাৎ বন কাউকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেনা।এটি সম্পূর্নই একটা মিথ আর কিছু নয়।

কিভাবে তৈরি হলো এ মিথ?

প্রথমত এরা যে কেন আত্মহত্যা প্রবণ জাতি সেটা ত জানলামই।আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এরা বনের চেয়ে বিভিন্ন রেল লাইনেই বেশি আত্মহত্যা করেন?
তবে কি রেল লাইনেও কোনো অতিপ্রাকৃত কিছু আছে?

জাপানে সোমবার সাধারণত অফিসে সাপ্তাহিক মিটিং থাকে।সাপ্তাহিক পারফরমেন্স ভাল না থাকলে অফিসের বস কে কি অজুহাত দেবেন এ চিন্তা করতে করতে বাসা থেকে বের হন।কিন্তু উপায় খুঁজে না পেয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করার 'পবিত্র দায়িত্ববোধ' থেকে অফিসে যাবার পথে সুবিধা মত একটা ট্রেন বেছে নেন।
টোকিওর ব্যস্ততম লাইনগুলিতে পিক আওয়ারে প্রতি আড়াই মিনিটে একটা করে ট্রেন আসে।দিনে সাড়ে তিরিশ লক্ষ লোক চলাচল করে।।আত্মহত্যার কারণে ট্রেনটি যদি ১০ মিনিট বন্ধ থাকে তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষতি ১০ কোটি টাকার উপরে চলে যায়
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই বিল উকিলের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির কোম্পানি অথবা পরিবারকে পাঠিয়ে দেন।১০ কোটি টাকা অনেক বড় অংক।কোন কোন পরিবারে এই ঋণের চাপে একের পর এক আত্মহত্যার সিরিজ শুরু হয়ে যায়।

সে হিসেবে বনে গিয়ে ঝুলে মরে থাকলে ত তেমন কোনো ঝামেলাই নাই।কারণ এতে ফেমিলির উপরেও কোনো চাপ পড়তেছে না, আবার, শান্তিতে নিরিবিলি স্থানে আত্মহত্যাও করা যাচ্ছে।একের ভেতর দুইটা প্যাকেজ।তবে কেন তারা এ সুযোগ হাতছাড়া করবে?

তবে এ বন কি পরিবারের খরচ বাঁচানোর জন্যই কেবল?
উত্তরটা হলো -'না'

দ্বিতীয়ত, ১৯৬০ সালে সেইকো মাটসুমোটো নামের এক জাপানি লেখকের দুটি উপন্যাস 'টাওয়ার অফ ওয়েবস' ও 'লিট' প্রকাশের পর থেকেই এই বনে এসে আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে যায়।এর কারণ হিসাবে স্থানীয়দের ধারণা, এই উপন্যাসের দু'টি চরিত্র পরিবার ও সন্তানের শুভ কামনায় এই বনে এসে আত্মহত্যা করেছিল। মনে করা হয়, সেইকো মাটসুমোটোর জনপ্রিয় উপন্যাসের এই দু'টি চরিত্র স্থানীয় মানুষকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তাঁরাও পরিবারের মঙ্গল কামনায় এখানে এসে আত্মহত্যা করেন।

আমার এ কথার বড় প্রমাণ হলো- এ দেশে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষকরা জানান, "কম খরচে আত্মহত্যার জায়গা আছে।যেমন শহরতলীর ট্রেনগুলো।দুটো ট্রেনের মধ্যে সময়ের গ্যাপ বেশি। যাত্রী সংখ্যাও কম। আর যদি শনিবার, রোববার আত্মহত্যা করেন তাহলে খরচ কমপক্ষে ১০ গুণ কমিয়ে আনতে পারবেন।এতে আপনার কোম্পানির খরচ কমবে।মনে রাখবেন আত্মহত্যা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত অধিকার। তবে অন্যের ভোগান্তি একটু কমিয়ে মরলে ভাল হয় না?
আত্মহত্যা যদিও আপনার ব্যক্তিগত বিষয় বা অধিকার।কিন্তু আমাদের ট্রেনিং আপনার আত্মহত্যাকে বাধা দেয়ার জন্য নয়।কোথায় কম খরচে কিভাবে আত্মহত্যা করা যায় তারই কিছু টিপস দেবো।'

একজন প্রশিক্ষক এসব শিক্ষা দিচ্ছেন! যেই দেশের মানুষের চিন্তাধারা তে আত্মহত্যা কিলিবিলি করে তারা ত আত্মহত্যা করে মরবে না ত তোমার মতন ভীতুর ডিম মরবে?(জাস্ট ফান)
তবে এটাই কি তবে মূল কারণ?
উত্তরটা হলো আবারো -'না'

তৃতীয়ত, স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে এই এলাকায় ‘উবাসুতে’ নামে এক বিচিত্র রীতি প্রচলিত ছিল। এই রীতি অনুযায়ী মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই জঙ্গলে এসে ছেড়ে চলে যেতেন তাঁদের পরিবারের পরিজনরা। এর পর এখানেই মৃত্যু হত ওই সমস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। স্থানীয়দের মধ্যে এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন, এই জঙ্গলে মৃত ব্যক্তির আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। এখানে কোনও জীবিত ব্যক্তি এলে তাঁকে আত্মহত্যার প্রভাবিত করে এই আত্মারা।

এটা কিন্তু জাস্ট তাঁদের বিশ্বাস এর কোনো প্রমান তারা আজো দিতে পারেনি যে এ বনে মৃতদের আত্মা ঘুরে বেড়ায় বরং তারা এ বিশ্বাস প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন না কারণ মানুষ এসব রীতিনীতি/লোকাচারকে খুব পবিত্র মেনে থাকে ফলে এসব বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করলে তারা নিজেকে পাপী ভাবে ফলে কুসংস্কার সারাজীবন কুসংস্কারই থাকে।
আর কোনো বিষয় একবার বিশ্বাস করে নিলে মানুষের মস্তিষ্ক সেটাকে নিয়ে মোহে জড়িয়ে যায় তাদের মস্তিস্ক ফিল করে যে এখানে আত্মহত্যা করলে সত্যিই হয়তো পরিবারের কল্যাণ হবে। আর আমাদের ডিপ্রেশসড মস্তিস্ক সবসময় আত্মহত্যা করতে মুখিয়ে থাকে। আর এমন একটি বিশ্বাস,কুসংস্কার তাঁদের আত্মহত্যা করতে আরো প্ররোচিত করে।
খেয়াল করে দেখবেন আপনি যদি কোনো অপরিচিত জায়গা দিয়ে হাটেন আর সে জায়গাটা যদি একটা শ্মশান ঘাট হয় বা হন্টেড বাড়ি হয় তবুও কিন্তু আপনি সেখানে রাত ২/৩টা সময় যেতেও কিন্তু এতটুকুও ভয় পাবেন না কিন্তু জায়গাটা যদি আপনার পূর্ব পরিচিত হয় তবে কিন্তু দিনের বেলায় গেলেই প্রচন্ড ভয় পাবেন সেখানে যদি একটা পাতাও নড়াচড়া করে সেটাকেও আপনার মস্তিস্ক ভৌতিক কিছু বলে মনে করবে।
অর্থাৎ আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে যেভাবে গ্রহণ করি, আমাদের মস্তিষ্ক সেভাবেই বিভিন্ন ফিলিংস তা ভয় বা সাহস যেটাই হোক- সেসব অনুভূতি তৈরি করে।
মানুষ সাধারণত একটা বিশেষ ঘটনায় সুইসাইড করে না। এই রোগটি সে তার ভেতরে অনেক দিন থেকে লালন করে।মানুষের অনুভূতি অনেক বেশি শক্তিশালী, স্পর্শকাতর।
মানুষ বড় অভিমানী।মনোবিজ্ঞানীরা বলছে, প্রতিটি সুইসাইডের রক্তে তিনটি জিনিস মিশে থাকে- ১. অভিমান, ২. হতাশা, ৩. আত্মবিশ্বাসের অভাব।আর জাপান জিনগত ভাবেই খুব অভিমানী জাতি। আর তারা দায়িত্বপালন না করতে পারলে তীব্র হতাশাতে ভুগে যা তাদেরকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে।

আর এ বনটা কিভাবে দুর্ধর্ষ হিসেবে পরিচিত হলো তার ব্যাখ্যা ত দিলামই।
আর যদি সে বনে কোনো আত্মার উপস্থিতি টের পেয়েও থাকে তবে সেটারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।কিছু কিছু পুরনো বাড়িতে
এমন কিছু Fungus আর Molds পাওয়া গেছে যেমন- Ergot যেটা থেকে Lytsergic Acid উৎপন্ন হয়।এই Lytsergic Acid থেকে ভয়ংকর ড্রাগ LSD তৈরি করা হয়। আর আমরা জানি এই LSD ড্রাগ আমাদের ব্রেনকে মারাত্মকভাবে Hallucinate করে।অর্থাৎ ভূতের বাড়ীতে ভূত না থাকলেও Lytsergic Acid এর প্রভাবে আমরা আজগুবি সবকিছু দেখতে পাই এরকম অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।
সবচেয়ে মজার বিষয় জানেন কি, সকল জাতিই বিভিন্ন Myth তৈরি করতে এবং তাতে বিভিন্ন মসলা দিয়ে তা চটকদার ও রাঙিয়ে উপস্থাপন করতে খুব বেশি পছন্দ করে।কারণ মিথ তৈরির মাঝে একটা মাদকতা আছে যা অন্যকিছুতে নেই এখনো অনেক বিখ্যাত মিথ দুনিয়াতে প্রচলিত আছে যা নিতান্তই মিথ।
যাই হোক, আবারো বলতেছি, এ আর্টিকেল যদি বুঝেন তবে বুঝপাতা,আর না বুঝলে তেজপাত।এত ধৈর্য্য নিয়ে এত বড় আর্টিকেল পড়ার জন্য সত্যিই খুব ধন্যবাদ আপনাকে। আমাকে ওয়েলকাম দিবেন না?
অবশেষে বলছ, এ পৃথিবীতে আপনার উপস্থিতি, আপনার মস্তিস্ক ও মানসিক শক্তির ব্যবহার অনেক বেশি প্রয়োজন। সেটা ব্যাবহার করুন। অভিমান করে চলে যাবার জন্য আপনার জন্ম হয়নি।

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:

https://bit.ly/bcb_science

Reference

All information are verified by BCB. If you need any prove visit BCB Facebook Group. Your hesitations and questions will be solved. But we put some link below randomly

-editor

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Vic_Tandy
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis
[3] https://bigganjatra.org/michael_faraday/
[4] https://libraries.mit.edu/collections/vail-collection/topics/biblio-file/faraday-and-table-talk/
[5] https://wowamazing.com/trending/horror/true-ghost-stories-manor/
[6] https://neatorama.com/2012/10/22/A-Real-Life-Ghost-Story/
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Vic_Tandy
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis
[8] https://wowamazing.com/trending/horror/true-ghost-stories-manor/
[9] https://neatorama.com/2012/10/22/A-Real-Life-Ghost-Story/
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Vic_Tandy
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Will-o'-the-wisp
[14] https://gizmodo.com/10-scientific-explanations-for-famous-ghostly-phenomena-1655680348
[15] https://bn.wikipedia.org/wiki/আলেয়া

১।https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bermuda_Triangle

2।

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/বারমুডা_ট্রায়াঙ্গেল

3।https://roar.media/bangla/main/myth/bermuda-triangle-mystery/

4।
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Bermuda_Triangle_incidents

5।https://www.amazon.com/Bermuda-Triangle-Mystery-Solved/dp/0879759712(কুশচ্যের বই আমাজন লিংক)

6।
https://www.google.com/amp/s/www.sciencealert.com/what-s-the-real-science-behind-the-bermuda-triangle-mystery/amp

7।
https://www.google.com/amp/s/www.independent.co.uk/news/science/bermuda-triangle-mystery-solved-latest-theories-dr-karl-kruszelnicki-debunked-unexplained-a7861731.html%3famp

8।
https://www.google.com/amp/s/metro.co.uk/2018/08/02/mystery-bermuda-triangle-solved-terrifying-new-rogue-wave-theory-revealed-7788570/amp/

9।
https://www.google.com/amp/s/www.thesun.co.uk/news/6906519/bermuda-triangle-rogue-waves-university-of-southampton/amp/

10।
https://www.google.com/amp/s/www.mirror.co.uk/science/bermuda-triangle-mystery-solved-expert-13020078.amp

1. উইকিপিডিয়া, কারণ কেন নয়? https://en.wikipedia.org/wiki/Extrasensory_perception

2. কারা বিশ্বাস করে এসবে? এটা নিয়েও আর্টিকেল আছে।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396695/

3. নেচারের আর্টিকেল- https://www.nature.com/articles/134308a0

4. কেস স্টাডি, এক্সপেরিমেন্ট, ডিবেট। ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির আর্টিকেল।
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-22/edition-7/extra-sensory-perception-controversial-debate

5. কক্সের এক্সপেরিমেন্ট- Cox, W. S. (1936). An experiment in ESP. Journal of Experimental Psychology 12: 437.

6. এক্সপেরিমেন্টাল প্রমান? https://www.nature.com/articles/1841515a0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Exploding_head_syndrome